বিজ্ঞান

অষ্টম শ্রেণি

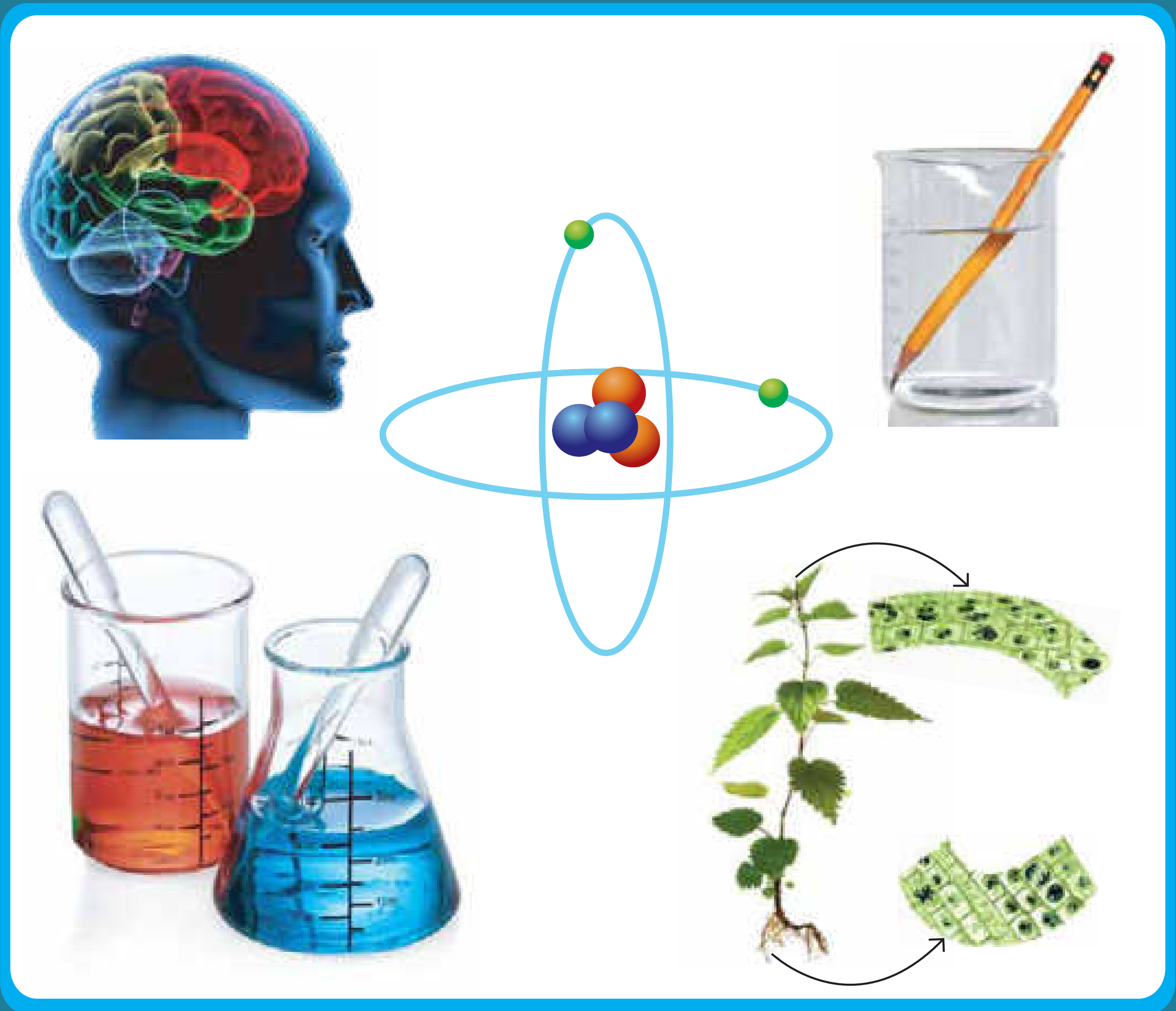

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বিজ্ঞান

অষ্টম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মোঃ আজিজুর রহমান
প্রফেসর ড. শাহজাহান তপন
প্রফেসর ড. সফিউর রহমান
প্রফেসর এস এম হায়দার
প্রফেসর কাজী আফরোজ জাহানআরা
প্রফেসর ড. এস এম হাফিজুর রহমান
মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
ড. মোঃ আব্দুল খালেক
গুল আনার আহমেদ

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন, সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা। অষ্টম শ্রেণির এই পাঠ্যপুস্তকে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকগুলোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি ও বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অনুসন্ধানমূলক কাজের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা ও কল্পনা বৃদ্ধির জন্য হাতেকলমে বিভিন্ন কাজ করার সুযোগও রাখা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস	১–১২
দ্বিতীয়	জীবের বৃদ্ধি ও বংশগতি	১৩–২৩
তৃতীয়	ব্যাপন, অভিস্রবণ ও প্রস্বেদন	২৪–৩৩
চতুর্থ	উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি	৩৪–৪৪
পঞ্চম	সমন্বয় ও নিঃসরণ	৪৫–৫৪
ষষ্ঠ	পরমাণুর গঠন	৫৫–৬৪
সপ্তম	পৃথিবী ও মহাকর্ষ	৬৫–৭৪
অষ্টম	রাসায়নিক বিক্রিয়া	৭৫–৮৮
নবম	বর্তনী ও চলবিদ্যুৎ	৮৯–৯৭
দশম	অম্ল, ক্ষারক ও লবণ	৯৮–১০৭
একাদশ	আলো	১০৮–১১৮
দ্বাদশ	মহাকাশ ও উপগ্রহ	১১৯–১২৮
ত্রয়োদশ	খাদ্য ও পুষ্টি	১২৯–১৪৬
চতুর্দশ	পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্র	১৪৭–১৫৬

প্রথম অধ্যায়

প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস

পৃথিবীতে অসংখ্য বিচিত্র ছোট বড় প্রাণী বাস করে। এদের মধ্যে রয়েছে নানারকম মিল ও অমিল। এই বৈচিত্র্যময় প্রাণিকুলে রয়েছে আণুবীক্ষণিক প্রাণী অ্যামিবা থেকে শুরু করে বিশাল আকারের তিমি। প্রাণীর বিভিন্নতা নির্ভর করে পরিবেশের বৈচিত্র্যের উপর। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও বাসস্থানে প্রাণিবৈচিত্র্য ভিন্ন রকম হয়। বিশাল এই প্রাণিজগৎ সম্পর্কে জানা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। সহজে সুশৃঙ্খলভাবে বিশাল প্রাণিজগৎকে জানার জন্য এর বিন্যস্তকরণ প্রয়োজন, আর বিন্যস্ত করার পদ্ধতিকে শ্রেণিবিন্যাস বলে। শ্রেণিবিন্যাস প্রাণিজগৎকে জানার পথ সহজ করে দিয়েছে।

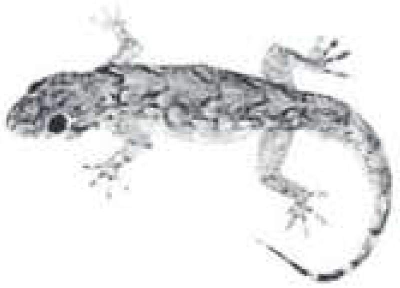

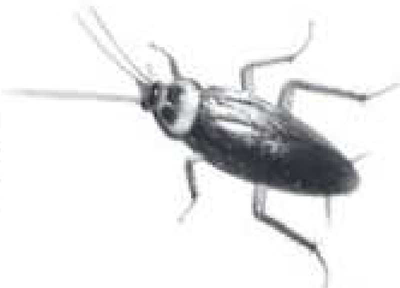

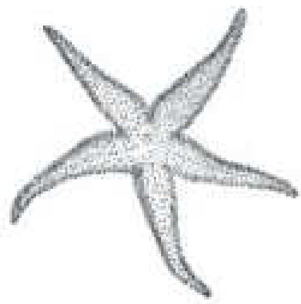

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- অমেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করতে পারব;
- মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করতে পারব;
- জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১ : প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Animal Kingdom)

তোমরা তোমাদের চারপাশের ছোটবড় নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণী দেখতে পাও। তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণিতে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রাণিজগৎ সম্পর্কে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা কর। তোমার দেখা প্রাণীগুলো দেখতে কি একই রকম? এদের সবগুলোরই কি মেরুদণ্ড আছে? এরা সবাই কি একই পরিবেশে বাস করে? এরা সবাই কি একই রকম খাবার খায়? এরা কি একইভাবে চলাফেরা করে?

এবার তুমি নিচের উত্তরগুলোর সাথে তোমার চিন্তাকে মিলিয়ে নাও। আমাদের চারপাশে আমরা যে প্রাণীগুলোকে দেখি তার সবগুলো দেখতে এক রকম হয় না। এদের দেহের আকৃতি, গঠন ও অন্যান্য জৈবিক কাজকর্মের প্রকৃতিও ভিন্ন। এদের কোনোটির মেরুদণ্ড আছে, আবার কোনোটির মেরুদণ্ড নেই। এদের কোনোটি মাটিতে, কোনোটি পানিতে, কোনোটি গাছে বাস করে। এদের খাদ্যও বিভিন্ন প্রকারের হয়। এরা বিভিন্ন অঙ্গ (সিলিয়া, পা, উপাঙ্গ ইত্যাদি) দিয়ে চলাফেরা করে, আবার কোনোটির চলনশক্তি নেই।

পৃথিবীতে এ রকম বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণীর সংখ্যা আমাদের সঠিক জানা নেই। আজ পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ প্রজাতির প্রাণী আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত এদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বিপুল সংখ্যক প্রাণীর গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের সহজ উপায় হলো শ্রেণিবিন্যাস। প্রাণিদেহে বিদ্যমান বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন প্রাণীর

মধ্যে মিল, অমিল ও সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। এদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর বা ধাপে সাজানো হয়। জীবজগৎকে ধাপে ধাপে বিন্যস্ত করার এই পদ্ধতিকে শ্রেণিবিন্যাস বলে। প্রয়োজনের তাগিদে বর্তমানে জীববিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা গড়ে উঠেছে। এর নাম শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা (Taxonomy)।

প্রজাতি হলো শ্রেণিবিন্যাসের সবচেয়ে নিচের ধাপ বা একক। যেমন– মানুষ, কুনোব্যাঙ, কবুতর ইত্যাদি এক একটি প্রজাতি। কোনো প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করতে হলে সেই প্রাণীকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ধাপে ধাপে সাজাতে হয়। এই সকল ধাপের প্রত্যেকটিকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করতে হয়।

শ্রেণিবিন্যাসের ইতিহাসে অ্যারিস্টটল, জন রে ও ক্যারোলাস লিনিয়াসের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতিবিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াসকে শ্রেণিবিন্যাসের জনক বলা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম প্রজাতির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেন এবং দ্বিপদ বা দুই অংশ বিশিষ্ট নামকরণ প্রথা প্রবর্তন করেন। একটি জীবের বৈজ্ঞানিক নাম দুই অংশ বা পদবিশিষ্ট হয়। এই নামকরণকে দ্বিপদ নামকরণ বা বৈজ্ঞানিক নামকরণ বলে। যেমন– মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম – *Homo sapiens* । বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাটিন অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখতে হয়।

এখন তুমি তোমার নিজের খাতায় নিচের ছকটি আঁক এবং ছকটি পূরণ করো ।

প্রাণীর নাম	বাসস্থান	গঠন	উপকারিতা	অপকারিতা
বানর				
কেঁচো				
ঝিনুক				
পাখি				
মাছ				

পাঠ ২–৫ : অমেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস

আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসে সকল প্রাণী অ্যানিম্যালিয়া (Animalia) জগতের (kingdom) অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণিবিন্যাসে পূর্বের প্রোটোজোয়া পর্বটি প্রোটিস্টা (Protista) জগতে একটি আলাদা উপজগৎ (Subkingdom) হিসেবে স্থান পেয়েছে।

অ্যানিম্যালিয়া জগতে প্রাণীদের মোট ৩৩ টি পর্ব রয়েছে। এর মধ্যে প্রজাতির সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নয়টি পর্বকে মেজর পর্ব বলা হয়। বাকীগুলো নন-মেজর পর্ব। এই নয়টি পর্বের প্রথম আটটি পর্বের প্রাণীরা অমেরুদণ্ডী এবং শেষ পর্বের প্রাণীরা মেরুদণ্ডী।

একনজরে অ্যানিম্যালিয়া জগতের মেজর পর্বগুলোর শ্রেণিবিন্যাস

১. পর্ব : পরিফেরা (Porifera)

স্বভাব ও বাসস্থান : Porus শব্দের অর্থ ছিদ্র এবং ferre শব্দের অর্থ বহন করা। এই শব্দদুটি থেকেই পরিফেরা শব্দটি এসেছে। পরিফেরা পর্বের প্রাণীরা সাধারণভাবে স্পঞ্জ নামে পরিচিত। পৃথিবীর সর্বত্রই এদের পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশ প্রজাতি সামুদ্রিক। তবে কিছু কিছু প্রাণী স্বাদু পানিতে বাস করে। এরা সাধারণত দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- সরলতম বহুকোষী প্রাণী। বহুকোষী হলেও এরা টিস্যু গঠন করে না।
- দেহপ্রাচীর অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত। এই ছিদ্রপথে পানির সাথে অক্সিজেন ও খাদ্যবস্তু প্রবেশ করে।
- কোনো পৃথক সুগঠিত কলা, অঙ্গ ও তন্ত্র থাকে না।

উদাহরণ : *Spongilla, Scypha*

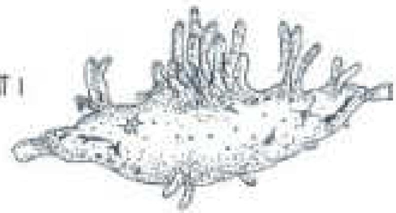

চিত্র ১.১ : *Spongilla*

২. পর্ব : নিডারিয়া (Cnidaria)

Cnidocyte নামক বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোষের নাম থেকেই এই পর্বের নামকরণ করা হয়েছে। এই পর্ব ইতোপূর্বে সিলেন্টারেটা নামে পরিচিত ছিল।

স্বভাব ও বাসস্থান : পৃথিবীর প্রায় সকল অঞ্চলে এই পর্বের প্রাণী দেখা যায়। এদের অধিকাংশ প্রজাতি সামুদ্রিক। তবে অনেক প্রজাতি খাল, বিল, নদী, হ্রদ, ঝরনা ইত্যাদিতে দেখা যায়। এই পর্বের প্রাণীগুলো বিচিত্র বর্ণ ও আকার-আকৃতির হয়। এদের কিছু প্রজাতি এককভাবে আবার কিছু প্রজাতি দলবদ্ধভাবে কলোনি গঠন করে বাস করে। এরা সাধারণত পানিতে ভাসমান কাঠ, পাতা বা অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে দেহকে আটকে রেখে বা মুক্তভাবে সাঁতার কাটে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

চিত্র ১.২ : *Hydra*

- দেহ দুটি ভ্রূণীয় কোষস্তর দ্বারা গঠিত। দেহের বাইরের দিকের স্তরটি এক্টোডার্ম এবং ভিতরের স্তরটি এন্ডোডার্ম।
- দেহ গহ্বরকে সিলেন্টেরন বলে। এটা একাধারে পরিপাক ও সংবহনে অংশ নেয়।
- এক্টোডার্মে নিডোসাইট নামক বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোষ থাকে। এই কোষগুলো শিকার ধরা, আত্মরক্ষা, চলন ইত্যাদি কাজে অংশ নেয়।

উদাহরণ : *Hydra, Obelia*

৩. পর্ব : প্লাটিহেলমিনথেস (Platyhelminthes)

স্বভাব ও বাসস্থান : Platy শব্দের অর্থ চ্যাপ্টা এবং helminthes শব্দের অর্থ কৃমি। এই শব্দ দুটি থেকে প্লাটিহেলমিনথেস শব্দটি এসেছে। এই পর্বের প্রাণীদের জীবনযাত্রা বেশ বৈচিত্র্যময়। এই পর্বের বহু প্রজাতি বহিঃপরজীবী বা অন্তঃপরজীবী হিসেবে অন্য জীবদেহের বাইরে বা ভিতরে বসবাস করে। তবে কিছু প্রজাতি মুক্তজীবী হিসেবে স্বাদু পানিতে আবার কিছু প্রজাতি লবণাক্ত পানিতে বাস করে। এই পর্বের কোনো কোনো প্রাণী ভেজা ও স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বাস করে। যকৃত কৃমি, ফিতা কৃমি এই পর্বের অন্তর্গত।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহ চ্যাপ্টা, উভলিঙ্গ।
- বহিঃপরজীবী বা অন্তঃপরজীবী।
- দেহ পুরু কিউটিকল দ্বারা আবৃত।
- দেহে চোষক ও আঁটা থাকে।
- দেহে শিখা অঙ্গ নামে বিশেষ অঙ্গ থাকে, এগুলো রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।
- পৌষ্টিকতন্ত্র অসম্পূর্ণ বা অনুপস্থিত।

চিত্র ১.৩ : (ক) Fasciola (খ) Taenia

উদাহরণ : Fasciola (যকৃৎ কৃমি) Taenia (ফিতা কৃমি)

৪. পর্ব : নেমাটোডা (Nematoda)

অনেকে একে নেমাথেলমিনথেস বলে।

স্বভাব ও বাসস্থান : Nema শব্দের অর্থ সুতা। এই শব্দটি থেকে এই পর্বের নামকরণ করা হয়েছে। এই পর্বের অনেক প্রাণী অন্তঃপরজীবী হিসেবে প্রাণীর অন্ত্র ও রক্তে বসবাস করে। এসব পরজীবী বিভিন্ন প্রাণী ও মানবদেহে বাস করে নানারকম ক্ষতি সাধন করে। তবে অনেক প্রাণীই মুক্তজীবী, যারা পানি ও মাটিতে বাস করে। গোল কৃমি, ফাইলেরিয়া কৃমি, চোখের কৃমি এই পর্বের অন্তর্গত।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহ নলাকার ও পুরু ত্বক দ্বারা আবৃত।
- পৌষ্টিকনালি সম্পূর্ণ, মুখ ও পায়ু ছিদ্র উপস্থিত।
- শ্বসনতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত।
- সাধারণত একলিঙ্গ।
- দেহ গহ্বর অনাবৃত ও প্রকৃত সিলোম নাই।

উদাহরণ : Ascaris (গোল কৃমি) Loa loa (চোখের কৃমি)

চিত্র ১.৪ : Ascaris

৫. পর্ব : অ্যানেলিডা (Annelida)

স্বভাব ও বাসস্থান : Annulus শব্দের অর্থ আংটি। এই শব্দটি থেকে এই পর্বের নামকরণ করা হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সকল নাতিশীতোষ্ণ ও উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে এই পর্বের প্রাণীদের পাওয়া যায়। এদের বহু প্রজাতি স্বাদু পানিতে এবং কিছু প্রজাতি অগভীর সমুদ্রে বাস করে। এই পর্বের বহু প্রাণী সৈঁতসেঁতে মাটিতে বসবাস করে। কিছু প্রজাতি পাথর ও মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বসবাস করে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহ নলাকার ও খণ্ডায়িত।
- নেফ্রিডিয়া নামক রেচন অঙ্গ থাকে।
- প্রতিটি খণ্ডে সিটা থাকে (জোঁকে থাকে না)। সিটা চলাচলে সহায়তা করে।

উদাহরণ : কেঁচো, জোঁক

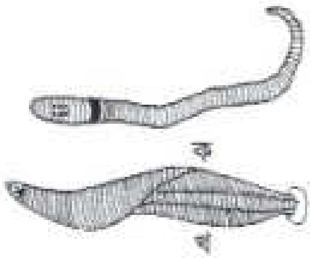

চিত্র ১.৫ : (ক) কেঁচো (খ) জোঁক

৬. পর্ব : আর্থ্রোপোডা (Arthropoda)

স্বভাব ও বাসস্থান : Arthro শব্দের অর্থ সন্ধি, Poddos শব্দের অর্থ পা। এই শব্দ দুটি থেকে এই পর্বের নামকরণ করা হয়েছে। এই পর্বটি প্রাণিজগতের সবচেয়ে বৃহত্তম পর্ব। এরা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সকল পরিবেশে বাস করতে সক্ষম। এদের বহু প্রজাতি অন্তঃপরজীবী ও বহিঃপরজীবী হিসেবে বাস করে। বহু প্রাণী স্থলে, স্বাদু পানিতে ও সমুদ্রে বাস করে। এ পর্বের অনেক প্রজাতির প্রাণী ডানার সাহায্যে উড়তে পারে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহ মস্তক, বক্ষ ও উদর এই তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত ও সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ বিদ্যমান।
- মাথায় একজোড়া পুঞ্জাক্ষি ও অ্যান্টেনা থাকে।
- নরম দেহ কাইটিন সমৃদ্ধ শক্ত আবরণী দ্বারা আবৃত।
- ম্যালপিজিয়ান নালিকা নামক রেচন অঙ্গ বিদ্যমান।
- দেহের রক্তপূর্ণ গহ্বর হিমোসিল নামে পরিচিত।

উদাহরণ : প্রজাপতি, চিংড়ি, আরশোলা, কাঁকড়া

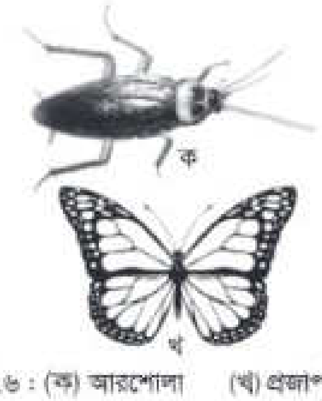

চিত্র ১.৬ : (ক) আরশোলা (খ) প্রজাপতি

৭. পর্ব : মলাস্কা (Mollusca)

স্বভাব ও বাসস্থান : Molluscus শব্দ থেকে এই পর্বের নামকরণ, যার অর্থ হল নরম। এটি প্রাণিজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব। এই পর্বের প্রাণীদের গঠন, বাসস্থান ও স্বভাব বৈচিত্র্যপূর্ণ। এরা পৃথিবীর প্রায় সকল পরিবেশে বাস করে। প্রায় সবাই সামুদ্রিক এবং সাগরের বিভিন্ন স্তরে বাস করে। কিছু কিছু প্রজাতি পাহাড়ি অঞ্চলে, বনেজঙ্গলে ও স্বাদু পানিতে বাস করে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহ নরম। নরম দেহটি সাধারণত শক্ত খোলস দ্বারা আবৃত থাকে।
- পেশিবহুল পা দিয়ে এরা চলাচল করে।
- ফুসফুস বা ফুলকার সাহায্যে শ্বসনকার্য চালায়।

উদাহরণ : শামুক, ঝিনুক

চিত্র ১.৭ : শামুক

৮. পর্ব : একাইনোডারমাটা (Echinodermata)

স্বভাব ও বাসস্থান : Echinos শব্দের অর্থ কাঁটা derma শব্দের অর্থ ত্বক। এই শব্দ দুটি নিয়েই পর্বটির নামকরণ করা হয়েছে। এই পর্বের সকল প্রাণী সামুদ্রিক। পৃথিবীর সকল মহাসাগরে এবং সকল গভীরতায় এদের বসবাস করতে দেখা যায়। এদের স্থলে বা মিঠা পানিতে পাওয়া যায় না। এরা অধিকাংশ মুক্তজীবী।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহত্বক কাঁটাযুক্ত।
- দেহ পাঁচটি সমান ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ পঞ্চ অরীর প্রতিসম।
- পানি সংবহনতন্ত্র থাকে এবং নালিপদের সাহায্যে চলাচল করে।
- পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে অঙ্কীয় ও পৃষ্ঠদেশ নির্ণয় করা যায় কিন্তু মাথা চিহ্নিত করা যায় না।

উদাহরণ : তারামাছ, সমুদ্র শশা

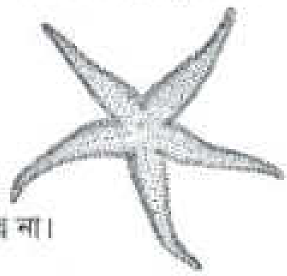

চিত্র ১.৮ : তারামাছ

পাঠ ৬–৮ : মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস

৯. পর্ব : কর্ডাটা (Chordata)

স্বভাব ও বাসস্থান : Chordata শব্দটি এসেছে chorda শব্দ থেকে, যার অর্থ রজ্জু বা নালী। এরা পৃথিবীর সকল পরিবেশে বাস করে। এদের বহু প্রজাতি ডাঙ্গায় বাস করে। জলচর কর্ডাটাদের মধ্যে বহু প্রজাতি স্বাদু পানিতে অথবা সমুদ্রে বাস করে। বহু প্রজাতি বৃক্ষবাসী, মরুবাসী, মেরুবাসী, গুহাবাসী ও খেচর। কর্ডাটা পর্বের বহু প্রাণী বহিঃপরজীবী হিসেবে অন্য প্রাণীর দেহে সংলগ্ন হয়ে জীবনযাপন করে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- এই পর্বের প্রাণীর সারা জীবন অথবা ভ্রূণ অবস্থায় পৃষ্ঠীয়দেশ বরাবর নটোকর্ড অবস্থান করে। নটোকর্ড হলো একটি নরম, নমনীয়, দণ্ডাকার, দৃঢ় ও অখণ্ডায়িত অঙ্গ।
- পৃষ্ঠদেশে একক, ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু থাকে।
- সারা জীবন অথবা জীবন চক্রের কোনো এক পর্যায়ে পার্শ্বীয় গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র থাকে।

উদাহরণ : মানুষ, কুনোব্যাঙ, রুই মাছ

কর্ডাটা পর্বকে তিনটি উপপর্বে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. ইউরোকর্ডাটা (Urochordata)

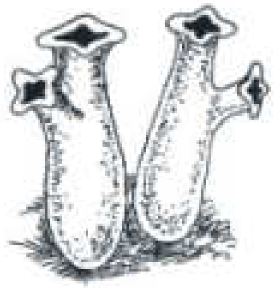

চিত্র ১.৯ : *Ascidia*

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- প্রাথমিক অবস্থায় ফুলকারন্ধ্র, পৃষ্ঠীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু থাকে।
- শুধুমাত্র লার্ভা দশায় এদের লেজে নটোকর্ড থাকে।

উদাহরণ : *Ascidia*

খ. সেফালোকর্ডাটা (Cephalochordata)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

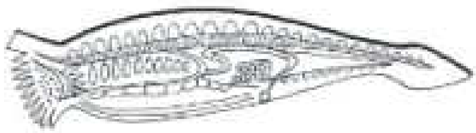

চিত্র ১.১০ : *Branchiostoma*

- সারাজীবনই এদের দেহে নটোকর্ডের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।
- দেখতে মাছের মতো।

উদাহরণ : *Branchiostoma*

গ. ভার্টিব্রাটা (Vertebrata)

এই উপ-পর্বের প্রাণীরাই মেরুদণ্ডী প্রাণী হিসেবে পরিচিত। গঠন ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ৭টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

১. শ্রেণি– সাইক্লোস্টোমাটা (Cyclostomata)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

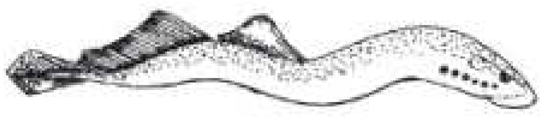

চিত্র ১.১১ : *Petromyzon*

- লম্বাটে দেহ।
- মুখছিদ্র গোলাকার এবং চোয়ালবিহীন।
- এদের দেহে আঁইশ বা যুগ্ম পাখনা অনুপস্থিত।
- ফুলকাছিদ্রের সাহায্যে শ্বাস নেয়।

উদাহরণ : *Petromyzon*

২. শ্রেণি– কনড্রিকথিস (Chondrichthyes)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

চিত্র ১.১২ : হাতুড়ি মাছ।

- এ পর্বের সকল প্রাণী সমুদ্রে বাস করে।
- কঙ্কাল তরুণাস্থিময়। মুখছিদ্র দেহের অঙ্কীয় দেশে অবস্থিত।
- দেহ প্ল্যাকয়েড আঁইশ দ্বারা আবৃত, মাথার দুই পাশে ৫–৭ জোড়া ফুলকাছিদ্র থাকে।
- কানকো থাকে না। লেজের দুটি অংশ ভিন্ন আকৃতির অর্থাৎ হেটেরোসার্কাল।

উদাহরণ : হাঙর, করাত মাছ, হাতুড়ি মাছ

৩. শ্রেণি– অস্টিকথিস (Osteichthyes)

চিত্র ১.১৩ : ইলিশ মাছ

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- অধিকাংশই স্বাদু পানির মাছ।
- মুখছিদ্র দেহের সম্মুখ প্রান্তে।
- দেহ সাইক্লোয়েড, গ্যানয়েড বা টিনয়েড ধরনের আঁইশ দ্বারা আবৃত।
- মাথার দুই পাশে চার জোড়া ফুলকা থাকে। ফুলকাগুলো কানকো দিয়ে ঢাকা থাকে। ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।
- লেজের দুটি অংশ একই রকম। অর্থাৎ হোমোসার্কাল।

উদাহরণ : ইলিশ মাছ, সি–হর্স

> **কাজ** : লইট্যা, রূপচাদা, পোয়া, কোরাল, পাবদা, কৈ, শিং ও মাগুর মাছ সংগ্রহ করো। এগুলো কোন শ্রেণিভুক্ত মাছ? এদের বৈশিষ্ট্যগুলো শনাক্ত করো।

৪. শ্রেণি– উভচর (Amphibia)

মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে যারা জীবনের প্রথম অবস্থায় সাধারণত পানিতে থাকে এবং মাছের মতো বিশেষ ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়, পরিণত বয়সে ডাঙ্গায় বাস করে তারাই উভচর।

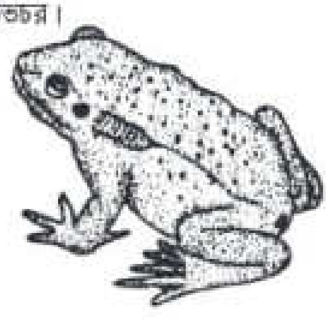

চিত্র ১.১৪ : কুনোব্যাঙ

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহত্বক আঁইশবিহীন।
- ত্বক নরম, পাতলা, ভেজা ও গ্রন্থিযুক্ত।
- শীতল রক্তের প্রাণী।
- পানিতে ডিম পাড়ে। জীবনচক্রে সাধারণত ব্যাঙাচি দশা দেখা যায়।

উদাহরণ : সোনাব্যাঙ, কুনোব্যাঙ

৫. শ্রেণি– সরীসৃপ (Reptilia)

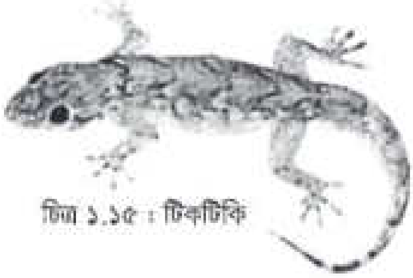

চিত্র ১.১৫ : টিকটিকি

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- বুকে ভর করে চলে।
- ত্বক শুষ্ক ও আঁইশযুক্ত।
- চার পায়েই পাঁচটি করে নখরযুক্ত আঙ্গুল আছে।

উদাহরণ : টিকটিকি, কুমির, সাপ

৬. শ্রেণি– পক্ষীকুল (Aves)

চিত্র ১.১৬ : দোয়েল

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহ পালকে আবৃত।
- দুটি ডানা, দুটি পা ও একটি চঞ্চু আছে।
- ফুসফুসের সাথে বায়ুথলি থাকায় সহজে উড়তে পারে।
- উষ্ণ রক্তের প্রাণী।
- হাড় শক্ত, হালকা ও ফাঁপা।

উদাহরণ : কাক, দোয়েল, হাঁস

৭. শ্রেণি– স্তন্যপায়ী (Mammalia)

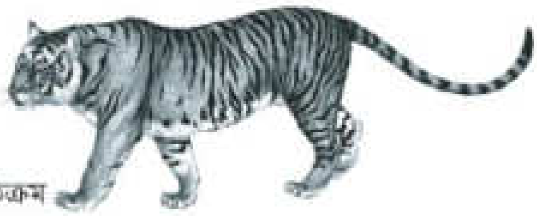

চিত্র ১.১৭ : বাঘ

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহ লোমে আবৃত।
- স্তন্যপায়ী প্রাণীরা সন্তান প্রসব করে। তবে এর ব্যতিক্রম আছে, যেমন– প্লাটিপাস।
- উষ্ণ রক্তের প্রাণী।
- চোয়ালে বিভিন্ন ধরনের দাঁত থাকে।
- শিশুরা মাতৃদুগ্ধ পান করে বড় হয়।
- হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট।
- ত্বকে বিভিন্ন রকমের গ্রন্থি বিদ্যমান।

উদাহরণ : মানুষ, উট, বাঘ

> কাজ : তোমরা পাঁচজনের একটি করে দল গঠন করো। এবার মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের চার্ট দেখে এদের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করো ও লিপিবদ্ধ করো। এবার তোমরা শ্রেণিতে উপস্থাপন করো। সকল দলের লেখা বৈশিষ্ট্যের সাথে তোমাদের লেখা বৈশিষ্ট্যগুলো মিলিয়ে নাও।

পাঠ ৯ : শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা

লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে পৃথক ভাবে শনাক্ত করা অসম্ভব ব্যাপার। কেবলমাত্র শ্রেণিবিন্যাসকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করে এ কাজটি করা সম্ভবপর হয়। একটি প্রাণীকে শনাক্ত করতে হলে প্রধানত সাতটি ধাপে এর বৈশিষ্ট্যগুলো মিলিয়ে নিতে হয়। এ ধাপগুলো হলো জগৎ (kingdom), পর্ব (Phylum), শ্রেণি (Class), বর্গ (Order), গোত্র (Family), গণ (Genus) ও প্রজাতি (Species)। অনেক সময় পর্বকে উপপর্ব বা Sub Phylum -এ ভাগ করা হয়।

শ্রেণিবিন্যাসের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সহজে, অল্প পরিশ্রমে ও অল্প সময়ে পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ এবং প্রাণী সম্বন্ধে জানা যায়। নতুন প্রজাতি শনাক্ত করতে শ্রেণিবিন্যাস অপরিহার্য। প্রাণিকূলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে প্রাণিকূলের মাঝে যে পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটছে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। অসংখ্য প্রাণিকূলকে একটি নির্দিষ্ট রীতিতে বিন্যস্ত করে গোষ্ঠীভুক্ত করা যায়। প্রাণীর মধ্যে মিল–অমিলের ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ আবিষ্কার করা যায়। প্রাণী সম্পর্কে সামগ্রিক ও পরিকল্পিত জ্ঞান অর্জন করা যায়। যেমন– সব এককোষী প্রাণীকে একটি পর্বে এবং বহুকোষী প্রাণীদের নয়টি পর্বে ভাগ করা হয়।

নতুন শব্দ : শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা, দ্বিপদ নামকরণ, প্রজাতি, অ্যানিম্যালিয়া, সিলোম, সিলেন্টেরন, হিমোসিল, সিটা, নটোকর্ড, লার্ভা, সাইক্লোয়েড, গ্যানয়েড।

এ অধ্যায় শেষে যা শিখলাম

- প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দেহগহ্বরকে সিলেন্টেরন বলে। এটা একাধারে পরিপাক ও সংবহনের কাজ করে।
- ভ্রূণের যে সকল কোষীয় স্তর থেকে পরবর্তীতে টিস্যু বা অঙ্গ সৃষ্টি হয় তাদের ভ্রূণস্তর বলে।
- বহুকোষী প্রাণীর পৌষ্টিকনালি এবং দেহপ্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে সিলোম বলে।
- হিমোসিলের ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়।
- প্রাণিজগতে আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।
- মলাস্কা পর্বের প্রাণীদের নরম দেহ ম্যান্টল দ্বারা আবৃত থাকে। এরা মাংসল পা দিয়ে চলাফেরা করে।
- যে সমস্ত প্রাণীকে এদের দেহের কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর একাধিকবার সমান দুই অংশে ভাগ করা যায় তাকে অরীয় প্রতিসম প্রাণী বলে। যেমন – তারামাছ।
- কর্ডাটা প্রাণিজগতের একটি পর্ব। এই পর্বের প্রাণীদের নটোকর্ড, স্নায়ুরজ্জু ও গলবিলীয় ফুলকাছিদ্র আছে এবং এরা কর্ডেট নামে পরিচিত।
- ভার্টিব্রাটা উন্নত প্রাণী। এদের নটোকর্ড শক্ত কশেরুকাযুক্ত মেরুদণ্ডে পরিবর্তিত হয়।
- স্নায়ুরজ্জুর সম্মুখ প্রান্ত স্ফীত হয়ে মস্তিষ্কে পরিণত হয়। মস্তিষ্ক করোটির মধ্যে সুরক্ষিত থাকে।
- জলজ ভার্টিব্রাটা ফুলকার সাহায্যে আর যারা স্থলে বাস করে তারা ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।
- ক্ষতিকর পোকাদের পেস্ট বলে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. যকৃৎ কৃমির রেচন অঙ্গ হলো ————।

২. চিংড়ির রক্তপূর্ণ গহ্বরকে ———— বলে।

৩. ———— পেশিবহুল পা দিয়ে চলাচল করে।

৪. ———— উপপর্বের প্রাণীরা মেরুদণ্ডী।

৫. ইউরোকর্ডাটা উপপর্বভুক্ত প্রাণীদের লেজে ————থাকে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোনো প্রাণীর দ্বিপদ নামে কয়টি অংশ থাকে? এ অংশগুলো কী কী? মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কী?

২. তোমার চেনাজানা পাঁচটি আর্থ্রোপোডার নাম লেখ?

৩. চিংড়ি কোন পর্বের প্রাণী? এদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

৪. স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

৫. ইউরোকর্ডাটার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি Mollusca পর্বের প্রাণী?

ক. কাঁকড়া খ. জোঁক

গ. তারামাছ ঘ. ঝিনুক

২. স্কাইফা ও হাইড্রা উভয়ই–

i. দ্বিস্তরী

ii. বহুকোষী

iii. সুগঠিত তন্ত্রবিহীন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের ছকটি লক্ষ করো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

m	প্রাণীর ডানা এবং হিমোসিল নামক দেহগহ্বর থাকে
n	প্রাণীর পালক এবং ফুসফুসের সাথে বায়ুথলি থাকে
o	প্রাণী ডিম পাড়ে এবং শীতল রক্তবিশিষ্ট
p	প্রাণীর আঁইশ এবং যুগ্ম পাখনা থাকে

৩. ছকের কোন প্রাণীটি অমেরুদণ্ডী?

ক. m খ. n

গ. o ঘ. p

৪. উড়তে পারে–

i. m ও n প্রাণী

ii. n ও o প্রাণী

iii. m ও p প্রাণী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

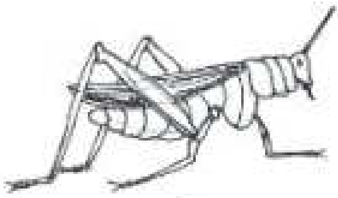

P

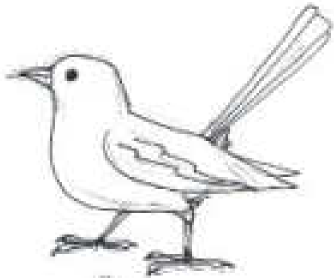

Q

ক. শ্রেণিবিন্যাস কী?

খ. বৈজ্ঞানিক নাম বলতে কী বোঝায়?

গ. P প্রাণীটি কোন শ্রেণির? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. প্রাণী দুইটি ভিন্ন শ্রেণিতে থাকার কারণ বিশ্লেষণ করো।

২. রাহাতের গায়ে মশার কামড় দেওয়া মাত্র সে এটিকে হাতচাপা দিয়ে ধরে ফেলল। একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সে এর উপাঙ্গ, চক্ষু ও দেহাবরণ পর্যবেক্ষণ করল। পরবর্তীতে সে তার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের আলোকে এটির শ্রেণিগত অবস্থান বোঝার চেষ্টা করল।

ক. ফিতাকৃমি কোন পর্বের প্রাণী?

খ. মানবদেহে নটোকর্ডের অবস্থান ব্যাখ্যা করো।

গ. রাহাতের পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রাণীটির শ্রেণিগত অবস্থান ব্যাখ্যা করো।

ঘ. প্রাণীটির শ্রেণিগত অবস্থান জানা রাহাতের জন্য প্রয়োজন কেন? বিশ্লেষণ করো।

নিজে করো

১. তুমি তোমার পরিবেশ থেকে কয়েকটি মেরুদণ্ডী প্রাণী সংগ্রহ করো এবং এদের বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করো।

২. কেঁচো, চিংড়ি, ঘাসফড়িং, শামুক, ঝিনুক, দোয়েল, রুই মাছ কোন পর্বভুক্ত প্রাণী? এদের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবের বৃদ্ধি ও বংশগতি

প্রতিটি জীবের দেহ কোষ দিয়ে গঠিত। এককোষী জীবগুলো কোষ বিভাজনের দ্বারা একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি কোষে বিভক্ত হয় এবং এভাবে বংশবৃদ্ধি করে। বহুকোষী জীবের দেহকোষের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে জীবদেহের সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটে। ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার পর বহুকোষী জীবের জীবন শুরু হয় একটি মাত্র কোষ থেকে। নিষিক্ত ডিম্বাণু অর্থাৎ এককোষী জাইগোট ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ কোষ দিয়ে গঠিত বিশাল দেহ।

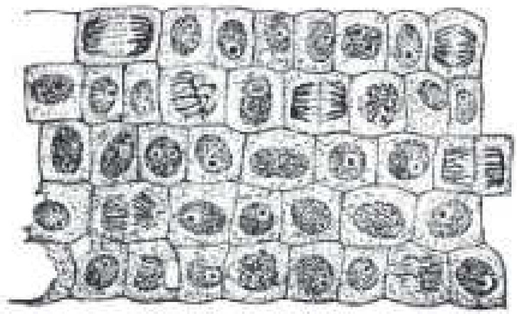

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জীবদেহের বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জীবের বংশগতির ধারা রক্ষায় কোষ বিভাজনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১ : কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ

জীবদেহে তিন ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায়, যথা– (১) অ্যামাইটোসিস (২) মাইটোসিস এবং (৩) মিয়োসিস।

অ্যামাইটোসিস: এ ধরনের কোষ বিভাজন ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট, ছত্রাক, অ্যামিবা ইত্যাদি আদিকোষী ও এককোষী জীবে হয়। এককোষী জীবগুলো অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে বংশবৃদ্ধি করে। এ ধরনের কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াসটি ডাম্বেলের আকার ধারণ করে এবং প্রায় মাঝ বরাবর সংকুচিত হয় ও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। একই সময়ে সাইটোপ্লাজমও মাঝ বরাবর সংকুচিত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হয়। এ ধরনের বিভাজনে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম সরাসরি বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে তাই একে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলে।

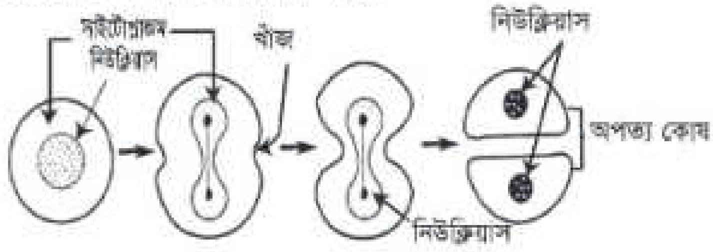

চিত্র ২.১ : অ্যামাইটোসিস

মাইটোসিস : উন্নত শ্রেণির প্রাণীর ও উদ্ভিদের দেহকোষ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস একবার বিভাজিত হয়ে সমআকৃতির, সমগুণ সম্পন্ন ও সমসংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে প্রাণী এবং উদ্ভিদ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের বিভাজনের দ্বারা উদ্ভিদের ভাজক টিস্যুর কোষের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে।

মিয়োসিস : জনন কোষ উৎপন্ন হওয়ার সময় মিয়োসিস কোষ বিভাজন ঘটে। এ ধরনের কোষ বিভাজনে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াসটি পরপর দুবার বিভাজিত হলেও ক্রোমোজোমের বিভাজন ঘটে মাত্র একবার। ফলে অপত্য কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। এ বিভাজনে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস পায় বলে এ ধরনের বিভাজনকে হ্রাসমূলক বিভাজনও বলা হয়। জনন মাতৃকোষ থেকে পুং ও স্ত্রী গ্যামেট উৎপন্ন হওয়ার সময় এ ধরনের কোষ বিভাজন হয়।

মাইটোসিস

মাইটোসিসের বৈশিষ্ট্য

- মাইটোসিস কোষ বিভাজন দেহকোষের এক ধরনের বিভাজন পদ্ধতি।
- এ প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের নিউক্লিয়াসটি একবার মাত্র বিভাজিত হয়।
- মাতৃকোষটি বিভাজিত হয়ে সমগুণ সম্পন্ন দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে।
- এ ধরনের বিভাজনে মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা এবং অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা সমান থাকে অর্থাৎ ক্রোমোজোম সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।
- এ ধরনের বিভাজনে প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বালম্বিভাবে দুভাগে বিভক্ত হয়। ফলে সৃষ্ট নতুন কোষ দুটিতে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার সমান থাকে। তাই মাইটোসিসকে ইকুয়েশনাল বা সমীকরণিক বিভাজনও বলা হয়।

মাইটোসিস কোথায় হয়

মাইটোসিস বিভাজন প্রকৃত নিউক্লিয়াসযুক্ত জীবের দেহকোষে ঘটে। উদ্ভিদের বর্ধনশীল অংশের ভাজক টিস্যু যেমন– কান্ড, মূলের অগ্রভাগ, ভ্রূণমুকুল ও ভ্রূণমূল, বর্ধনশীল পাতা, মুকুল ইত্যাদিতে এ রকম বিভাজন দেখা যায়। প্রাণিদেহের দেহকোষে, ভ্রূণের পরিবর্ধনের সময়, নিম্নশ্রেণির প্রাণীর ও উদ্ভিদের অযৌন জননের সময় এ ধরনের বিভাজন হয়।

চিত্র ২.২ : পত্র ও মূলের বর্ধনশীল অংশে কোষ বিভাজন

কোন কোন কোষে মাইটোসিস বিভাজন ঘটে না

প্রাণীর স্নায়ুটিস্যুর স্নায়ুকোষে, স্তন্যপায়ী প্রাণীর পরিণত লোহিত রক্ত কণিকা ও অনুচক্রিকা এবং উদ্ভিদের স্থায়ী টিস্যুর কোষে এ ধরনের বিভাজন ঘটে না।

পাঠ ২ : মাইটোসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতি

মাইটোসিস বিভাজনটি দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। প্রথম পর্যায়ে নিউক্লিয়াসের এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন হয়। নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে ক্যারিওকাইনেসিস এবং সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে সাইটোকাইনেসিস বলে। মাইটোসিস কোষ বিভাজন একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি। প্রথমে ক্যারিওকাইনেসিস অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের বিভাজন হয়, পরবর্তীতে সাইটোকাইনেসিস অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমের বিভাজন হয়। তবে ক্যারিওকাইনেসিস ও সাইটোকাইনেসিস শুরু হওয়ার আগে কোষটির নিউক্লিয়াসকে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে হয়। কোষটির এ অবস্থাকে ইন্টারফেজ বলে।

ক্যারিওকাইনেসিস

বিভাজিত কোষে নিউক্লিয়াসটির একটি জটিল পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্যারিওকাইনেসিস সম্পন্ন হয়। পরিবর্তনগুলো ধারাবাহিকভাবে ঘটে। বোঝার সুবিধার্থে এই পর্যায়টিকে পাঁচটি ধাপে বিভক্ত করা হয়েছে। ধাপগুলো– ১. প্রোফেজ, ২. প্রো-মেটাফেজ, ৩. মেটাফেজ, ৪. অ্যানাফেজ ও ৫. টেলোফেজ।

প্রোফেজ : এটি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ধাপ। এ ধাপে কোষে নিম্নলিখিত ঘটনাবলি ঘটে–

চিত্র ২.৩ : প্রোফেজ

১. কোষের নিউক্লিয়াস আকারে বড় হয়।
২. নিউক্লিয়ার জালিকা ভেঙ্গে গিয়ে কতগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যক আঁকাবাঁকা সুতার মতো অংশের সৃষ্টি হয়। এগুলোকে ক্রোমোজোম বলে। এরপর প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হয়ে দুটি ক্রোমাটিড গঠন করে। এগুলো সেন্ট্রোমিয়ার নামক একটি বিন্দুতে যুক্ত থাকে।

পাঠ ৩ : প্রো–মেটাফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ

প্রো–মেটাফেজ : এ ধাপটি স্বল্পস্থায়ী। এ ধাপে–

১. নিউক্লিয়ার পর্দা ও নিউক্লিওলাস প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।
২. কোষের উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত কতগুলো তন্তুর আবির্ভাব ঘটে। এগুলো মাকুর আকৃতি ধারণ করে তাই একে স্পিন্ডল যন্ত্র বলে। স্পিন্ডল যন্ত্রের মধ্যভাগকে বিষুবীয় অঞ্চল বলে। প্রাণিকোষে সেন্ট্রিওল দুটির চারদিক থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মির মতো অ্যাস্টার রশ্মির আবির্ভাব ঘটে এবং কোষের দুই বিপরীত মেরুতে পৌঁছাতে স্পিন্ডল তন্তু গঠন করে। তন্তুগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে স্পিন্ডল যন্ত্র গঠন করে।

স্পিন্ডল যন্ত্রের প্রত্যেকটা তন্তুকে স্পিন্ডল তন্তু বলে। এদের থেকে যে তন্তুগুলো ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারে যুক্ত হয় তাদেরকে ট্র্যাকসন ফাইবার বা আকর্ষণ তন্তু বলে।

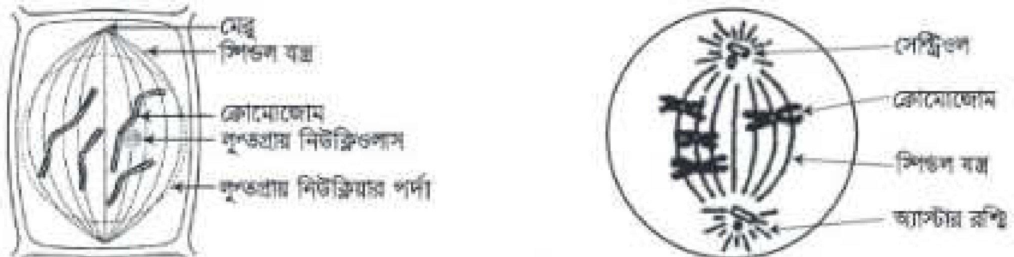

উদ্ভিদকোষ চিত্র ২.৪ : প্রো–মেটাফেজ প্রাণিকোষ

মেটাফেজ– এ ধাপে

১. ক্রোমোজোমগুলো স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চলে আসে এবং সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে তন্তু দিয়ে আটকে থাকে।
২. এ ধাপে ক্রোমোজোমগুলো সবচেয়ে খাটো ও মোটা দেখায়।

উদ্ভিদকোষ প্রাণিকোষ

চিত্র ২.৫ : মেটাফেজ

অ্যানাফেজ– এ ধাপে

১. প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, ফলে প্রত্যেক ক্রোমাটিডে একটি করে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে।

২. ক্রোমাটিডগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ অবস্থায় প্রতিটি ক্রোমাটিডকে অপত্য ক্রোমোজোম বলে।

৩. এরপর ক্রোমোজোমগুলোর সাথে যুক্ত আকর্ষণ তন্তুগুলোর সংকোচনের ফলে অপত্য ক্রোমোজোমের অর্ধেক উত্তর মেরুর দিকে এবং অর্ধেক দক্ষিণ মেরুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ সময় সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমগুলো ইংরেজি বর্ণমালার V, L, J অথবা I আকৃতি বিশিষ্ট হয়।

চিত্র ২.৬ : অ্যানাফেজ

পাঠ ৪ : টেলোফেজ – এ ধাপে

১. অপত্য ক্রোমোজোমগুলো বিপরীত মেরুতে এসে পৌঁছায়।

২. এরপর উভয় মেরুর ক্রোমোজোমগুলোকে ঘিরে নিউক্লিয়ার পর্দা এবং নিউক্লিওলাসের পুনঃ আবির্ভাব ঘটে। প্রাণিকোষে উভয় মেরুতে একটি করে সেন্ট্রিওল সৃষ্টি হয়।

৩. এ অবস্থায় ক্রোমোজোমগুলো সরু ও লম্বা আকার ধারণ করে পরস্পরের সাথে জট পাকিয়ে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম গঠন করে। এভাবে কোষের দুই মেরুতে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠিত হয় এবং ক্যারিওকাইনেসিসের সমাপ্তি ঘটে।

চিত্র ২.৭ : টেলোফেজ

সাইটোকাইনেসিস

নিউক্লিয়াসের বিভাজন শেষ হওয়ার সাথে সাথে সাইটোকাইনেসিস শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে টেলোফেজ দশাতেই সাইটোকাইনেসিস শুরু হয়। টেলোফেজ ধাপের শেষে বিষুবীয় তলে এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো জমা হয় এবং পরে এরা মিলিত হয়ে কোষপ্লেট গঠন করে। কোষপ্লেট পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে কোষপ্রাচীর গঠন করে। ফলে একটি মাতৃকোষ থেকে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়।

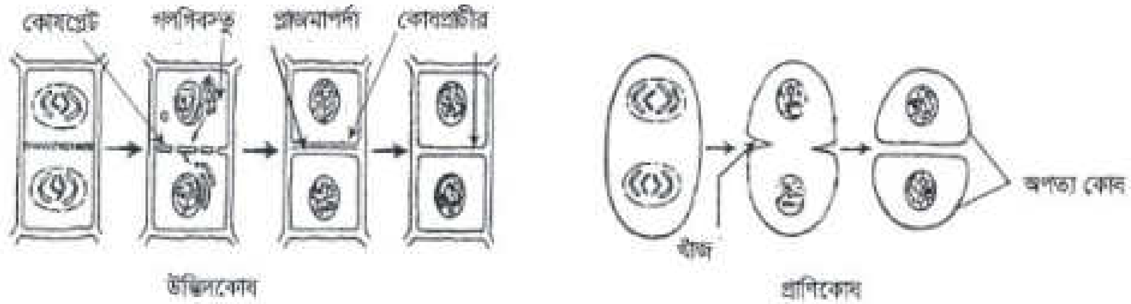

চিত্র ২.৮ : সাইটোকাইনেসিস

প্রাণিকোষের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের বিভাজনের সাথে সাথে কোষের মাঝামাঝি অংশে কোষপর্দার উভয় পাশ থেকে দুটি খাঁজ সৃষ্টি হয়। কোষপর্দার এ খাঁজ ক্রমশ ভিতরের দিকে গিয়ে নিরক্ষীয় তল বরাবরে বিস্তৃত হয় এবং মিলিত হয়ে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। তাহলে আমরা জানতে পারলাম উদ্ভিদ কোষের কোষপ্লেট গঠিত হয় এবং প্রাণিকোষে ক্লিভেজ বা ফারোয়িং পদ্ধতিতে সাইটোকাইনেসিস ঘটে।

পাঠ ৫ ও ৬ : মিয়োসিস

এ অধ্যায়ের শুরুতে জেনেছি মিয়োসিস কোষ বিভাজন কাকে বলে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মিয়োসিস কেন হয়?

মাইটোসিস কোষ বিভাজনে অপত্য কোষগুলোর ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের সমান থাকে। বৃদ্ধি ও অযৌন জননের জন্য মাইটোসিস কোষ বিভাজন অপরিহার্য। যৌন জননে পুং ও স্ত্রী জনন কোষের মিলনের প্রয়োজন পড়ে। যদি জননকোষগুলোর ক্রোমোজোম সংখ্যা দেহকোষের সমান থেকে যায় তাহলে জাইগোট কোষে জীবটির ক্রোমোজোম দেহকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার দ্বিগুণ হয়ে যাবে। মিয়োসিস কোষ বিভাজনে জননকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায়। ফলে দুটি জননকোষ একত্রিত হয়ে যে জাইগোট গঠন করে তার ক্রোমোজোম সংখ্যা প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যার অনুরূপ থাকে। এতে নির্দিষ্ট প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যার ধ্রুবতা বজায় থাকে।

জননকোষ সৃষ্টির সময় এবং নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদের জীবন চক্রের কোনো এক সময় যখন এরকম ঘটে তখন কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার সে অবস্থাকে হ্যাপ্লয়েড (n) বলে। যখন দুটি হ্যাপ্লয়েড কোষের মিলন ঘটে, তখন সে অবস্থাকে ডিপ্লয়েড (2n) বলে ।

চিত্র ২.৯ : মিয়োসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জাইগোট সৃষ্টি

সুতরাং মিয়োসিস কোষ বিভাজন হয় বলেই প্রতিটি প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় টিকে থাকতে পারে।

মিয়োসিসের বৈশিষ্ট্য

১. ডিপ্লয়েড জীবের জনন মাতৃকোষ ও হ্যাপ্লয়েড জীবের জাইগোটে মিয়োসিস ঘটে।

২. এ ধরনের কোষ বিভাজনে একটি কোষ থেকে চারটি কোষের সৃষ্টি হয়।

৩. ক্রোমোজোম একবার বিভক্ত হয় এবং নিউক্লিয়াস দুবার বিভক্ত হয়।

৪. সৃষ্ট চারটি কোষের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃ নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়।

মিয়োসিস কোথায় ঘটে

মিয়োসিস কোষ বিভাজন প্রধানত ডিপ্লয়েড (2n) জীবের জনন কোষ বা গ্যামেট সৃষ্টির সময় জনন মাতৃকোষে ঘটে। সপুষ্পক উদ্ভিদের পরাগধানী ও ডিম্বকের মধ্যে এবং উন্নত প্রাণিদেহে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় এর মধ্যে মিয়োসিস ঘটে। হ্যাপ্লয়েড (n) জীবের জাইগোটে মিয়োসিস ঘটে।

মিয়োসিস কোষ বিভাজন

মিয়োসিস কোষ বিভাজনের সময় একটি জনন মাতৃকোষ পরপর দুই ধাপে বিভাজিত হয়। প্রথম বিভাজনকে মিয়োসিস-১ এবং দ্বিতীয় বিভাজনকে মিয়োসিস-২ বলা হয়। প্রথম বিভাজনের সময় সৃষ্ট দুইটি অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়। দ্বিতীয় বিভাজনটি মাইটোসিস বিভাজনের অনুরূপ। অর্থাৎ প্রথম বিভাজনে উৎপন্ন প্রতিটি কোষ পুনরায় বিভাজিত হয়ে দুইটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার সমান হয়। ফলে একটি জনন মাতৃকোষ (2n) থেকে চারটি অপত্যকোষ (n) সৃষ্টি হয়।

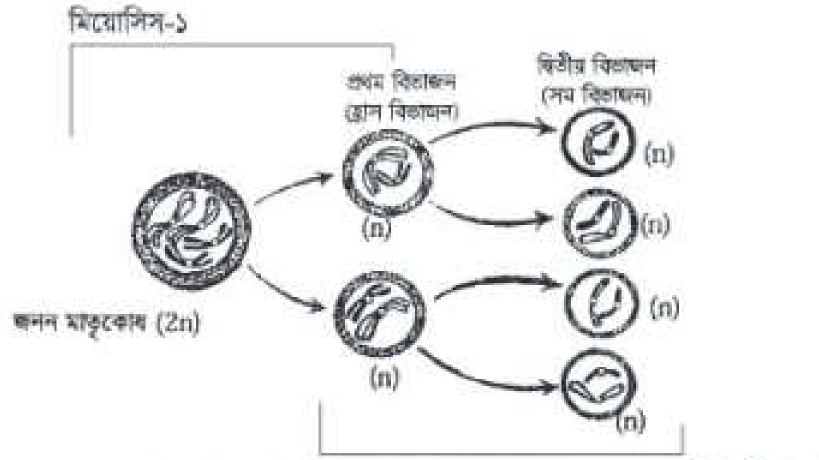

চিত্র ২.১০ : মিয়োসিস কোষ বিভাজনের নমুনা

পাঠ ৭–৯ : বংশগতি নির্ধারণে ক্রোমোজোম, DNA এবং RNA এর ভূমিকা

মা ও বাবার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সন্তানসন্ততি পেয়েই থাকে। মাতাপিতার বৈশিষ্ট্য যে প্রক্রিয়ায় সন্তানসন্ততিতে সঞ্চারিত হয়, তাকে বংশগতি বলে। আর সন্তানরা পিতামাতার যেসব বৈশিষ্ট্য পায়, সেগুলোকে বলে বংশগত বৈশিষ্ট্য। বংশগতি সম্বন্ধে এক সময় মানুষের ধারণা ছিল কাল্পনিক। পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা দিয়েছেন কীভাবে পিতামাতার বৈশিষ্ট্য তার সন্তানসন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম যিনি বংশগতির ধারা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দেন তার নাম গ্রেগর জোহান মেন্ডেল। বর্তমানে বংশগতি সম্বন্ধে আধুনিক যে তত্ত্ব প্রচলিত আছে, তা মেন্ডেলের আবিষ্কৃত তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জন্য জোহান মেন্ডেলকে বংশগতির জনক বলা হয়।

গ্রেগর জোহান মেন্ডেল
১৮২২-১৮৮৪

নিউক্লিয়াসে অবস্থিত নির্দিষ্ট সংখ্যক সুতার মতো যে অংশগুলো জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্য বহন করে, তাদের ক্রোমোজোম বলে। ক্রোমোজোমের গঠন ও আকার সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা পাই, তা প্রধানত মাইটোসিস কোষ বিভাজনের প্রোফেজ ধাপে সৃষ্ট ক্রোমোজোম থেকে পাই। প্রতিটি ক্রোমোজোমের প্রধান দুটি অংশ থাকে– ক্রোমাটিড ও সেন্ট্রোমিয়ার। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের প্রোফেজ ধাপে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোম লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হওয়ার পর যে দুটি সমান আকৃতির সুতার মতো অংশ গঠন করে, তাদের প্রত্যেকটিকে ক্রোমাটিড বলে। ক্রোমাটিড দুটি যে নির্দিষ্ট স্থানে পরস্পর যুক্ত থাকে তাকে সেন্ট্রোমিয়ার বলে। কোষ বিভাজনের সময় স্পিন্ডল তন্তু সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে যুক্ত হয়।

নিউক্লিক এসিড

নিউক্লিক এসিড দুই ধরনের যথা– DNA (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড) এবং RNA (রাইবো নিউক্লিক এসিড)। ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান DNA। বংশগতি ধারা পরিবহনে ক্রোমোজোমের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী DNA ও RNA এর গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণত ক্রোমোজোমের DNA অণুগুলোই জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত ধারক এবং জীবদেহের বৈশিষ্ট্যগুলো পুরুষানুক্রমে বহন করে। তাই

বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী DNA এর অংশকে জিন নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং DNA হলো ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনের রাসায়নিক রূপ। যেসব জীবে DNA থাকে না কেবল RNA থাকে, সে ক্ষেত্রে RNA জিন হিসেবে কাজ করে। যেমন– তামাক গাছের মোজাইক ভাইরাস (TMV)।

জীবের এক একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একাধিক জিন কাজ করে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটিমাত্র জিন বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের চোখের রং, চুলের প্রকৃতি, চামড়ার রং ইত্যাদি সবই জিন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। মানুষের মতো অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলোও তাদের ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্রোমোজোম জিনকে এক বংশ থেকে পরবর্তী বংশে বহন করার জন্য বাহক হিসাবে কাজ করে বংশগতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে।

মিয়োসিস কোষ বিভাজনের দ্বারা বংশগতির এ ধারা অব্যাহত থাকে। ক্রোমোজোম বংশগতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কোষ বিভাজনের সময় জিনকে সরাসরি মাতা-পিতা থেকে বহন করে পরবর্তী বংশধরে নিয়ে যায়। এ কারণে ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌতভিত্তি বলা হয়।

সুতরাং এ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম মিয়োসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বংশগতির ধারা অব্যাহত থাকে এবং ক্রোমোজমের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বংশানুক্রমে প্রতিটি প্রজাতির স্বকীয়তা রক্ষিত হয়।

মানুষের প্রতিটি দেহকোষে ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে। জনন কোষে এবং ভ্রূণের কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত হবে?

নতুন শব্দ : অ্যামাইটোসিস, মাইটোসিস, মিয়োসিস, হ্যাপ্লয়েড, ডিপ্লয়েড, স্পিন্ডল তন্তু, সাইটোকাইনেসিস, DNA, RNA, অপত্য কোষ, জাইগোট

এ অধ্যায় শেষে যা শিখলাম–

- জীবের বৃদ্ধি কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ঘটে।
- কোষ বিভাজন কয় প্রকার এবং এগুলো কোথায় ঘটে।
- জীবে ক্রোমোজোম সংখ্যা কীভাবে ধ্রুবক থাকে।
- হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড বলতে কী বোঝায়।
- বংশগতির ধারক জিন এবং বংশানুক্রমে এগুলোর বাহক ক্রোমোজোম।
- গ্রেগর জোহান মেন্ডেল বংশগতির জনক।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. ———— ধাপে ক্রোমোজোম ক্রোমাটিড সহ বিষুবীয় অঞ্চলে অবস্থান নেয়।

২. ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাস পায় ———— বিভাজনে।

৩. অ্যামিবায় ———— বিভাজন দেখা যায়।

৪. জীবের দেহকোষে ক্রোমোজোমের প্রকৃতি ————।

৫. নিউক্লিয়াস বিভাজন পদ্ধতিকে ———— বলে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মাইটোসিস বিভাজনের কোন ধাপে ক্রোমোজোমগুলো সর্বাধিক খাটো ও মোটা হয়?

ক. প্রোফেজ খ. প্রো–মেটাফেজ

গ. মেটাফেজ ঘ. অ্যানাফেজ

২. মানুষের চোখের রং নিয়ন্ত্রণ করে কোনটি?

ক. DNA খ. RNA

গ. নিউক্লিওলাস ঘ. সেন্ট্রোমিয়ার

নিচের অংশটুকু পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সাফওয়ান অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পিঁয়াজের মূলের কোষ পর্যবেক্ষণ করছিল। সে কোষ বিভাজনের একটি দশায় কোষের নিউক্লিয়াসে কোনো আবরণী ও নিউক্লিওলাস দেখতে পেল না, তবে ক্রোমোজোমগুলো কোষের ঠিক মাঝ বরাবর অবস্থান করতে দেখল।

৩. সাফওয়ান কোষ বিভাজনের কোন দশাটি পর্যবেক্ষণ করেছিল ?

ক. প্রোফেজ খ. প্রো–মেটাফেজ

গ. মেটাফেজ ঘ. অ্যানাফেজ

৪. সাফওয়ান এর পর্যবেক্ষণকৃত দশাটির পরবর্তী দশায়–

i. ক্রোমোজোমগুলো সেন্ট্রোমিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে

ii. ক্রোমাটিডগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে

iii. সেন্ট্রোমিয়ার দুভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফারাবী স্যার বিজ্ঞান ক্লাসে কোষ বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন, কোষ বিভাজনের একটি বিশেষ ধাপে নিউক্লিয়াসে অবস্থিত সুতার মতো অংশের সেন্ট্রোমিয়ার দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। ফলে বিভাজিত কোষে এর সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।

ক. কোন ধরনের কোষ বিভাজনে জননকোষ উৎপন্ন হয়?
খ. অ্যামাইটোসিস বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।
গ. ফারাবী স্যারের বর্ণিত বিশেষ ধাপটির সচিত্র বর্ণনা দাও।
ঘ. ফারাবী স্যারের বর্ণিত সুতার মতো অংশটির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

২.

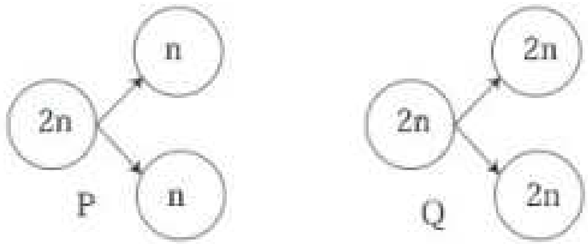

ক. মানুষের প্রতিটি দেহকোষে কয়টি ক্রোমোজোম রয়েছে?
খ. জিন বলতে কী বোঝায়?
গ. P কোষ বিভাজনটি ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উন্নত প্রাণীতে P ও Q কোষ বিভাজন দুইটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যাপন, অভিস্রবণ ও প্রস্বেদন

উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে মাটি থেকে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ শোষণ করে এবং সেই পানি ও রস কাণ্ডের ভিতর দিয়ে পাতায় পৌছায়। আবার উদ্ভিদ দেহে শোষিত পানি উদ্ভিদ বাষ্প আকারে দেহ থেকে বের করে দেয়। উদ্ভিদের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ এবং অক্সিজেন গ্যাস ত্যাগ, দেহে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ শোষণ, ঐ পানি ও দ্রবণ দেহের নানা অঙ্গে পরিবহন ও দেহ থেকে পানি বাষ্প আকারে বের করে দেয়া ব্যাপন, অভিস্রবণ, শোষণ, পরিবহন ও প্রস্বেদনের মাধ্যমে ঘটে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- ব্যাপন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অভিস্রবণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের পানি পরিত্যাগ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উদ্ভিদের পানি শোষণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১ ও ২ : ব্যাপন

আমরা জানি সব পদার্থই কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু দিয়ে তৈরি। এ অণুগুলো সবসময় গতিশীল বা চলমান অবস্থায় থাকে। তরল ও গ্যাসের ক্ষেত্রে অণুগুলোর চলন দ্রুত হয় এবং বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের দিকে অণুগুলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে যতক্ষণ না অণুগুলোর ঘনত্ব দুই স্থানে সমান হয়। অণুগুলোর এরূপ চলন প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে। ব্যাপনকারী পদার্থের অণু-পরমাণুগুলোর গতিশক্তির প্রভাবে এক প্রকার চাপ সৃষ্টি হয়, যার প্রভাবে অধিক ঘনত্বযুক্ত স্থান থেকে কম ঘনত্বযুক্ত স্থানে অণুগুলো ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রকার চাপকে ব্যাপন চাপ বলে। কোনো পদার্থের অণুর ব্যাপন ততক্ষণ চলতে থাকে, যতক্ষণ না উক্ত পদার্থের অণুগুলোর ঘনত্ব সর্বত্র সমান হয়। অণুগুলোর ঘনত্ব সমান হওয়া মাত্রই পদার্থের ব্যাপন বন্ধ হয়ে যায়।

ব্যাপন কী তা কয়েকটি পরীক্ষার মাধ্যমে সহজে বোঝা যায়। পরীক্ষালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করে ব্যাপন সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান পাওয়া যায়। নিচে ব্যাপন প্রক্রিয়ার কয়েকটি পরীক্ষা আলোচনা করা হলো–

চিত্র ৩.১ : সেন্টের ব্যাপন।

ব্যাপনের অনেক প্রমাণ আমাদের আশেপাশেই দেখা যায়। যেমন– ঘরে সেন্ট বা আতর ছড়ালে বা ধূপ জ্বালালে সমস্ত ঘরে তার সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। এটি ব্যাপনের কারণে ঘটে। ধূপের ধোঁয়া ও সেন্টের অণুগুলো অধিক ঘনত্ব সম্পন্ন হওয়ায় সম্পূর্ণ ঘরে কম ঘনত্ব সম্পন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তাই সমস্ত ঘর সুবাসে ভরে যায়।

কাজ : পানিতে তুঁতের ব্যাপন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ: তুঁতে, বিকার, পানি

পদ্ধতি : কিছু পরিমাণ তুঁতে বিকারের পানিতে ফেলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। তুঁতে পানিতে দ্রবীভূত হবে এবং সমস্ত পানির রং তুঁতের রং ধারণ করবে। কেন এমন হলো ব্যাখ্যা করো। পরিশেষে আমাদের চারপাশে সংঘটিত বিভিন্ন ব্যাপন ক্রিয়ার তালিকা তৈরি করো।

ব্যাপনের গুরুত্ব : জীবের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যাপন প্রক্রিয়া ঘটে। যেমন– উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের সময় বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। এই অত্যাবশ্যক কাজ ব্যাপন দ্বারা সম্ভব হয়। জীবকোষে শ্বসনের সময় গ্লুকোজ জারণের জন্য অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়। ব্যাপন ক্রিয়ার দ্বারা কোষে অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়ে যায়। উদ্ভিদ দেহে শোষিত পানি বাষ্পাকারে প্রস্বেদনের মাধ্যমে দেহ থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বের করে দেয়। প্রাণীদের শ্বসনের সময় অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের আদান–প্রদান, রক্ত থেকে পুষ্টি উপাদান, অক্সিজেন প্রভৃতি লসিকায় বহন এবং লসিকা থেকে কোষে পরিবহন করা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়।

পাঠ ৩ : অভিস্রবণ

অভিস্রবণ প্রক্রিয়াটি বোঝার জন্য আমাদের যে বিষয়ের ধারণা দরকার তার মধ্যে অন্যতম হলো ভিন্ন ঘনত্ব বিশিষ্ট দুইটি দ্রবণের মধ্যে অবস্থিত পর্দার বৈশিষ্ট্য জানা। পর্দাকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- অভেদ্য পর্দা, ভেদ্য পর্দা ও অর্ধভেদ্য পর্দা।

অভেদ্য পর্দা : যে পর্দা দিয়ে দ্রবক ও দ্রব উভয় প্রকার পদার্থের অণুগুলো চলাচল করতে পারে না তাকে অভেদ্য পর্দা বলে। যেমন– পলিথিন, কিউটিনযুক্ত কোষপ্রাচীর ইত্যাদি।

ভেদ্য পর্দা : যে পর্দা দিয়ে দ্রবক ও দ্রব উভয়েরই অণু সহজে চলাচল করতে পারে তাকে ভেদ্য পর্দা বলে। যেমন– কোষপ্রাচীর ।

অর্ধভেদ্য পর্দা : যে পর্দা দিয়ে কেবল দ্রবণের দ্রাবক অণু (উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পানি) চলাচল করতে পারে কিন্তু দ্রব অণু চলাচল করতে পারে না তাকে অর্ধভেদ্য পর্দা বলে। যেমন– কোষপর্দা, ডিমের খোসার ভিতরের পর্দা, মাছের পটকার পর্দা, জীব জন্তুর পিত্তথলির পর্দা ইত্যাদি।

আমরা লক্ষ করেছি যদি একটা শুকনা কিশমিশকে পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখি, তাহলে সেটি ফুলে উঠে। এটি কিশমিশ দ্বারা পানি শোষণের কারণে ঘটে এবং পানি শোষণ অভিস্রবণ দ্বারা ঘটে। অভিস্রবণও এক প্রকার ব্যাপন। অভিস্রবণ কেবলমাত্র তরলের ক্ষেত্রে ঘটে এবং একটি অর্ধভেদ্য পর্দা অভিস্রবণের সময় দুটি তরলকে পৃথক করে রাখে। কিশমিশের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা এখানে বোঝানো হলো।

আমরা জানি দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একত্রে মিশ্রিত হলে স্বাভাবিকভাবেই এদের মধ্যে ব্যাপন সংঘটিত হয়। লক্ষ করে দেখ, কিশমিশের ভিতরের পানি শুকিয়ে যাওয়ার ফলে কিশমিশগুলো কুঁচকে গেছে। কিশমিশগুলো পানিতে রাখলে পানি শোষণ করে ফুলে উঠবে। কারণ কিশমিশের ভিতরে শর্করার গাঢ় দ্রবণ একটি পর্দা দ্বারা পানি থেকে পৃথক হয়ে আছে। ফলে শুধু পানির অণু কিশমিশের অভ্যন্তরে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছে, কিন্তু শর্করা অণু এই রকম পর্দা ভেদ করে বাইরে আসতে পারছে না। এ ধরনের পর্দাকে অর্ধভেদ্য পর্দা বলে।

চিত্র ৩.২ : কিশমিশের সাহায্যে অভিস্রবণ পরীক্ষা

যে প্রক্রিয়ায় একই পদার্থের কম ঘনত্ব এবং বেশি ঘনত্বের দুটি দ্রবণ অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথক করা হলে দ্রাবক পদার্থের অণুগুলো কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে অধিক ঘনত্বের দ্রবণের দিকে যায়, তাকে অভিস্রবণ বা অসমোসিস (Osmosis) বলে (চিত্র ৩.৩)। অন্যভাবে বলা যায়, দ্রাবক তার বেশি ঘনত্বের অঞ্চল থেকে কম ঘনত্বের অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয় অর্ধভেদ্য পর্দার ভিতর দিয়ে।

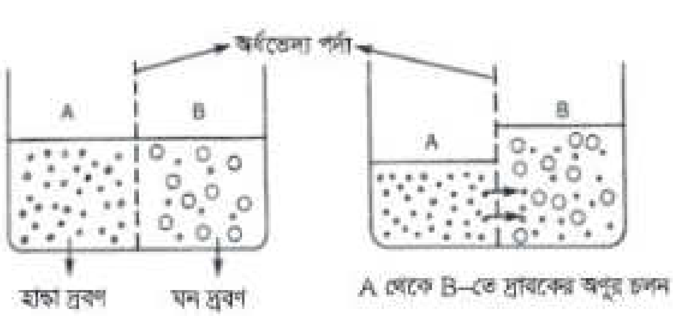

চিত্র ৩.৩ : অভিস্রবণ প্রক্রিয়া

পাঠ ৪ : অভিস্রবণের গুরুত্ব

জীবকোষের কোষাবরণ বা প্লাজমা পর্দা অর্ধভেদ্য পর্দা হিসেবে কাজ করে। প্লাজমা পর্দা দিয়ে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মাটিস্থ পানি মূলরোমের মধ্যে প্রবেশ করে বা বাইরে আসে। কোষস্থিত পানি খনিজ লবণকে

দ্রবীভূত করে কোষ রসে পরিণত হয়। সুতরাং কোষের মধ্যে বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোকে সচল রাখার জন্য অভিস্রবণের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভিদ কোষের রসস্ফীতি ঘটে। এটি কাণ্ড ও পাতাকে সতেজ রাখতে সাহায্য করে, ফুলের পাপড়ি বন্ধ বা খুলতে পারে। তাছাড়া অভিস্রবণের মাধ্যমেই প্রাণীর অন্ত্রে খাদ্য শোষিত হতে পারে।

কাজ : অভিস্রবণের পরীক্ষা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : থিসল ফানেল, মাছের পটকা, বিকার, চিনির গাঢ় দ্রবণ, স্ট্যান্ড-ক্ল্যাম্প

পদ্ধতি : থিসল ফানেলের চওড়া মুখটি মাছের পটকায় ঢেকে সুতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে এবং বিকারটিতে অর্ধেক পানি নিতে হবে। বিকারে পানি নেওয়ার পর থিসল ফানেলের নল দিয়ে চিনির গাঢ় দ্রবণ ঢালতে হবে। এবার ফানেলের চওড়া মুখটি বিকারের পানিতে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে ফানেলটিকে ক্ল্যাম্পের সাহায্যে স্ট্যান্ডের সাথে আটকে রাখতে হবে। এরপর ফানেলের নলে চিনির দ্রবণের তলটি মার্কার পেন দিয়ে চিহ্নিত করে পরীক্ষা-ব্যবস্থাটিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিতে হবে।

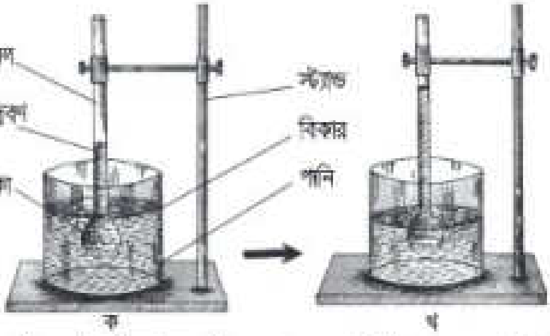

চিত্র ৩.৪ : অভিস্রবণের পরীক্ষা ক. পরীক্ষার শুরুতে, খ. পরীক্ষার কয়েক ঘণ্টা পরে

পর্যবেক্ষণ : কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে থিসল ফানেলের নলের দ্রবণের তল উপরের দিকে উঠে গেছে। আরও কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ফানেলের নলের দ্রবণের তল আর উপরে উঠছে না।

এ পরীক্ষায় তুমি যা পর্যবেক্ষণ করলে তা থেকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ-

১. মাছের পটকার পর্দাটি কী ধরনের পর্দা?

২. চিনির দ্রবণ কেন ফানেলের নলের উপরে উঠে আসলো?

৩. কিছুক্ষণ পর ফানেলের দ্রবণ উপরে না উঠে স্থিরভাবে কেন অবস্থান করল?

পাঠ ৫ : উদ্ভিদের পানি ও খনিজ লবণ শোষণ

উদ্ভিদের পানি শোষণ পদ্ধতি : মাটি থেকে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ উদ্ভিদ দেহের সজীব কোষে টেনে নেওয়ার পদ্ধতিকে সাধারণভাবে শোষণ বলা যেতে পারে। স্থলে বসবাসকারী উদ্ভিদগুলো মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে পানি শোষণ করে। পানিতে নিমজ্জিত উদ্ভিদ সারাদেহ দিয়ে পানি শোষণ করে। স্থলজ উদ্ভিদগুলোর মূলরোম মাটির সূক্ষ্মকণার ফাঁকে লেগে থাকা কৈশিক পানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় নিজ দেহে টেনে নেয়।

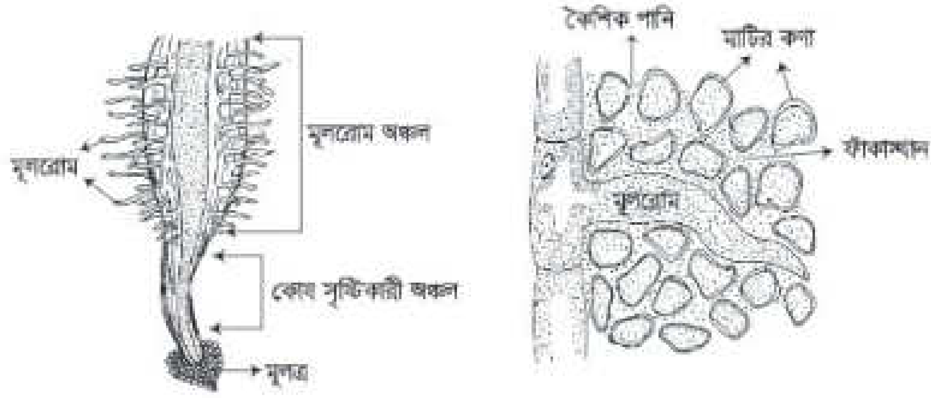

চিত্র ৩.৫ : মূলের বিভিন্ন অঞ্চল

মূলরোমের প্রাচীরটি ভেদ্য, তাই প্রথমে ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে এবং কোষপ্রাচীরের নিচে অবস্থিত অর্ধভেদ্য প্লাজমা পর্দার সংস্পর্শে আসে। মূলরোমের কোষীয় দ্রবণের ঘনত্বের তুলনায় তার পরিবেশের দ্রবণের ঘনত্ব কম থাকায় পানি (দ্রাবক) কোষের মধ্যে অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। মূলের বাইরের আবরণ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সব কোষের কোষ রসের ঘনত্ব সমান নয়। ফলে কোষান্তর অভিস্রবণের কারণে মূলের এক কোষ থেকে অন্য কোষে পানির গতি অব্যাহত থাকে এবং পরিশেষে পানি কাণ্ডের জাইলেম বাহিকার মাধ্যমে পাতায় পৌঁছায়।

ইমবাইবিশন : অধিকাংশ কলয়েডধর্মী পদার্থই পানিগ্রাহী। উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন ধরনের কলয়েডধর্মী পদার্থ বিদ্যমান। যথা– স্টার্চ, সেলুলোজ, জিলেটিন ইত্যাদি। এসব পদার্থ তাদের কলয়েডধর্মী গুণের জন্যই পানি শোষণ করতে সক্ষম। কলয়েডধর্মী বিভিন্ন পদার্থ (উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কোষপ্রাচীর) যে প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের তরল পদার্থ (উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পানি) শোষণ করে, তাকে ইমবাইবিশন বলে। আর শোষণকারী পদার্থটিকে হাইড্রোফিলিক পদার্থ বলে।

উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ পদ্ধতি : উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য কতগুলো খনিজ লবণের প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ লবণের উৎস মাটিস্থ পানি। মাটিস্থ পানিতে খনিজ লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

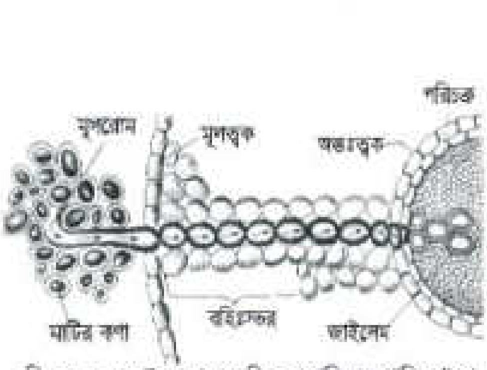

চিত্র ৩.৬ : মূলের কোষে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ

খনিজ লবণগুলো মাটিস্থ পানিতে দ্রবীভূত থাকলেও পানি শোষণের সঙ্গে উদ্ভিদের লবণ শোষণের কোনো সম্পর্ক নেই, দুটি প্রক্রিয়াই ভিন্নধর্মী । উদ্ভিদ কখনো লবণের সম্পূর্ণ অণুকে শোষন করতে পারে না। লবণগুলো কেবল আয়ন হিসেবে শোষিত হয়। উদ্ভিদ মাটির রস থেকে খনিজ লবণ শোষণ দুইভাবে সম্পন্ন করে। যথা– ১. নিষ্ক্রিয় শোষণ; ২. সক্রিয় শোষণ।

চিত্র ৩.৭ : মূল দ্বারা পানি ও খনিজ লবণ শোষণ

পাঠ ৬ : প্রস্বেদন

প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচন উদ্ভিদের একটি বিশেষ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। আমরা পূর্বের পাঠে জেনেছি, উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য পানি অপরিহার্য। তাই উদ্ভিদ মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণ পানি শোষণ করে। শোষিত পানির কিছু অংশ উদ্ভিদ তার বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে ব্যবহার করে এবং বাকি অংশ বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে পরিত্যাগ করে। উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তর থেকে পাতার মাধ্যমে বাষ্পাকারে পানির এই নির্গমনের প্রক্রিয়াকে প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচন বলে।

প্রস্বেদন প্রধানত পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে হয়। এছাড়া কাণ্ড ও পাতার কিউটিক্ল এবং কাণ্ডের ত্বকে অবস্থিত লেন্টিসেল নামক এক বিশেষ ধরনের অঙ্গের মাধ্যমেও অল্প পরিমাণ প্রস্বেদন হয়। প্রস্বেদন কোথায় সংঘটিত হচ্ছে তার ভিত্তিতে প্রস্বেদন তিন প্রকার যথা– ১. পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন, ২. ত্বকীয় বা কিউটিকুলার প্রস্বেদন এবং ৩. লেন্টিকুলার প্রস্বেদন।

চিত্র ৩.৮ : প্রস্বেদনের স্থান

কাজ সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পত্ররন্ধ্র এবং খালি চোখে কাণ্ডের লেন্টিসেল সহজে দেখা যায়।

কাজ : প্রস্বেদনের পরীক্ষা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : টবে লাগানো গাছ, টেবিল, পানি, পলিথিন, সুতা ও ভেসলিন

পদ্ধতি : দুটি টবে লাগানো গাছ টেবিলের উপর রেখে গাছের গোড়ায় পরিমাণ মতো পানি দাও। একটি গাছকে পাতাযুক্ত রেখে পলিথিনের মোড়ক দিয়ে ঢেকে দাও। তারপর গাছের গোড়ায় পলিথিনটি সুতা দিয়ে বেঁধে ঐ স্থানে ভেসলিনের প্রলেপ দাও।যাতে বাইরের থেকে বাতাস বা পানি যেতে না পারে। অপর গাছটির পাতাগুলো ছিড়ে ফেলে একইভাবে প্রথম গাছটির মতো পলিথিন মোড়ক দিয়ে ঢেকে ফেল। গাছ দুটিকে সূর্যের আলোতে রাখ।

চিত্র ৩.৯ : প্রস্বেদনের পরীক্ষা

পর্যবেক্ষণ : কিছুক্ষণ পর দেখবে পাতাযুক্ত গাছের টবে পলিথিনের ভিতরে বিন্দু বিন্দু পানি জমেছে কিন্তু পাতাবিহীন গাছের টবে পলিথিনের ভিতরে পানি জমেনি। পাতাযুক্ত গাছের টবে পলিথিনের ভিতরে কেন বিন্দু বিন্দু পানি জমেছে এবং পাতাবিহীন টবে পলিথিনে কেন পানি বিন্দু জমেনি? এ পরীক্ষা থেকে তুমি কী প্রমাণ করলে? তোমার এ পর্যবেক্ষণ থেকে তুমি কী সিদ্ধান্তে উপনীত হলে?

পাঠ ৭ : প্রস্বেদনের গুরুত্ব

উদ্ভিদ জীবনে প্রস্বেদন একটি অনিবার্য প্রক্রিয়া। প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদদেহ থেকে প্রচুর পানি বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায়। এতে উদ্ভিদের মৃত্যুও হতে পারে। তাই আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভিদের জীবনে প্রস্বেদনকে ক্ষতিকর প্রক্রিয়া বলেই মনে হয়। এজন্য প্রস্বেদনকে বলা হয় উদ্ভিদের জন্য এটি একটি "Necessary evil", তবুও প্রস্বেদন উদ্ভিদ জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদ তার দেহ থেকে পানিকে বের করে অতিরিক্ত পানির চাপ থেকে মুক্ত থাকে। প্রস্বেদনের ফলে কোষরসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। কোষরসের ঘনত্ব বৃদ্ধি অন্তঃঅভিস্রবণের সহায়ক হয়ে উদ্ভিদকে পানি ও খনিজ লবণ শোষণে সাহায্য করে। এটি উদ্ভিদদেহকে ঠান্ডা রাখে এবং পাতার আর্দ্রতা বজায় রাখে। প্রস্বেদনের ফলে খাদ্য তৈরির জন্য পাতায় অবিরাম পানি সরবরাহ সম্ভব হয়। পাতায় প্রস্বেদনের ফলে জাইলেম বাহিকায় পানির যে টান সৃষ্টি হয়, তা মূলরোম কর্তৃক পানি শোষণ ও উদ্ভিদের শীর্ষে পরিবহনে সাহায্য করে।

উদ্ভিদের প্রস্বেদন প্রক্রিয়া সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের মতো পরিবেশে তেমন কোনো প্রভাব রাখে না। তবে পানিচক্রে বাষ্পীভবনে, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের পানি জলীয়বাষ্প হিসেবে বায়ুমণ্ডলে প্রেরণ করতে স্থলজ উদ্ভিদের প্রস্বেদন প্রক্রিয়া ভূমিকা রাখে। প্রস্বেদনের ফলে প্রচুর পানি বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে পৌঁছায়।

পাঠ ৮–১০ : পানি ও খনিজ লবণের পরিবহন

আমরা জেনেছি যে উদ্ভিদ মূলের মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে। এই পানি ও খনিজ লবণের দ্রবণকে কাণ্ড এবং শাখা–প্রশাখার মধ্য দিয়ে পাতায় পৌঁছানো দরকার। কারণ পাতাই প্রধানত এগুলোকে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরির রসদ হিসেবে ব্যবহার করে। আবার পাতায় তৈরি খাদ্য উদ্ভিদ তার দেহের বিভিন্ন অংশে যথা– কাণ্ড ও শাখা–প্রশাখায় পাঠিয়ে দেয়। উদ্ভিদের মূলরোম দ্বারা শোষিত পানি ও খনিজ লবণ মূল থেকে পাতায় পৌঁছানো এবং পাতায় তৈরি খাদ্যবস্তু সারা দেহে ছড়িয়ে পড়াকে পরিবহন বলে। শোষণের মতো পরিবহন পদ্ধতি ও উদ্ভিদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। জাইলেম ও ফ্লোয়েম নামক পরিবহন টিস্যুর মাধ্যমে উদ্ভিদে পরিবহন ঘটে। জাইলেমের মাধ্যমে মূল দ্বারা শোষিত পানি পাতায় যায় এবং ফ্লোয়েম দ্বারা পাতায় উৎপন্ন তরল খাদ্য সারা দেহে পরিবাহিত হয়। সুতরাং জাইলেম ও ফ্লোয়েম হলো উদ্ভিদের পরিবহনের পথ। উদ্ভিদের পরিবহন প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিতভাবে সম্পন্ন হয়–

উদ্ভিদের মূলরোম দিয়ে পানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় এবং পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় শোষণ পদ্ধতিতে শোষিত হয়ে জাইলেম টিস্যুতে পৌঁছায়। জাইলেমের মাধ্যমে উদ্ভিদদেহে রসের ঊর্ধ্বমুখী পরিবহন হয়। ফ্লোয়েমের মাধ্যমে পাতায় তৈরি খাদ্যরসের উভমুখী পরিবহন হয়।

উদ্ভিদের সংবহন বা পরিবহন বলতে প্রধানত ঊর্ধ্বমুখী পরিবহন এবং নিম্নমুখী পরিবহনকে বোঝায়।

মাটি থেকে মূলরোমের দ্বারা শোষিত পানি ও খনিজ লবণের দ্রবণ (রস) যে জাইলেম বাহিকার মধ্য দিয়ে পাতায় পৌঁছায়, তা একটি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়। এ জন্য প্রয়োজন পেপারোমিয়া উদ্ভিদ। এ গাছের কাণ্ড ও মধ্য শিরা স্বচ্ছ।

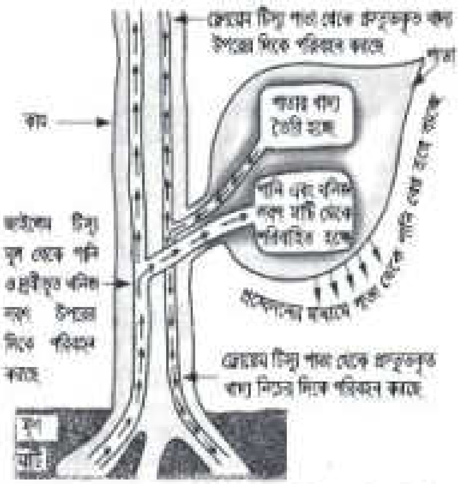

চিত্র ৩.১০ : উদ্ভিদদেহে পরিবহন (উভমুখী)

কাজ : পানি পরিবহনের পরীক্ষা

প্রয়োজনীয় উপকরণ: দোপাটি অথবা পেপারোমিয়া উদ্ভিদ, বোতল, তুলা, লাল রং, পানি

পদ্ধতি : একটি নরম কাণ্ডের দোপাটি অথবা পেপারোমিয়া উদ্ভিদ মাটি থেকে মূলসহ তুলে মূলগুলো পানিতে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। এখন একটি বোতলে পানি নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা লাল রং মেশাতে হবে। এবার গাছের মূলসহ অংশটি রঙিন পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা যাবে যে কাণ্ড এবং পাতার শিরাগুলো লাল রং ধারণ করেছে। গাছটি বোতল থেকে তুলে কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ বা লম্বচ্ছেদ করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখ এবং তা লিপিবদ্ধ করো। তোমার পর্যবেক্ষণ থেকে তুমি কী সিদ্ধান্তে উপনীত হলে এবং এতে কী প্রমাণ হলো?

চিত্র ৩.১১ : পানি পরিবহনের পরীক্ষা

নতুন শব্দ : ব্যাপন, অর্ধভেদ্য পর্দা, ভেদ্য পর্দা, অন্তঃঅভিস্রবণ, বহিঃঅভিস্রবণ, আয়ন, কোষরস, সক্রিয় শোষণ, নিষ্ক্রিয় শোষণ, প্রস্বেদন

এ অধ্যায় শেষে যা শিখলাম–

- ব্যাপন ও অভিস্রবণ প্রক্রিয়া কী?
- ব্যাপন ও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি, খনিজ লবণের আয়ন মাটিস্থ দ্রবণ থেকে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ মূলের মূলরোম দ্বারা শোষণ করে।
- উদ্ভিদের জাইলেম দিয়ে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ পাতায় পরিবাহিত হয়।
- উদ্ভিদের ফ্লোয়েম দিয়ে পাতায় তৈরি খাদ্য উদ্ভিদ দেহের শাখা ও প্রশাখায় পৌঁছায়।
- অভিস্রবণের ফলে খাদ্য তৈরির জন্য পাতায় অবিরাম পানি সরবরাহ সম্ভব হয়।
- প্রস্বেদনের ফলে জাইলেম বাহিকায় যে টান সৃষ্টি হয় তা মূলরোম কর্তৃক পানি শোষণে সাহায্য করে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. স্থলজ উদ্ভিদে প্রস্বেদন ঘটে------------- দিয়ে।

২. কোষপর্দা এক ধরনের ------------- পর্দা।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তর থেকে পাতার মাধ্যমে পানি নির্গমন প্রক্রিয়াকে কী বলে?

ক. ব্যাপন খ. অভিস্রবণ

গ. প্রস্বেদন ঘ. ইমবাইবিশন

২. অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায়–

i. অর্ধভেদ্য পর্দার প্রয়োজন হয়

ii. দ্রব কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের দিকে ধাবিত হয়

iii. দ্রবক কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের দিকে ধাবিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ঘর সাজানোর জন্য আনোয়ারা কিছু রজনীগন্ধা ফুল ফুলদানিতে রাখল। সন্ধ্যাবেলা সে লক্ষ করল, ফুলের সুবাসে সম্পূর্ণ ঘর ভরে গেছে। এই ঘটনার সংগে তার বিজ্ঞান বইয়ে পঠিত একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মিল লক্ষ করল।

৩. উদ্দীপকের বিশেষ প্রক্রিয়াটি কী?

ক. ব্যাপন খ. অভিস্রবণ

গ. প্রস্বেদন ঘ. শ্বসন

৪. উল্লিখিত প্রক্রিয়ায়–

i. জীবকোষে অক্সিজেন প্রবেশ করে
ii. উদ্ভিদ দেহ থেকে পানি বের করে দেয়
iii. উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জারিফের আম্মা একদিন সেমাই রান্না করার জন্য কিশমিশ ভিজিয়ে রাখলেন। কিছুক্ষণ পরে জারিফ লক্ষ করল, কিশমিশগুলো ফুলে গেছে। অন্যদিকে জারিফের বোন রংতুলি দিয়ে ছবি আঁকছিল। এ সময় হঠাৎ করে রং তুলিতে থাকা কিছুটা রং গ্লাসের পানির মধ্যে পড়ে পানিতে ছড়িয়ে গেল।

ক. ভেদ্য পর্দা কাকে বলে?
খ. ইমবাইবিশন বলতে কী বোঝায়?
গ. কোন প্রক্রিয়ায় জারিফের বোনের রং পানিতে ছড়িয়ে গেল? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. জারিফের লক্ষ করা কিশমিশ ফুলে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? বিশ্লেষণ করো।

২. বিদ্যালয় থেকে বাসায় ফিরে আনিবা লক্ষ করল, টবে থাকা গাছগুলো সব নেতিয়ে পড়েছে। বিকাল বেলা সে গাছগুলোতে পানি দিল। পরদিন সকালে দেখল গাছগুলো সতেজতা ফিরে পেয়েছে।

ক. ব্যাপন কাকে বলে?
খ. প্রস্বেদনকে কেন Necessary evil বলা হয়?
গ. টবে থাকা গাছগুলো নেতিয়ে পড়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. পরবর্তীতে গাছগুলো কীভাবে সতেজতা ফিরে পেল? বিশ্লেষণ করো।

প্রজেক্ট : একটা টবে মরিচ/টমেটো চারা গাছ লাগাও। টবে ইউরিয়ার ঘন দ্রবণ দাও। কয়দিন পরে পর্যবেক্ষণ করো, চারা গাছটির কী অবস্থা হয়েছে? পর্যবেক্ষণে যা দেখবে তা লিপিবদ্ধ করো এবং এর কারণ কী লেখ। এটি কী প্রমাণ করে তা শিক্ষকের সাথে আলোচনা করো। তোমার এই পর্যবেক্ষণ থেকে তুমি তোমার এলাকার কৃষক ভাইদের কী উপদেশ দিবে ?

চতুর্থ অধ্যায়

উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি

তোমরা লক্ষ করলে দেখবে একটি উদ্ভিদে বহু বীজ সৃষ্টি হয়। এই বীজগুলো থেকে নতুন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। এছাড়া উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ থেকেও নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। এ সবই উদ্ভিদের প্রজনন বা বংশ বৃদ্ধির উদাহরণ।

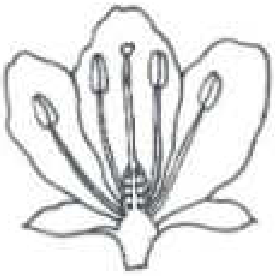

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- যৌন এবং অযৌন প্রজননের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব;
- পরাগায়ন ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিভিন্ন প্রকার পরাগায়নের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব;
- পরিবেশে সংঘটিত স্ব-পরাগায়ন এবং পর-পরাগায়ন চিহ্নিত করে কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পরীক্ষার মাধ্যমে অঙ্কুরোদগম প্রদর্শন করতে পারব।

পাঠ ১–৩ : প্রজনন বা জনন

পৃথিবীর প্রতিটি জীব মৃত্যুর পূর্বে তার বংশধর রেখে যেতে চায়। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। যে জটিল প্রক্রিয়ায় জীব তার প্রতিরূপ বা বংশধর সৃষ্টি করে তাকে প্রজনন বা জনন বলে। প্রজনন বা জনন প্রধানত দুই প্রকার, যথা- অযৌন ও যৌন জনন।

অযৌন জনন : যে প্রক্রিয়ায় দুটি ভিন্নধর্মী জনন কোষের মিলন ছাড়াই জনন সম্পন্ন হয় তাই অযৌন জনন। নিম্নশ্রেণির জীবে অযৌন জননের প্রবণতা বেশি। অযৌন জনন প্রধানত দুই ধরনের, যথা- স্পোর উৎপাদন ও অঙ্গজ জনন।

(ক) স্পোর উৎপাদন : প্রধানত নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে স্পোর বা অণুবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে বংশ রক্ষা করার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। উদ্ভিদের দেহকোষ পরিবর্তিত হয়ে অণুবীজবাহী একটি অঙ্গের সৃষ্টি করে। এদের অণুবীজথলি বলে। একটি অণুবীজথলিতে সাধারণত অসংখ্য অণুবীজ থাকে। তবে কখনো কখনো একটি থলিতে একটি অণুবীজ থাকতে পারে। থলির বাইরেও অণুবীজ উৎপন্ন হয়। এদের বহিঃঅণুবীজ বলে। বহিঃঅণুবীজের কোনো কোনোটিকে কনিডিয়াম বলে। *Mucor* এ থলির মধ্যে অসংখ্য অণুবীজ উৎপন্ন হয়। *Penicillium* কনিডিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে।

(খ) অজাজ জনন : কোনো ধরনের অযৌন রেণু বা জনন কোষ সৃষ্টি না করে দেহের অংশ খণ্ডিত হয়ে বা কোনো অঙ্গ রূপান্তরিত হয়ে যে জনন ঘটে, তাকে অজাজ জনন বলে। এ ধরনের জনন প্রাকৃতিক নিয়মে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটলে তাকে প্রাকৃতিক অজাজ জনন বলা হয়। যখন কৃত্রিমভাবে অজাজ জনন ঘটানো হয় তখন তাকে কৃত্রিম অজাজ জনন বলে।

প্রাকৃতিক অজাজ জনন : বিভিন্ন পদ্ধতিতে স্বাভাবিক নিয়মেই এ ধরনের অজাজ জনন দেখা যায়, যেমন–

১. **দেহের খণ্ডায়ন** : সাধারণত নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে এ ধরনের জনন দেখা যায়। *Spirogyra, Mucor* ইত্যাদি উদ্ভিদের দেহ কোনো কারণে খণ্ডিত হলে প্রতিটি খণ্ড একটি স্বাধীন উদ্ভিদ হিসেবে জীবনযাপন শুরু করে।

২. **মূলের মাধ্যমে** : কোনো কোনো উদ্ভিদের মূল থেকে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হতে দেখা যায়, যেমন–পটল, সেগুন ইত্যাদি। কোনো কোনো মূল খাদ্য সঞ্চয়ের মাধ্যমে বেশ মোটা ও রসাল হয়। এর গায়ে কুঁড়ি সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে নতুন উদ্ভিদ গজায়, যেমন– মিষ্টি আলু।

৩. **রূপান্তরিত কাণ্ডের মাধ্যমে** : উদ্ভিদের কোন অংশকে কাণ্ড বলে তা নিশ্চয়ই তোমরা জানো তবে কিছু কাণ্ডের অবস্থান ও বাইরের চেহারা দেখে তাকে কাণ্ড বলে মনেই হয় না। এরা পরিবর্তিত কাণ্ড। বিভিন্ন প্রতিকূলতায়, খাদ্য সঞ্চয়ে অথবা অজাজ জননের প্রয়োজনে এরা পরিবর্তিত হয়। এদের বিভিন্ন রূপ নিম্নে দেওয়া হলো :

(ক) টিউবার : কিছু কিছু উদ্ভিদে মাটির নিচের শাখার অগ্রভাগে খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে স্ফীত হয়ে কন্দের সৃষ্টি করে, এদের টিউবার বলে। ভবিষ্যতে এ কন্দ জননের কাজ করে। কন্দের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত থাকে। এগুলো দেখতে চোখের মতো তাই এদের চোখ বলা হয়। একটি চোখের মধ্যে একটি কুঁড়ি থাকে। আঁশের মতো অসবুজ পাতার (শল্কপত্র) কক্ষে এসব কুঁড়ি জন্মে। প্রতিটি চোখ থেকে একটি স্বাধীন উদ্ভিদের জন্ম হয়, যেমন– আলু।

> কাজ : আলু ও আদা থেকে কীভাবে অজাজ জনন ঘটে তা হাতেকলমে দেখাও।

(খ) রাইজোম : এরা মাটির নিচে ভূমির সমান্তরালে অবস্থান করে। কাণ্ডের মতো এদের পর্ব, পর্বসন্ধি স্পষ্ট। পর্বসন্ধিতে শল্কপত্রের কক্ষে কাক্ষিক মুকুল জন্মে। এরাও খাদ্য সঞ্চয় করে মোটা ও রসাল হয়। অনুকূল পরিবেশে এসব মুকুল বৃদ্ধি পেয়ে আলাদা আলাদা উদ্ভিদ উৎপন্ন করে, যেমন– আদা।

(গ) কন্দ (বাল্ব) : এরা অতি ক্ষুদ্র কাণ্ড। এদের কাক্ষিক ও শীর্ষ মুকুল নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয়, যেমন–পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি।

(ঘ) স্টোলন : তোমরা কচুর লতি দেখে থাকবে। এগুলো কচুর শাখা কাণ্ড। এগুলো জননের জন্যই পরিবর্তিত হয়। স্টোলনের অগ্রভাগে মুকুল উৎপন্ন হয়। এভাবে স্টোলন উদ্ভিদের জননে সাহায্য করে, যেমন– কচু, পুদিনা।

(ঙ) **অফসেট :** কচুরিপানা, টোপাপানা ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদে শাখা কাণ্ড বৃদ্ধি পেয়ে একটি নতুন উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। কিছুদিন পর মাতৃউদ্ভিদ থেকে এটি বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন উদ্ভিদে পরিণত হয়, যেমন– কচুরিপানা।

(চ) **বুলবিল :** কোনো কোনো উদ্ভিদের কাক্ষিক মুকুলের বৃদ্ধি যথাযথভাবে না হয়ে একটি পিন্ডের মতো আকার ধারণ করে। এদের বুলবিল বলে। এসব বুলবিল কিছুদিন পর গাছ থেকে খসে মাটিতে পড়ে এবং নতুন গাছের জন্ম দেয়, যেমন– চুপড়ি আলু।

৪. **পাতার মাধ্যমে :** কখনো কখনো পাতার কিনারায় মুকুল সৃষ্টি হয়ে নতুন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। যেমন– পাথরকুচি।

এতক্ষণ যেসব প্রক্রিয়ার কথা বলা হলো তা প্রাকৃতিকভাবেই ঘটে। অঙ্গজ জননে উৎপাদিত উদ্ভিদ মাতৃউদ্ভিদের মতো গুণসম্পন্ন হয়। এর ফলে কোনো নতুন বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটে না। উন্নত গুণসম্পন্ন অর্থকরী ফসলের ক্ষেত্রে তাই অনেক সময় কৃত্রিম অঙ্গজ জনন ঘটানো হয়।

কৃত্রিম অঙ্গজ জনন : ভালো জাতের আম, কমলা, লেবু, পেয়ারা ইত্যাদি গাছের কলম করতে তোমরা দেখেছ। কেন কলম করা হয় তা কি ভেবে দেখেছ? যেসব উদ্ভিদের বীজ থেকে উৎপাদিত উদ্ভিদের ফলন মাতৃউদ্ভিদের তুলনায় অনুন্নত ও পরিমাণে কম হয় সাধারণত সেসব উদ্ভিদে কৃত্রিম অঙ্গজ জননের মাধ্যমে মাতৃউদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা হয়। এবার এসো কৃত্রিম অঙ্গজ জনন সম্পর্কে আমরা জানি।

১. **কলম (Grafting) :** কলম করার জন্য প্রথমে একটি সুস্থ গাছের কচি ও সতেজ শাখা বা সায়ন নির্বাচন করতে হবে। উপযুক্ত স্থানে বাকল সামান্য কেটে নিতে হবে। এবার ঐ ক্ষত স্থানটি মাটি ও গোবর মিশিয়ে ভালোভাবে আবৃত করে দিতে হবে। এবার সেলোফেন টেপ অথবা পলিথিন দিয়ে ঐ স্থানটি মুড়ে দিতে হবে যাতে পানি লেগে মাটি ও গোবরের মিশ্রণ খসে না পড়ে। নিয়মিত পানি দিয়ে এ অংশটি ভিজিয়ে দিতে হবে। এভাবে কিছুদিন রেখে দিলে এ স্থানে মূল গজাবে। এর পরে মূলসহ শাখার এ অংশটি মাতৃউদ্ভিদ থেকে কেটে নিয়ে মাটিতে রোপণ করে দিলে নতুন একটি উদ্ভিদ হিসেবে বেড়ে উঠবে।

২. শাখা কলম **(Cutting) :** তোমরা লক্ষ করেছ যে গোলাপের ডাল কেটে ভেজা মাটিতে পুঁতে দিলে কিছুদিনের মধ্যেই তা থেকে নতুন কুঁড়ি উৎপন্ন হয়। এসব কুঁড়ি বড় হয়ে একটি নতুন গোলাপ গাছ উৎপন্ন করে।

কাজ : শাখা কলম বা কাটিং কীভাবে প্রস্তুত করতে হয় তা একটি গোলাপের ডাল দিয়ে প্রদর্শন করো।

পাঠ ৪ : যৌন জনন

ফুল থেকে ফল এবং ফল থেকে বীজ হয়। বীজ থেকে নতুন গাছের জন্ম হয়। এভাবে একটি সপুষ্পক উদ্ভিদ যৌন জননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে। তাই ফুল উদ্ভিদের যৌন জননের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

ফুল : তোমার বাড়ির আশেপাশে বহু ফুল ফুটে থাকে। এগুলো থেকে কয়েকটি এনে পর্যবেক্ষণ করে দেখ। তুমি কী সব কয়টি ফুলে মোট পাঁচটি অংশ যেমন- পুষ্পাক্ষ, বৃতি, দল বা পাপড়ি, পুংকেশর ও গর্ভকেশর দেখতে পেয়েছ? যদি পাঁচটি অংশ পেয়ে থাক তবে ফুলগুলো সম্পূর্ণ ফুল। আর যদি কোনো কোনোটিতে এই পাঁচটি অংশের মধ্যে একটি বা দুটি অংশ না থাকে তবে ফুলগুলো অসম্পূর্ণ ফুল। কখনো কখনো ফুলে এই পাঁচটি অংশ ছাড়াও বৃতির নিচে একটি অতিরিক্ত অংশ থাকে। একে উপবৃতি বলে। জবা ফুলে এমন উপবৃতি দেখা যায়। আবার কোনো কোনো ফুলে বৃন্ত থাকে। এগুলো সবৃন্তক ফুল এবং যে ফুলগুলোয় বৃন্ত থাকে না সেগুলো অবৃন্তক ফুল।

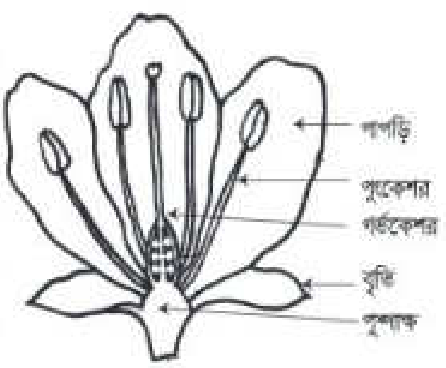

চিত্র ৪.১ : একটি আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশ

ফুলের বিভিন্ন অংশ

বৃতি : ফুলের সবচেয়ে বাইরের স্তবককে বৃতি বলে। সাধারণত এরা সবুজ রঙের হয়। বৃতি খণ্ডিত না হলে সেটি যুক্ত বৃতি, কিন্তু যখন এটি খণ্ডিত হয় তখন বিযুক্ত বৃতি বলে। এর প্রতি খণ্ডকে বৃত্যাংশ বলে।

বৃতি ফুলের অন্য অংশগুলোকে বিশেষত কুঁড়ি অবস্থায় রোদ, বৃষ্টি ও পোকা–মাকড় থেকে রক্ষা করে।

দলমণ্ডল : এটি বাইরের দিক থেকে দ্বিতীয় স্তবক। কতগুলো পাপড়ি মিলে দলমণ্ডল গঠন করে। এর প্রতিটি অংশকে পাপড়ি বা দলাংশ বলে। পাপড়িগুলো পরস্পর যুক্ত (যেমন–ধুতরা) অথবা পৃথক (যেমন–জবা) থাকতে পারে। এরা বিভিন্ন রঙের হয়।

দলমণ্ডল রঙিন হওয়ায় পোকা–মাকড় ও পশুপাখি আকর্ষণ করে এবং পরাগায়ন নিশ্চিত করে। এরা ফুলের অন্য অংশগুলোকে রোদ, বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে।

পুংস্তবক বা পুংকেশর : এটি ফুলের তৃতীয় স্তবক। এই স্তবকের প্রতিটি অংশকে পুংকেশর বলে। পুংকেশরের দণ্ডের মতো অংশকে পুংদণ্ড এবং শীর্ষের থলির মতো অংশকে পরাগধানী বলে। পরাগধানীর মধ্যে পরাগরেণু উৎপন্ন হয়। পরাগরেণু থেকে পুং জননকোষ উৎপন্ন হয়। এরা সরাসরি জনন কাজে অংশগ্রহণ করে।

স্ত্রীস্তবক বা গর্ভকেশর : এটি ফুলের চতুর্থ স্তবক। এক বা একাধিক গর্ভপত্র নিয়ে একটি স্ত্রীস্তবক গঠিত হয়। একের অধিক গর্ভপত্র সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকলে তাকে যুক্তগর্ভপত্রী, আর আলাদা থাকলে বিযুক্তগর্ভপত্রী বলে। একটি গর্ভপত্রের তিনটি অংশ, যথা– গর্ভাশয়, গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড। গর্ভাশয়ের

> **কাজ :** একটি জবা ও একটি ধুতরা ফুল সংগ্রহ করো এবং এর বিভিন্ন অংশ আলাদা করে দেখাও।

ভিতরে ডিম্বক সাজানো থাকে। ডিম্বকে স্ত্রী জননকোষ বা ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। এরা পুংস্তবকের মতো সরাসরি জনন কাজে অংশগ্রহণ করে।

বৃতি ও দলমন্ডলকে ফুলের সাহায্যকারী স্তবক এবং পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবককে অত্যাবশ্যকীয় স্তবক বলে।

থ্যালামাস ও পুষ্প পত্রাধার: এ অংশ উপরের সবগুলো স্তবককে ধারণ করে।

পুষ্পমঞ্জরি

পুষ্পমঞ্জরি তোমরা সবাই দেখেছ। কান্ডের শীর্ষমুকুল বা কাক্ষিক মুকুল থেকে উৎপন্ন একটি শাখায় ফুলগুলো বিশেষ একটি নিয়মে সাজানো থাকে। ফুলসহ এই শাখাকে পুষ্পমঞ্জরি বলে। পরাগায়নের জন্য এর গুরুত্ব খুব বেশি। এ শাখার বৃদ্ধি অসীম হলে অনিয়ত পুষ্পমঞ্জরি ও বৃদ্ধি সসীম হলে তাকে নিয়ত পুষ্পমঞ্জরি বলে।

পাঠ ৫ ও ৬ : পরাগায়ন

পরাগায়নকে পরাগসংযোগও বলা হয়। পরাগায়ন ফল ও বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়ার পূর্বশর্ত। একটি ফুলের পুংস্তবকের পরাগধানীতে তোমার আঙ্গুলের ডগা ঘষে দেখ। তোমার হাতে নিশ্চয়ই হলুদ বা কমলা রঙের গুঁড়ো লেগেছে। এই গুঁড়ো বস্তুই পরাগরেণু।

ফুলের পরাগধানী হতে পরাগরেণু একই ফুলে অথবা একই জাতের অন্য ফুলের গর্ভমুন্ডে স্থানান্তরিত হওয়াকে পরাগায়ন বলে। পরাগায়ন দু'প্রকার, যথা- স্ব-পরাগায়ন ও পর-পরাগায়ন।

স্ব-পরাগায়ন : একই ফুলে বা একই গাছের ভিন্ন দুটি ফুলের মধ্যে যখন পরাগায়ন ঘটে তখন তাকে স্ব-পরাগায়ন বলে। সরিষা, কুমড়া, ধুতুরা ইত্যাদি উদ্ভিদে স্ব-পরাগায়ন ঘটে।

পর-পরাগায়ন : একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন উদ্ভিদের ফুলের মধ্যে যখন পরাগায়ন ঘটে তখন তাকে পর-পরাগায়ন বলে। শিমুল, পেঁপে ইত্যাদি গাছের ফুলে পর-পরাগায়ন হতে দেখা যায়।

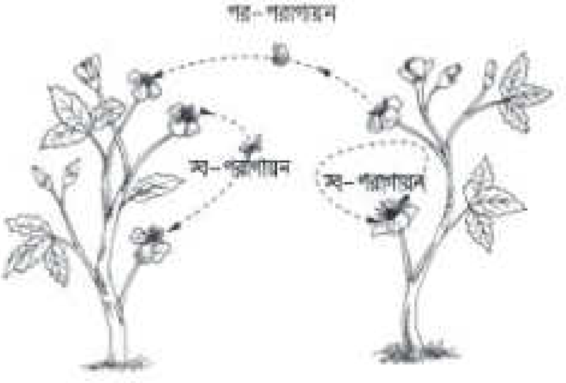

চিত্র ৪.২ : স্ব-পরাগায়ন ও পর-পরাগায়ন

পরাগায়নের মাধ্যম : পরাগরেণু স্থানান্তরের কাজটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো না কোনো মাধ্যমের দ্বারা হয়ে থাকে। যে বাহক পরাগরেণু বহন করে গর্ভমুন্ড পর্যন্ত নিয়ে যায় তাকে পরাগায়নের মাধ্যম বলে।

বায়ু, পানি, কীট-পতঙ্গ, পাখি, বাদুড়, শামুক, এমনকি মানুষ এ ধরনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে। মধু খেতে অথবা সুন্দর রঙের আকর্ষণে পতঙ্গ বা পাখি ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায়। এ সময়ে পরাগরেণু বাহকের গায়ে লেগে যায়। এই বাহকটি যখন একই প্রজাতির অন্য ফুলে গিয়ে বসে তখন পরাগরেণু ঐ ফুলের গর্ভমুন্ডে লেগে যায়। এভাবে তাদের অজান্তে পরাগায়নের কাজটি হয়ে যায়।

পরাগায়নের মাধ্যমগুলোর সাহায্য পেতে ফুলের গঠনে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। একে অভিযোজন বলা হয়। বিভিন্ন মাধ্যমের জন্য অভিযোজনগুলোও আলাদা। অভিযোজনগুলো নিম্নরূপ :

পতঙ্গপরাগী ফুলের অভিযোজন : ফুল বড়, রঙিন, মধুগ্রন্থিযুক্ত। পরাগরেণু ও গর্ভমুন্ড আঠালো এবং সুগন্ধযুক্ত, যেমন– জবা, কুমড়া, সরিষা ইত্যাদি।

বায়ুপরাগী ফুলের অভিযোজন : ফুল বর্ণ, গন্ধ ও মধুগ্রন্থিহীন। পরাগরেণু হালকা, অসংখ্য ও আকারে ক্ষুদ্র। এদের গর্ভমুন্ড আঠালো, শাখান্বিত, কখনো পালকের ন্যায়, যেমন– ধান।

পানিপরাগী ফুলের অভিযোজন : এরা আকারে ক্ষুদ্র, হালকা এবং অসংখ্য। এরা সহজেই পানিতে ভাসতে পারে। এসব ফুলে সুগন্ধ নেই। স্ত্রীফুলের বৃন্ত লম্বা কিন্তু পুং ফুলের বৃন্ত ছোট। পরিণত পুং ফুল বৃন্ত থেকে খুলে পানিতে ভাসতে থাকে, যেমন– পাতাশ্যাওলা।

প্রাণিপরাগী ফুলের অভিযোজন : এসব ফুল মোটামুটি বড় ধরনের হয়। তবে ছোট হলে ফুলগুলো পুষ্পমঞ্জরিতে সজ্জিত থাকে। এদের রং আকর্ষণীয় হয়। এসব ফুলে গন্ধ থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। যেমন– কদম, শিমুল, কচু ইত্যাদি।

পাঠ ৭ ও ৮ : নিষিক্তকরণ ও ফলের উৎপত্তি

জননকোষ (Gamete) সৃষ্টি নিষিক্তকরণের পূর্বশর্ত। একটি পুং গ্যামেট অন্য একটি স্ত্রী-গ্যামেটের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে মিলিত হওয়াকে নিষিক্তকরণ বলে।

চিত্র-৪.৩ : নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া

পরাগায়নের ফলে পরাগরেণু গর্ভমুন্ডে স্থানান্তরিত হয়। এখান থেকে নিঃসৃত রস শুষে নিয়ে এটি ফুলে উঠে এবং এর আবরণ ভেদ করে একটি নালি বেরিয়ে আসে। এটি পরাগনালি। পরাগনালি গর্ভদন্ড ভেদ করে গর্ভাশয়ে ডিম্বকের কাছে গিয়ে পৌঁছে। ইতোমধ্যে এই পরাগনালিতে দুটি পুং গ্যামেট সৃষ্টি হয়। ডিম্বকের

ভিতর পৌঁছে এ নালিকা ফেটে যায় এবং পুং গ্যামেট দুটি মুক্ত হয়। ডিম্বকের ভিতর ভ্রূণথলি থাকে। এর মধ্যে স্ত্রী গ্যামেট বা ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়। পুং গ্যামেটের একটি এই স্ত্রী গ্যামেটের সঙ্গে মিলিত হয়। এভাবে নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া শেষ হয়। অন্য পুং গ্যামেটটি গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয় এবং সস্য উৎপন্ন করে।

ফলের উৎপত্তি : আমরা ফল বলতে সাধারণত আম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, আঙুর, আপেল, পেয়ারা, সফেদা ইত্যাদি সুমিষ্ট ফলগুলোকে বুঝি। এগুলো পেকে গেলে রান্না ছাড়াই খাওয়া যায়। লাউ, কুমড়া, ঝিঙা, পটল ইত্যাদি সবজি হিসেবে খাওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলো সবই ফল। নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া শেষ হলেই ফল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া গর্ভাশয়ে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে তার কারণে ধীরে ধীরে গর্ভাশয়টি ফলে পরিণত হয়। এর ডিম্বকগুলো বীজে রূপান্তরিত হয়। নিষিক্তকরণের পর গর্ভাশয় এককভাবে অথবা ফুলের অন্যান্য অংশসহ পরিপুষ্ট হয়ে যে অঙ্গ গঠন করে তাকে ফল বলে।

শুধু গর্ভাশয় ফলে পরিণত হলে তাকে প্রকৃত ফল বলে, যেমন– আম, কাঁঠাল। গর্ভাশয় ছাড়া ফুলের অন্যান্য অংশ পুষ্ট হয়ে যখন ফলে পরিণত হয় তখন তাকে অপ্রকৃত ফল বলে, যেমন–আপেল, চালতা ইত্যাদি। প্রকৃত ও অপ্রকৃত ফলকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন– সরল ফল, গুচ্ছফল ও যৌগিক ফল।

১) **সরল ফল :** ফুলের একটি মাত্র গর্ভাশয় থেকে যে ফলের উৎপত্তি তাকে সরল ফল বলে, যেমন– আম। এরা রসাল বা শুষ্ক হতে পারে। সরল ফল দুই প্রকার।

   রসাল ফল : যে ফলের ফলত্বক পুরু এবং রসাল তাকে রসাল ফল বলে। এ ধরনের ফল পাকলে ফলত্বক ফেটে যায় না। যেমন– আম, জাম, কলা ইত্যাদি।

   নীরস ফল : যে ফলের ফলত্বক পাতলা এবং পরিপক্ব হলে ত্বক শুকিয়ে ফেটে যায় তাকে নীরস ফল বলে। যেমন–শিম, ঢেঁড়স, সরিষা ইত্যাদি।

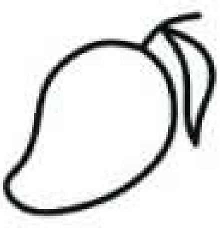

চিত্র ৪.৪ : সরল ফল

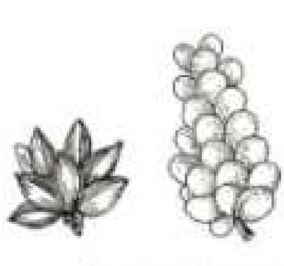

চিত্র ৪.৫ : গুচ্ছ ফল

চিত্র ৪.৬ : যৌগিক ফল

২) **গুচ্ছ ফল :** একটি ফুলে যখন অনেকগুলো গর্ভাশয় থাকে এবং প্রতিটি গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়ে একটি বোঁটার উপর গুচ্ছাকারে থাকে তখন তাকে গুচ্ছ ফল বলে, যেমন– চম্পা, নয়নতারা, আকন্দ, আতা, শরীফা ইত্যাদি।

৩) **যৌগিক ফল :** একটি মঞ্জরির সম্পূর্ণ অংশ যখন একটি ফলে পরিণত হয় তখন তাকে যৌগিক ফল বলে, যেমন– আনারস, কাঁঠাল।

কাজ : কয়েকটি ফল সংগ্রহ করো এবং এগুলো কী ধরনের ফল তা খাতায় লেখ।

পাঠ ৯ ও ১০ : বীজের গঠন ও অঙ্কুরোদগম

বীজের গঠন : একটি বাটির মধ্যে একটি ফিল্টার পেপার রেখে পানি দিয়ে ভিজিয়ে তার উপর ৮/১০টি ভেজা ছোলার বীজ ৩/৪ দিন ঢেকে রেখে দিলে এগুলো থেকে অঙ্কুর বের হবে। বীজের সুঁচালো অংশের কাছে একটি ছিদ্র আছে, একে মাইক্রোপাইল বা ডিম্বকরন্ধ্র বলে। এর ভিতর দিয়ে ভ্রূণমূল বাইরে বেরিয়ে আসে। অঙ্কুর বের হওয়া বীজটিকে দুই আঙ্গুল দিয়ে সামান্য চাপ দিয়ে ছোলা বীজের আবরণটি সরিয়ে ফেললে হলুদ রঙের একটি অংশ বের হবে, এটিকে আরও একটু চাপ দিলে পুরু বীজপত্র দুটি দুই দিকে খুলে যাবে। এ দুটো যেখানে লেগে আছে সেখানে সাদা রঙের একটি লম্বাটে অঙ্গ দেখা যাবে। এর নিচের দিকের অংশকে ভ্রূণমূল এবং উপরের অংশকে ভ্রূণকাণ্ড বলে।

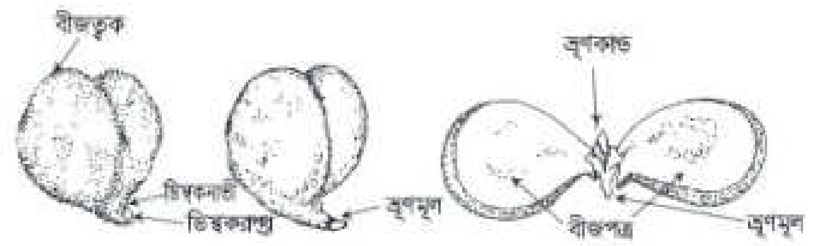

চিত্র ৪.৭ : একটি ছোলা বীজের বিভিন্ন অংশ

ভ্রূণকাণ্ডের নিচের অংশকে বীজপত্রাধিকাণ্ড (এপিকোটাইল) ও ভ্রূণমূলের উপরের অংশকে বীজপত্রাবকাণ্ড (হাইপোকোটাইল) বলে। ভ্রূণমূল, ভ্রূণকাণ্ড ও বীজপত্রকে একত্রে ভ্রূণ এবং বাইরের আবরণটিকে বীজত্বক বলে। বীজত্বক দু'স্তরবিশিষ্ট। বাইরের অংশকে টেস্টা এবং ভিতরের অংশকে টেগমেন বলে।

কাজ : পরীক্ষার মাধ্যমে একটি মটর বীজের বিভিন্ন অংশ প্রদর্শন করো।

অঙ্কুরোদগম : বীজ থেকে শিশু উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে অঙ্কুরোদগম বলে। যথাযথভাবে অঙ্কুরোদগম হওয়ার জন্য পানি, তাপ ও অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। যখন ভ্রূণকাণ্ড মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসে কিন্তু বীজপত্রটি মাটির ভিতরে থেকে যায়, তখন তাকে মৃৎগত অঙ্কুরোদগম বলে। যেমন- ছোলা, ধান ইত্যাদি। কখনো বীজপত্রসহ ভ্রূণমুকুল মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসে তখন তাকে মৃৎভেদী অঙ্কুরোদগম বলে। কুমড়া, রেড়ী, তেঁতুল ইত্যাদি বীজে মৃৎভেদী অঙ্কুরোদগম দেখা যায়।

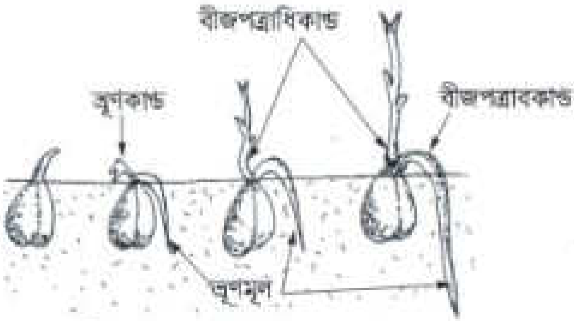

চিত্র ৪.৮ : মৃদগত অঙ্কুরোদগম

চিত্র ৪.৯ : মৃদভেদী অঙ্কুরোদগম

ছোলা বীজের অঙ্কুরোদগম : এক্ষেত্রে মৃদগত অঙ্কুরোদগম হয়। এ প্রকার অঙ্কুরোদগমে বীজপত্র দু'টি মাটির নিচে রেখে ভ্রূণকান্ড উপরে উঠে আসে। বীজ পত্রাধিকান্ডের অতিরিক্ত বৃদ্ধি এর কারণ। ছোলাবীজ একটি অসস্যল দ্বিবীজপত্রী বীজ। মাটিতে ছোলা বীজ বুনে পরিমিত পানি, তাপ ও বায়ুর ব্যবস্থা করলে দুই তিন দিনের মধ্যে বীজ হতে অঙ্কুর বের হবে এবং মাটির উপরে উঠে আসবে। পানি পেয়ে বীজটি প্রথমে ফুলে উঠে এবং ডিম্বকরন্ধ্রের ভিতর দিয়ে ভ্রূণমূল বেরিয়ে আসে। এটি ধীরে ধীরে প্রধান মূলে পরিণত হয়। দ্বিতীয় ধাপে ভ্রূণকান্ড মাটির উপরে উঠে আসে। এক্ষেত্রে বীজপত্র দুটি মাটির নিচে থেকে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণ তার খাদ্য বীজপত্র থেকে পেয়ে থাকে।

নতুন শব্দ: অযৌন ও যৌন প্রজনন বা জনন, পরাগরেণু, টিউবার, রাইজোম, কন্দ, বুলবিল, গ্যামেট, বীজপত্রাধিকান্ড, বীজপত্রাবকান্ড, টেগমেন ,টেস্টা

এ অধ্যায় শেষে যা শিখলাম–

– প্রজনন প্রধানত দুই ধরনের, যথা– অযৌন ও যৌন।

– ফুল উন্নত উদ্ভিদের জনন অঙ্গ।

– একটি আদর্শ ফুলের পাঁচটি অংশ।

– ফল প্রধানত তিন ধরনের সরল, গুচ্ছ ও যৌগিক।

– অংকুরোদগম দুই ধরনের, যথা– মৃদগত ও মৃদভেদী।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ **করো**

১. প্রজনন প্রধানত দুই রকম, ———— ও ————।

২. যখন একটি মাত্র গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয় তখন তাকে ———— ফল বলে।

৩. যে ফুলে ———— টি অংশ থাকে তাকে সম্পূর্ণ ফুল বলে।

৪. পরাগায়ন দু'ধরনের ———— ও ————।

৫. একটি সম্পূর্ণ পুষ্পমঞ্জরি ফলে পরিণত হলে তাকে ———— ফল বলে।

৬. ডিম্বক পরিণত ফলের ———— পরিণত হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অযৌন প্রজনন উদ্ভিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

২. আম গাছের কলম কেন করা হয় ?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি গুচ্ছ ফল?

ক. আম			খ. শরীফা
গ. কাঁঠাল			ঘ. আনারস

২. পতঙ্গপরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক. বর্ণহীন			খ. গন্ধহীন
গ. খুব হালকা হয়		ঘ. রঙিন ও মধুগ্রন্থিযুক্ত হয়

নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

৩. চিত্রের কোন অংশটি পরাগরেণু ধারণ করে?

ক. m			খ. o
গ. n			ঘ. p

৪. চিত্রের P অংশটি–

i. ফলে পরিণত হয়

ii. বীজে পরিণত হয়

iii. বংশবিস্তারে সাহায্য করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

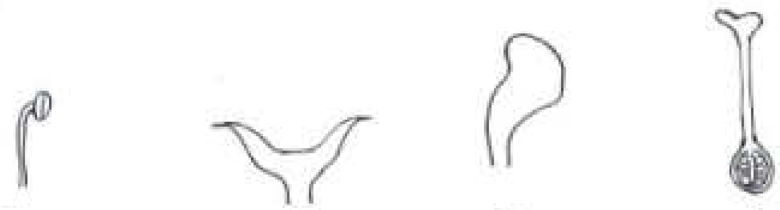

ক. প্রজনন কাকে বলে?

খ. পরাগায়ন বলতে কী বোঝায়?

গ. M, N, O, P অংশের সমন্বয়ে গঠিত উদ্ভিদ অঙ্গটির লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো।

ঘ. M, O, P এর মধ্যে কোন দুটি অংশ উদ্ভিদের বংশবিস্তারে অধিক গুরুত্বপূর্ণ? যুক্তিসহ তুলে ধরো।

২.

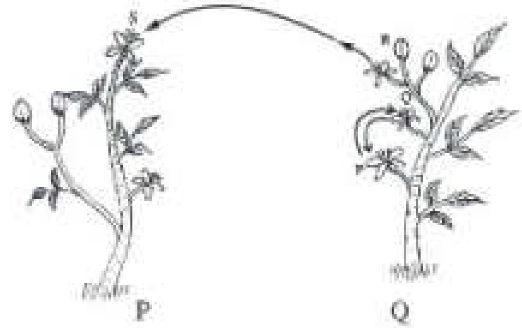

ক. অযৌন প্রজনন কাকে বলে?

খ. অঙ্কুরোদগম বলতে কী বোঝায়?

গ. P ও Q ফুলের মধ্যে পরাগায়ন ব্যাখ্যা করো।

ঘ. চিত্রে কোন পরাগায়নটি নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে? তুলনামূলক বিশ্লেষনের মাধ্যমে মতামত দাও।

নিজে করো

১. লাউ, কুমড়া, ধুতুরা, বেগুন, কলকে ফুল, জবা ও শিমের ফুল সংগ্রহ করো এবং দেখ কোন কোন ফুলে পাঁচটি অংশ রয়েছে।

২. একটি তেঁতুল বীজ নিয়ে অঙ্কুরোদগমের পরীক্ষা করো এবং পরিবর্তনগুলো লিখে রাখ।

পঞ্চম অধ্যায়

সমন্বয় ও নিঃসরণ

জীবে সমন্বয় একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাণীর মতো উদ্ভিদের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন হয়। জীবের মধ্যে বৃদ্ধি, প্রজনন, বংশবিস্তার, অনুভূতিগ্রহণ ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উদ্ভিদের এ কাজগুলো করার জন্য হরমোনের গুরুত্ব অপরিসীম। এক্ষেত্রে প্রাণীর মতো উদ্ভিদের আলাদা কোনো তন্ত্র থাকে না। নিম্নশ্রেণি ব্যতীত উচ্চশ্রেণির প্রাণীর দেহে বিভিন্ন জৈবিক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট তন্ত্র থাকে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সংযোগ সাধন এবং এদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে স্নায়ুতন্ত্র।

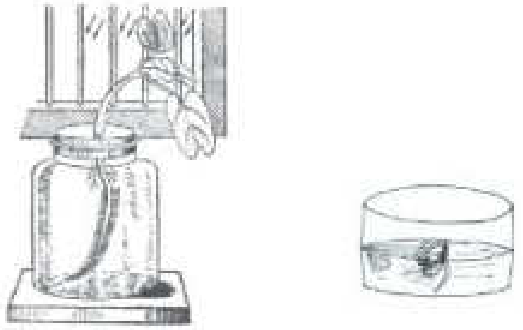

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- উদ্ভিদ ও মানুষের ক্ষেত্রে সমন্বয় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রবাহ চিত্রের সাহায্যে স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উদ্ভিদের উদ্দীপনামূলক ক্রিয়া উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মানুষের উদ্দীপনামূলক ক্রিয়া উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্জ্য নিঃসরণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১–৩ : উদ্ভিদে সমন্বয়

প্রতিটি উদ্ভিদকোষে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম একটি নিয়ম শৃঙ্খলার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এ কারণে সমন্বয় উদ্ভিদের একটি অপরিহার্য কার্যক্রম। এ সমন্বয় না থাকলে উদ্ভিদের জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। উদ্ভিদের জীবন চক্রের পর্যায়গুলো যেমন– অঙ্কুরোদগম, পুষ্পায়ন, ফল সৃষ্টি, বার্ধক্য প্রাপ্তি, সুপ্তাবস্থা ইত্যাদি একটি সুশৃঙ্খল নিয়ম মেনে চলে। এ কাজে আবহাওয়া ও জলবায়ুজনিত প্রভাবকগুলোর গুরুত্বও লক্ষ করার মতো। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও চলনসহ বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিশেষ নিয়ম মেনেই সম্পন্ন হয়। একটি কাজ অন্য কাজকে বাধা প্রদান করে না। বিভিন্ন কাজের সমন্বয়সাধন কীভাবে হয় তা জানতে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করতে থাকেন এবং মত প্রকাশ করেন যে, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশ, বিভিন্ন অঙ্গ সৃষ্টি ইত্যাদি উদ্ভিদ দেহে উৎপাদিত বিশেষ কোনো জৈব রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে হয়ে থাকে। উদ্ভিদের সকল কাজ নিয়ন্ত্রণকারী এই জৈব রাসায়নিক পদার্থটিকে ফাইটোহরমোন বা বৃদ্ধিকারক বস্তু

হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ফাইটোহরমোন কোষে উৎপন্ন হয় এবং উৎপত্তিস্থল থেকে বাহিত হয়ে দূরবর্তী কোষের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্ভিদে যেসব হরমোন পাওয়া যায় তার মধ্যে অক্সিন, জিব্বেরেলিন ও সাইটোকাইনিন বৃদ্ধি সহায়ক এবং অ্যাবসাইসিক এসিড ও ইথিলিন বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। পাতায় ফ্লোরিজেন নামক হরমোন উৎপন্ন হয় এবং তা পত্রমূলে স্থানান্তরিত হয়ে পত্র মুকুলকে পুষ্পমুকুলে পরিণত করে। তাই দেখা যায় ফ্লোরিজেন উদ্ভিদে ফুল উৎপন্ন করে।

অক্সিন : চার্লস ডারউইন এ হরমোন প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি উদ্ভিদের ভ্রূণমুকুলাবরণীর উপর আলোর প্রভাব লক্ষ করেন। যখন আলো তীর্যকভাবে একদিকে লাগে তখন ভ্রূণমুকুলাবরণী আলোর উৎসের দিকে বাঁকা হয়ে বৃদ্ধি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে ভ্রূণমুকুলাবরণীর অগ্রভাগে অবস্থিত রাসায়নিক পদার্থটি ছিল বৃদ্ধি সহায়ক হরমোন অক্সিন। অক্সিন প্রয়োগে শাখা কলমে মূল গজায়, ফলের অকালে ঝরেপড়া রোধ হয়।

জিব্বেরেলিন : চারাগাছ, বীজপত্র ও পত্রের বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে এদের দেখা যায়। এর প্রভাবে উদ্ভিদের পর্বমধ্যগুলো দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়। এ জন্য খাটো উদ্ভিদে এ হরমোন প্রয়োগ করলে উদ্ভিদটি অন্যান্য সাধারণ উদ্ভিদ থেকেও অধিক লম্বা হয়। বীজের সুপ্তাবস্থা কাটাতে এর কার্যকারিতা রয়েছে।

ইথিলিন : এ হরমোনটি একটি গ্যাসীয় পদার্থ। এটি ফল পাকাতে সাহায্য করে। এ হরমোন ফল, ফুল, বীজ, পাতা ও মূলেও দেখা যায়। ইথিলিন বীজ এবং মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গ করে, চারা গাছের কাণ্ডের বৃদ্ধি ঘটিয়ে চারা গাছকে লম্বা হতে সাহায্য করে, ফুল এবং ফল সৃষ্টির সূচনা করে। ইথিলিন পাতা, ফুল এবং ফলের ঝরে পড়া ত্বরান্বিত করে।

চলন : উদ্ভিদও অন্যান্য জীবের মতো অনুভূতি ক্ষমতাসম্পন্ন। এজন্য অভ্যন্তরীণ বা বহিঃউদ্দীপক উদ্ভিদদেহে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, তার ফলে উদ্ভিদে চলন ও বৃদ্ধি সংঘটিত হয়। এসব চলনকে ট্রপিক চলন বলা হয়।

আলোর প্রতি উদ্ভিদের সাড়া দেওয়ার পরীক্ষণ

উপকরণ : একটি স্বচ্ছ কাচের বড় মুখযুক্ত বোতল, পুষ্টি দ্রবণ, ছিদ্রযুক্ত কর্ক, একটি সবল উদ্ভিদের চারা

চিত্র ৫.১ : উদ্ভিদের আলোকমুখিতার পরীক্ষণ

কার্যপ্রণালি : একটি বোতলে পুষ্টি দ্রবণ নিয়ে ছিদ্রযুক্ত ছিপিটি লাগিয়ে ছিপির ছিদ্রপথে চারাগাছটি এমনভাবে ঢুকিয়ে দিতে হবে যাতে মূলগুলো পুষ্টি দ্রবণে ডুবে থাকে। এবার গাছসহ বোতলটি জানালার কাছে আলোকিত স্থানে রেখে দেই।

পর্যবেক্ষণ : ৪/৫ দিন পর দেখা যাবে যে উদ্ভিদটির কাণ্ডের অংশ জানালার বাইরের দিকে বেঁকে গেছে। মূলগুলো আলোক উৎসের বিপরীত দিকে বেঁকে রয়েছে।

সিদ্ধান্ত : এ পরীক্ষণে প্রমাণিত হয় যে কাণ্ডে আলোকমুখী ও মূলে আলোকবিমুখী বৃদ্ধি ও চলন ঘটে।

> কাজ : শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে অভিকর্ষ উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে তা একটি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাও।

হরমোনের ব্যবহার : অক্সিন ও অন্যান্য কৃত্রিম হরমোন শাখাকলমের মূল উৎপাদনে সাহায্য করে। ইন্ডোল অ্যাসেটিক এসিড (এক ধরনের অক্সিন) ক্ষতস্থান পূরণে সাহায্য করে। অক্সিন প্রয়োগে ফলের মোচন বিলম্বিত হয়। বিভিন্ন উদ্দীপক যেমন- আলো, পানি, অভিকর্ষ ইত্যাদি উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে।

পাঠ ৪ ও ৫ : স্নায়ু তন্ত্র

তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে শ্রেণিবিন্যাস থেকে এককোষী ও বহুকোষী জীবের বৈশিষ্ট্য জেনেছ। বহুকোষী জীবের দেহে টিস্যু, অঙ্গ ও তন্ত্র ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন গঠন পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে অগণিত কোষের বিচিত্র কর্মকাণ্ড। এই কর্মকাণ্ডের সাথে যোগসূত্র রচনা করা এবং পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য জীবদেহে দ্রুত যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। যেমন- কারো দুঃখে তোমার কান্না পায়, কারো খুশিতে তুমি খুশি হও, পরীক্ষায় ভালো ফল করলে তোমার আনন্দ হয়। এই কাজগুলো ঘটে বিভিন্ন উদ্দীপকের কার্যকারিতার ফলে। দেহের বিভিন্ন অংশের উদ্দীপনা বহন করা, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজের সমন্বয় সাধন করা ও পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রাখা স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কাজ। প্রাণিদেহের যে তন্ত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সংযোগ রক্ষা করে, বিভিন্ন জৈবিক কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করে এবং উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করার মাধ্যমে পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে, তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে। স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান অংশ হলো মস্তিষ্ক। উন্নত মস্তিষ্কের কারণে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে পরিগণিত হয়। মস্তিষ্ক অসংখ্য বিশেষ কোষ দ্বারা গঠিত। এরা নিউরন বা স্নায়ুকোষ নামে পরিচিত।

স্নায়ুকোষ বা নিউরন

স্নায়ুতন্ত্রের গাঠনিক ও কার্যকরী এককে স্নায়ুকোষ বা নিউরন বলে। নিউরন মানবদেহের দীর্ঘতম কোষ। নিউরন দুইটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। যথা- ১. কোষদেহ এবং ২. প্রলম্বিত অংশ।

১. কোষদেহ : কোষদেহ নিউরনের প্রধান অংশ। কোষদেহ বিভিন্ন আকৃতির হয় যেমন- গোলাকার, ডিম্বাকার বা নক্ষত্রাকার। কোষদেহ কোষ আবরণী, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস দ্বারা গঠিত। এই কোষে সেন্ট্রিওল থাকে না। তাই এরা অন্যান্য কোষের মতো বিভাজিত হয় না।

২. প্রলম্বিত অংশ : কোষদেহ থেকে উৎপন্ন শাখা-প্রশাখাকে প্রলম্বিত অংশ বলে। প্রলম্বিত অংশ দুই প্রকার। যথা- ক) অ্যাক্সন এবং খ) ডেনড্রন।

ক) অ্যাক্সন : কোষদেহ থেকে উৎপন্ন লম্বা সুতার মতো অংশকে অ্যাক্সন বলে। অ্যাক্সনের যে প্রান্তে কোষদেহ থাকে তার বিপরীত প্রান্ত থেকে শাখা বের হয়। সাধারণত একটি নিউরনে একটি মাত্র অ্যাক্সন থাকে।

চিত্র ৫.২ : নিউরন

খ) ডেনড্রন : কোষদেহের চারদিক থেকে উৎপন্ন শাখাগুলোকে ডেনড্রন বলে। এগুলো বেশি লম্বা হয় না। ডেনড্রন থেকে সৃষ্ট শাখাগুলোকে ডেনড্রাইট বলে। এদের দ্বারা স্নায়ুতাড়না নিউরনের দেহের দিকে

পরিবাহিত হয়। একটি স্নায়ুকোষের অ্যাক্সন অন্য একটি স্নায়ুকোষের ডেনড্রাইটের সাথে মিলিত হওয়ার স্থানকে সিন্যাপস বলে। সিন্যাপসের মাধ্যমেই স্নায়ুতাড়না এক স্নায়ুকোষ থেকে অন্য স্নায়ুকোষে পরিবাহিত হয়। উদ্দীপনা বহন করা, প্রাণিদেহের ভিতরের ও বাইরের পরিবেশের সাথে সংযোগ রক্ষা করা, প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করা, মস্তিষ্কে স্মৃতিধারণ করা, চিন্তা করা ও বিভিন্ন কাজের নির্দেশ দেওয়া ও পরিচালনা করা নিউরনের কাজ। নিউরনের উদ্দীপনা বহন প্রক্রিয়া নিচের চিত্রে দেখানো হলো।

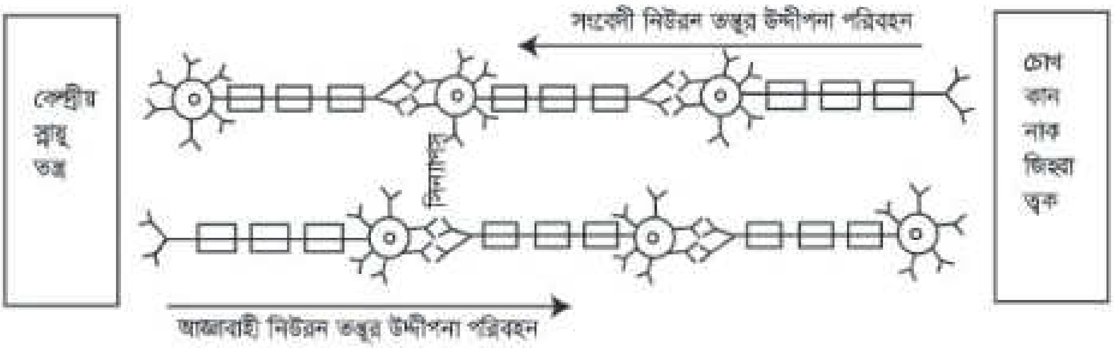

চিত্র ৫.৩ : স্নায়ুতন্ত্রের উদ্দীপনা বহনের প্রবাহ চিত্র

স্নায়ুতন্ত্রকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– ১. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ২. প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র ৩. স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র।

পাঠ ৬ ও ৭ : মস্তিষ্ক

১. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অংশ হলো মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জু।

মস্তিষ্ক হলো সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রের চালক। মানুষের মস্তিষ্ক করোটির মধ্যে সুরক্ষিত। মস্তিষ্ক মেনিনজেস নামক পর্দা দ্বারা আবৃত। মানুষের মস্তিষ্কের প্রধান অংশ তিনটি। যথা– (ক) গুরুমস্তিষ্ক (খ) মধ্যমস্তিষ্ক (গ) পশ্চাৎ বা লঘুমস্তিষ্ক।

(ক) অগ্র বা গুরুমস্তিষ্ক : মস্তিষ্কের প্রধান অংশ হলো গুরুমস্তিষ্ক বা সেরিব্রাম। এটা ডান ও বাম খণ্ডে বিভক্ত। এদের ডান ও বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার বলে। মানব মস্তিষ্কে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার অধিকতর উন্নত ও সুগঠিত। এই দুইখণ্ড ঘনিষ্ঠভাবে স্নায়ুতন্তু দ্বারা সংযুক্ত। এর উপরিভাগ ঢেউ তোলা ও ধূসর বর্ণের। দেখতে ধূসর বর্ণের হওয়ায় একে ধূসর পদার্থ বা গ্রে ম্যাটার বলে। গুরুমস্তিষ্কের অন্তঃস্তরে কেবলমাত্র স্নায়ুতন্তু থাকে। স্নায়ুতন্তুর রং সাদা। তাই মস্তিষ্কের ভিতরের স্তরের নাম শ্বেত পদার্থ বা হোয়াইট ম্যাটার। শ্বেত পদার্থের ভিতর দিয়ে স্নায়ুতন্তু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। ধূসর পদার্থের কয়েকটি স্তরে বিশেষ আকারের স্নায়ুকোষ দেখা যায়। এই স্নায়ুকোষগুলো গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে গুচ্ছ বেঁধে স্নায়ুকেন্দ্র সৃষ্টি করে। এগুলো বিশেষ বিশেষ কর্মকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, চিন্তা– চেতনা, স্মৃতি, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও পেশি চালনার ক্রিয়াকেন্দ্র গুরুমস্তিষ্কে অবস্থিত।

সেরিব্রামের নিচের অংশ হলো– থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস। এগুলো ধূসর পদার্থের পুঞ্জ। ক্রোধ, লজ্জা, গরম, শীত, নিদ্রা, তাপ সংরক্ষণ ও চলন এই অংশের কাজ।

(খ) মধ্যমস্তিষ্ক : গুরুমস্তিষ্ক ও পনস–এর মাঝখানে মধ্যমস্তিষ্ক অবস্থিত। মধ্যমস্তিষ্ক দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তির সাথেও সম্পর্কযুক্ত।

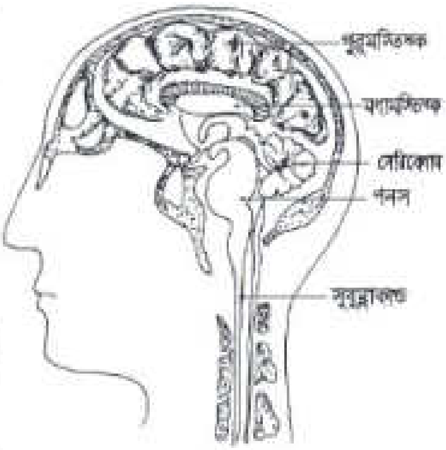

চিত্র ৫.৪ : মস্তিষ্কের গঠন

(গ) পশ্চাৎ বা লঘুমস্তিষ্ক : লঘুমস্তিষ্ক গুরুমস্তিষ্কের নিচে ও পশ্চাতে অবস্থিত। এটা গুরুমস্তিষ্কের চেয়ে আকারে ছোট। দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা পশ্চাৎ বা লঘুমস্তিষ্কের প্রধান কাজ। এছাড়া লঘুমস্তিষ্ক কথা বলা ও চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে। এর তিনটি অংশ–

সেরিবেলাম : পনসের বিপরীতদিকে অবস্থিত খণ্ডাংশটি হলো সেরিবেলাম। এটা অনেকটা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। সেরিবেলাম ডান ও বাম দু'অংশে বিভক্ত।

পনস : পনস লঘুমস্তিষ্কের সামনে ও নিচে অবস্থিত। একে মস্তিষ্কের যোজক বলা হয়। এটা গুরুমস্তিষ্ক, লঘুমস্তিষ্ক ও মধ্যমস্তিষ্ককে সুষুম্নাশীর্ষকের সাথে সংযোজিত করে।

মেডুলা বা সুষুম্নাশীর্ষক : এটা মস্তিষ্কের নিচের অংশ। সুষুম্নাশীর্ষক পনসের নিম্নভাগ থেকে মেরুরজ্জুর উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ এটা মস্তিষ্ককে মেরুরজ্জুর সাথে সংযোজিত করে। এ জন্য সুষুম্নাশীর্ষকে মস্তিষ্কের বোঁটা বলা হয়। মস্তিষ্কের এ অংশ হৃৎস্পন্দন, খাদ্যগ্রহণ ও শ্বসন ইত্যাদি কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

কাজ : চার্ট দেখে মস্তিষ্কের চিত্র আঁক। এর কোন অংশ কী কাজ করে তা চিত্রের চিহ্নিত অংশের পাশে লেখ।

পাঠ ৮–১০ : মেরুরজ্জু

মেরুদণ্ডের মধ্যে মেরুরজ্জু সংরক্ষিত থাকে। মেরুরজ্জুর ধূসর পদার্থ থাকে ভিতরে এবং শ্বেত পদার্থ থাকে বাইরে অর্থাৎ মস্তিষ্কের উল্টা। মেরুরজ্জুর শ্বেত পদার্থের ভিতর দিয়ে আজ্ঞাবাহী এবং অনুভূতিবাহী স্নায়ুতন্তু যাতায়াত করে।

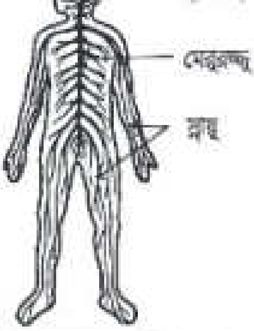

চিত্র ৫.৫ : মানবদেহের স্নায়ুতন্ত্র

প্রতিবর্ত চক্র

তোমার হাতে মশা বসলে তুমি কী করবে? অবশ্যই মশাটাকে মারতে চেষ্টা করবে। তোমার হাতে মশা বসেছে তুমি কীভাবে টের পেলে? তুমি মশার কামড় অনুভব করেছ, তাই তুমি এমনটি করেছ। তুমি মশার কামড় অনুভব করেছ স্নায়ুর উদ্দীপনার জন্য। স্নায়ুর ক্রিয়া যা উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়াও তাই। আয়নাতে আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আলো প্রতিফলিত হয়, প্রতিবর্ত ক্রিয়াও কতকটা তেমনি।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া ঘটে স্নায়ুর তাড়নার তাৎক্ষণিক কার্যকারিতার ফলে। স্নায়ুতাড়না কী? স্নায়ুর ভিতর দিয়ে যে সংবাদ বা অনুভূতি প্রবাহিত হয় তাকে স্নায়ু তাড়না বলে। আমরা যেমন হাতে মশা কামড় দিলে মশা তাড়িয়ে দেই অথবা পায়ে পিন ফুটলে আমরা নিমিষে তা সরিয়ে নেই। এটা কীভাবে ঘটে? হাতের উপর মশা বসলে স্নায়ুর গ্রাহক প্রান্তের উদ্দীপক হলো মশা, এর উপস্থিতি অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে কোষ প্রান্তের সাড়া জাগে। আমরা মশাটিকে তাড়িয়ে দেই অথবা মেরে ফেলি। এ সকল ক্রিয়া যেন অজ্ঞাতসারে আপনা আপনি হয়ে থাকে। এরূপ যে ক্রিয়া অনুভূতির উত্তেজনা দ্বারা উৎপন্ন হয়, মস্তিষ্ক দ্বারা চালিত হয় না তাকেই প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে। প্রতিটি প্রতিবর্ত চক্রের পাঁচটি অংশ থাকে। যথা– ১) গ্রাহক অঙ্গ ২) অনুভূতিবাহী স্নায়ু ৩) প্রতিবর্ত কেন্দ্র ৪) আজ্ঞাবাহী স্নায়ু এবং ৫) সাড়া প্রদানকারী অঙ্গ। তাৎক্ষণিক আত্মরক্ষার জন্য কোনো অঙ্গের তড়িৎক্রিয়ার নাম প্রতিবর্ত ক্রিয়া। উদাহরণ– ১) আগুনে হাত লাগা বা পিনে হাত ফোটা মাত্র টেনে নেওয়া। ২) চোখে প্রখর আলো পড়ামাত্র চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাওয়া।

চিত্র ৫.৬ : মানবদেহের প্রতিবর্ত চক্র

ব্যাখ্যা : হাতের চামড়ায় পিন ফোটামাত্র অনুভূতিবাহী স্নায়ুতন্তু পিন ফোটার যন্ত্রণা গ্রহণ করে। এই যন্ত্রণাদায়ক তাড়না অনুভূতিবাহী স্নায়ুতন্তুর মাধ্যমে মেরুরজ্জুতে পৌঁছে। ঐ একই তাড়না অনুভূতিবাহী স্নায়ুকোষ থেকে আজ্ঞাবাহী স্নায়ুতে প্রবাহিত হয়। স্নায়ুতাড়না আজ্ঞাবাহী কোষে পৌঁছামাত্র পেশিতে প্রেরণ করে। ফলে পেশি সংকুচিত হয় এবং যন্ত্রণার উৎস থেকে হাত সরিয়ে নেয়।

এখানে অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়াকে সহজ করে বর্ণনা করা হলো। আসলে পিন ফুটানোর সঙ্গে সঙ্গে বেশকিছু অনুভূতিবাহী স্নায়ু উদ্দীপনা গ্রহণ করে। এ উদ্দীপনা অনেকগুলো পরস্পর সংযুক্ত স্নায়ুকোষের মাধ্যমে অনেকগুলো আজ্ঞাবাহী কোষে প্রবাহিত হয়। এসব আজ্ঞাবাহী স্নায়ু পেশিতে উদ্দীপনা বহন করে হাত সরিয়ে আনে। অনুভূতি মস্তিষ্কেও পৌঁছায়। ফলে কী ঘটছে শরীর তা জানতে পারে।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া একটি সমন্বিত কার্যক্রম। প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় যে পাঁচটি অংশ কাজ করে, তাদের যেকোনো একটির অভাবে কাজটি সঠিকভাবে হতে পারে না।

কাজ : তোমার হাতে পিন ফুটলে অথবা হারিকেনের গরম চিমনির উপর তোমার হাত পড়লে তুমি কী করবে? কেন করবে? কীভাবে করবে? তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।

পাঠ ১১ ও ১২ : রেচনতন্ত্র

আমরা নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ি। অতি গরমে আমাদের গা ঘামে। এগুলো রেচন পদার্থ। অর্থাৎ রেচন পদার্থ হলো সেইসব পদার্থ যেগুলো দেহের জন্য ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয়। রেচন বলতে দেহের বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে বোঝায়। বিপাকের ফলে পানি, কার্বন ডাইঅক্সাইড, ইউরিয়া প্রভৃতি দূষিত পদার্থ দেহে প্রস্তুত হয়। এগুলো নিয়মিত ত্যাগ না করলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। এইসব দূষিত পদার্থ দেহের মধ্যে জমে বিষক্রিয়া দেখা দেয় এবং এর ফলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। এ সকল বর্জ্য পদার্থ প্রধানত নিঃশ্বাস বায়ু, ঘাম এবং মূত্রের সাথে দেহের বাইরে চলে যায়। ফুসফুস, চর্ম ও বৃক্ক এই তিনটি রেচন অঙ্গ। কার্বন ডাইঅক্সাইড ফুসফুসের মাধ্যমে এবং লবণ জাতীয় ক্ষতিকর পদার্থ চর্মের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। বৃক্কের মাধ্যমে দেহের নাইট্রোজেনযুক্ত তরল, দূষিত পদার্থ পরিত্যক্ত হয়। মূত্রের মাধ্যমেই দেহের শতকরা আশি ভাগ নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ পরিত্যক্ত হয়। তাই বৃক্কই প্রধানত রেচন অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। যে তন্ত্র রেচন কার্যে সাহায্য করে তাকে রেচনতন্ত্র বলে।

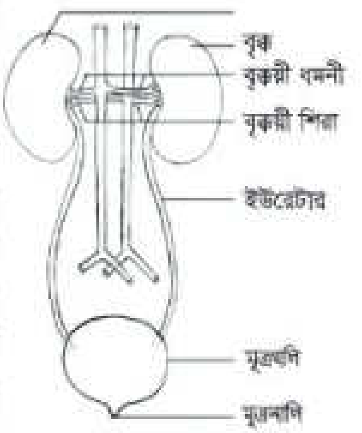

চিত্র ৫.৭ : রেচনতন্ত্র

কাজ : নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ: টেস্টটিউব, কাচ বা প্লাস্টিকের নল, চুনের পানি

পদ্ধতি : একটি টেস্টটিউবের ভিতর কিছুটা স্বচ্ছ চুনের পানি নাও। এবার টেস্টটিউবটির মধ্যে কাচ বা প্লাস্টিকের নল প্রবেশ করাও এবং নলটিতে ফুঁ দাও। কী হয় লক্ষ করো। কিছুক্ষণ ফুঁ দেওয়ার পর দেখবে চুনের পানি ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। কেন এমন হলো?

আমরা জানি, কার্বন ডাইঅক্সাইড চুনের পানিকে ঘোলা করে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের নিঃশ্বাসের বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে।

অল্প পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড দেহের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয়। কিন্তু বেশি পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বিষাক্ত এবং দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। শ্বসন ক্রিয়ার সময় আমাদের দেহকোষ বর্জ্য হিসেবে এই গ্যাস তৈরি করে। কোষ থেকে রক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড বহন করে ফুসফুসে নিয়ে যায়। নিঃশ্বাসের বায়ুতে শতকরা ৪ ভাগ কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে। নিঃশ্বাসের বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে জলীয় বাষ্প থাকে।

কাজ : নিঃশ্বাস বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : এক খণ্ড কাচ বা আয়না

পদ্ধতি : শীতের সকালে একখণ্ড কাচ বা আয়নার উপর মুখ দিয়ে (নাক দিয়ে নয়) নিঃশ্বাস ছাড়। কাচের উপর কী দেখতে পাচ্ছ? নিঃশ্বাসের বায়ুর সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয়বাষ্প বের হয়। জলীয়বাষ্প ঠান্ডা কাচে জলীয় কণার সৃষ্টি করে ফলে আয়না বা কাচখণ্ডটিকে ঘোলাটে ও কিছুটা অস্বচ্ছ দেখায়। কিছুক্ষণ পর আয়না থেকে জলীয় কণা উবে যায়। আয়নাটি আবার স্বচ্ছ দেখায়।

এ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিঃশ্বাস বায়ুতে জলীয়বাষ্প থাকে।

ঘর্ম বা ঘাম

মানবদেহের বহিরাবরণ চর্ম বা ত্বক। ত্বকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। এগুলো হলো লোমকূপ। এই সকল লোমকূপ দিয়ে ঘাম বের হয়। এই ঘামে সাধারণত পানির সাথে লবণ, সামান্য কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অন্যান্য ক্ষতিকর বা অপ্রয়োজনীয় পদার্থ থাকে।

মূত্র

বৃক্ককে মূত্র তৈরির কারখানা হিসেবে অভিহিত করা হয়। দেহের পেছনের দিকে মেরুদণ্ডের দুই পাশে দুইটি বৃক্ক থাকে। বৃক্ক ছাঁকনির মতো কাজ করে। যকৃৎ আমাদের দেহের অতিরিক্ত অ্যামাইনো এসিডকে ভেঙে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ তৈরি করে। এগুলো দেহের জন্য ক্ষতিকর। বৃক্ক রক্ত থেকে ক্ষতিকর পদার্থ ছেঁকে নেয়। এই ক্ষতিকর পদার্থসমূহ পানির সাথে মিশে হালকা হলুদ বর্ণের মূত্র তৈরি করে এবং ইউরেটারের মাধ্যমে মূত্র থলিতে জমা হয়। নির্দিষ্ট সময় পর মূত্রের বেগ অনুভূত হয়। মলদ্বারের মতো মূত্রথলির দ্বারেও সংকোচন ও প্রসারণ পেশি থাকে। একে মূত্রপথ বলে। প্রয়োজনে পেশি সংকোচন ও প্রসারণের ফলে দেহ থেকে মূত্র নির্গত হয়।

নতুন শব্দ : অক্সিন, হরমোন, জিব্বেরেলিন, ইথিলিন, সাইটোকাইনিন, নিউরন, অ্যাক্সন, ডেনড্রন, ডেনড্রাইট, সিন্যাপস, গুরুমস্তিষ্ক, ধূসর পদার্থ, শ্বেত পদার্থ, পনস, মেডুলা, প্রলম্বিত অংশ, আজ্ঞাবাহী স্নায়ু, অনুভূতিবাহী স্নায়ু, প্রতিবর্ত চক্র, প্রতিবর্ত ক্রিয়া

এ অধ্যায় শেষে যা শিখলাম–

- নিউরনে সেন্ট্রিওল থাকে না।
- নিউরনের গঠন দেহকোষের চেয়ে ভিন্ন।
- পরপর দুইটি নিউরনের প্রথমটার অ্যাক্সন ও পরেরটার ডেনড্রাইটের মধ্যে একটি স্নায়ুসন্ধি থাকে। একে সিন্যাপস বলে। সিন্যাপসের মধ্য দিয়েই একটি নিউরন থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা পরবর্তী নিউরনে প্রবাহিত হয়।
- গুরু মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থের মধ্যে কয়েকটি স্তরে সাজানো বিশেষ স্নায়ুকোষ দেখা যায়। এই কোষগুলো গুরু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে স্থানে স্থানে গুচ্ছ বেঁধে স্নায়ুকেন্দ্র সৃষ্টি করে।
- মেরুরজ্জুর ভিতরে থাকে ধূসর পদার্থ আর বাইরে থাকে শ্বেত পদার্থ।
- হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, ক্ষরণকারী গ্রন্থি ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হরমোনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করো।

২. অক্সিন ও জিব্বেরেলিনের কাজ উল্লেখ করো।

৩. প্রতিবর্ত ক্রিয়া ব্যাখ্যা করো।

৪. বৃক্কের কাজ বর্ণনা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি উদ্ভিদের ফুল ফোটাতে সাহায্য করে?

ক. জিব্বেরেলিন খ. সাইটোকাইনিন

গ. ফ্লোরিজেন ঘ. অক্সিন

২. নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য নিষ্কাশনে মানবদেহের কোন অঙ্গটি প্রধান ভূমিকা রাখে?

ক. বৃক্ক খ. ত্বক

গ. নাক ঘ. পায়ু

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ফারিহার কক্ষে জানালার কাছে টবের মধ্যে লাগানো মানিপ্ল্যান্ট গাছটি দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় এর লতাগুলো জানালার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ফারিহা হাত দিয়ে এগুলোকে কক্ষের ভিতর দিকে এনে দিলেও এরা আবার জানালার দিকেই ধাবিত হয়।

৩. ফারিহার গাছটি কী কারণে জানালার দিকে ধাবিত হয়?

ক. বাতাস খ. জলীয়বাষ্প

গ. আলো ঘ. তাপ

৪. ফারিহার মানিপ্ল্যান্ট গাছটির বৃদ্ধিতে সাহায্য করে–

i. জিব্বেরেলিন

ii. অক্সিন

iii. ইথিলিন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

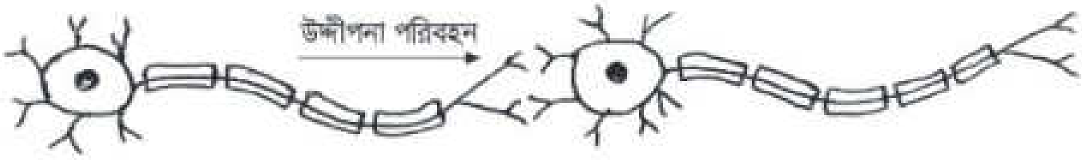

ক. হরমোন কী?

খ. উদ্ভিদে অক্সিনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

গ. মানুষের গুরুমস্তিষ্কে উপরের কোষটির অবস্থান ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মানবদেহে উদ্দীপনা পরিবহনে উপরের কোষের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

২. জাহিদ খুব মনোযোগ দিয়ে স্নায়ুতন্ত্রের গঠনের একক আঁকছিল। এমন সময় পেছন থেকে তার বোন জারিয়া পিঠে খোঁচা দিল। জাহিদ পিছনে না তাকিয়েই তৎক্ষণাৎ জারিয়ার হাত ধরে ফেলল। জাহিদ তখন জারিয়াকে বলল যে, তার হাত ধরতে পারার সাথে তার অঙ্কনের বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে।

ক. মানবদেহের প্রধান রেচন অঙ্গ কী?

খ. ট্রাফিক চলন বলতে কী বোঝায়?

গ. জাহিদ যা আঁকছিল তার গঠন বর্ণনা করো।

ঘ. জারিয়ার হাত ধরতে পারার সাথে জাহিদের দেহের স্নায়ুবিক প্রক্রিয়াটি কীভাবে জড়িত বিশ্লেষণ করো।

নিজেরা করো

১. তোমার চোখের পাতার উপর তীব্র আলো পড়লে তুমি চোখ বন্ধ করে ফেল কেন? কারণটি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করো।

২. তোমরা একটি পাতাবাহার গাছের আগা কেটে দাও। এবার কয়েক দিন ধরে পর্যবেক্ষণ করো। কী ঘটে এবং কেন ঘটে তা ব্যাখ্যা করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরমাণুর গঠন

পরমাণু খুব ক্ষুদ্র কণা। তাই এর গঠন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সহজ নয়। তবে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পরমাণুর গঠন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেছে। পরমাণুতে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার ভিন্নতার কারণে পরমাণুর ধর্মে পার্থক্য দেখা যায়।

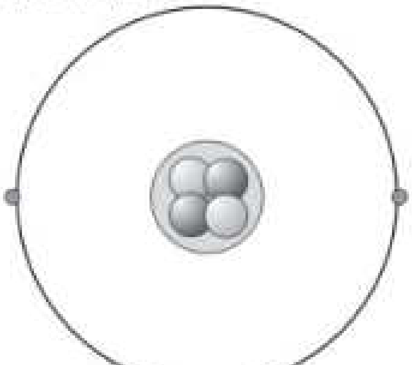

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পারমাণবিক সংখ্যা ও ভর সংখ্যা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- আইসোটোপ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইলেকট্রন বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারব;
- আয়ন কীভাবে সৃষ্টি হয় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের পার্থক্য করতে পারব;
- অ্যানায়ন ও ক্যাটায়ন ব্যবহার করে রাসায়নিক সংকেত প্রণয়ন করতে পারব;
- আইসোটোপের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব;
- আমাদের জীবনে আইসোটোপের অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

পাঠ ১–৩ : পরমাণুর ধারণার বিকাশ ও গঠন

তোমরা জেনেছ যে, পদার্থ ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। এ ক্ষুদ্র কণা দুই রকমের– অণু ও পরমাণু। একের অধিক পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে অণু গঠন করে। পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণার বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ নানা সময় নানা রকম মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দে সর্বপ্রথম পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা নিয়ে মতবাদ পোষণ করেন। তার মতে, সকল পদার্থই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য (যা আর ভাঙ্গা যায় না) কণা দ্বারা গঠিত। তিনি এই ক্ষুদ্রতম কণার নাম দেন পরমাণু বা এটম (Atom)। এটম কথাটি তিনি নিয়েছিলেন গ্রীক শব্দ এটোমোস (Atomos) থেকে, যার অর্থ হলো অবিভাজ্য। তার সমসাময়িক সময়ের আরও দুজন দার্শনিক প্লেটো (Plato) এবং অ্যারিস্টটল (Aristotle) তার মতবাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। অ্যারিস্টটলের মতে, পদার্থসমূহ নিরবিচ্ছিন্ন (Continuous); একে যতই ভাঙ্গা হোক না কেন, পদার্থের কণাগুলো ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হতে থাকবে।

১৮০৩ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী জন ডাল্টন (John Dalton) পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা সম্পর্কে বলেন– পরমাণু হলো মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা এবং একে আর ভাঙ্গা যায় না। ডাল্টনের এ মতবাদ সকলে গ্রহণ করে। ফলে অ্যারিস্টটলের মতবাদটি পরিত্যক্ত হয়। আসলে পরমাণু অবিভাজ্য নয় বা ক্ষুদ্রতম কণিকাও নয়। পরমাণু বিভাজ্য। এরা ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত। ডাল্টনের পরমাণুবাদের এই সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য পরবর্তীতে আরও অনেকে পরমাণু মডেলের প্রস্তাব করেন। এদের মধ্যে রাদারফোর্ড ও বোরের পরমাণু মডেল গ্রহণযোগ্যতা পায়।

একসময় বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড ও তাঁর সহকর্মীরা একটি পরীক্ষা করেন, যা পরমাণুর গঠন সম্পর্কে ভালো ধারণা দেয়। পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে রাদারফোর্ড বলেন যে, পরমাণুতে ধনাত্মক আধান ও ভর একটি ক্ষুদ্র জায়গায় আবদ্ধ। এই জায়গাটি পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থিত। তাই তিনি এর নাম দেন নিউক্লিয়াস (Nucleus)। তিনি আরও ব্যাখ্যা দেন যে, পরমাণুর বেশিরভাগ জায়গা ফাঁকা, আর ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণার তেমন কোনো ভর নেই এবং তারা নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। রাদারফোর্ডের মডেল সৌরজগতের মতো। কিন্তু রাদারফোর্ড নির্দিষ্ট কোনো কক্ষপথের কথা বলেননি। বিজ্ঞানী বোর পরবর্তীকালে ধারণা দেন যে, ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণা কিছু নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, পরমাণু অবিভাজ্য নয়। পরমাণু ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটন ও আধান নিরপেক্ষ নিউট্রন রয়েছে। পরমাণুর ভরের প্রায় পুরোটাই নিউক্লিয়াসে থাকে। ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে। ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী জায়গা ফাঁকা। ফলে প্রকৃতপক্ষে পরমাণুর বেশিরভাগ জায়গা ফাঁকা।

চিত্র ৬.১ : হিলিয়াম পরমাণুতে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন

পাঠ ৪–৬ : পারমাণবিক সংখ্যা, ভরসংখ্যা ও আইসোটোপ

প্রতিটি মৌলের আলাদা আলাদা পরমাণু রয়েছে, যেমন- হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু অক্সিজেন গ্যাসের পরমাণু থেকে আলাদা। একটি মৌলের পরমাণু থেকে আরেকটি মৌলের পরমাণুর মধ্যে আকার, ভর ও ধর্মে পার্থক্য হয়ে থাকে। কেন এই পার্থক্য? পরমাণুতে প্রোটন বা ইলেকট্রনের সংখ্যার পার্থক্যের কারণে পরমাণুসমূহের মধ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে। তোমরা জানো যে, পরমাণু আধান নিরপেক্ষ। তাই পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকে। তবে কোনো মৌলের পরমাণুর বৈশিষ্ট্যকে বোঝানোর জন্য প্রোটনের সংখ্যা ব্যবহার করা হয়।

কোনো মৌলের একটি পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic Number) বলা হয়। হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুতে একটি প্রোটন আছে। তাই হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ১। অক্সিজেনের একটি পরমাণুতে ৮টি প্রোটন আছে। তাই অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ৮। পারমাণবিক সংখ্যা থেকে কী কী তথ্য পাওয়া যায় বলতে পার?

কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা ৬, এ থেকে কী তথ্য পাওয়া যায়? পারমাণবিক সংখ্যা যেহেতু কোনো মৌলের প্রোটনের সংখ্যা, তাই বোঝা যায় কার্বনের একটি পরমাণুতে ৬টি প্রোটন আছে। একটি পরমাণুতে যেহেতু প্রোটন আর ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান, তাই বোঝা যায় কার্বনের একটি পরমাণুতে ৬টি ইলেকট্রন আছে।

কোনো মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা থেকে বোঝা যায় কি ঐ মৌলের পরমাণুতে কয়টি নিউট্রন আছে? না, নিউট্রন সংখ্যা জানা যায় না। নিউট্রন সংখ্যা জানতে হলে মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা ও ভরসংখ্যা জানতে হবে। একটি পরমাণুতে ইলেকট্রনের ভর নগণ্য। পরমাণুর প্রায় সবটুকু ভর তার নিউক্লিয়াসে থাকে। অর্থাৎ কোনো পরমাণুর ভর তার প্রোটন ও নিউট্রনের ভর। আবার নিউট্রন ও প্রোটনের ভর প্রায় সমান। কোনো মৌলের পরমাণুতে প্রোটন ও নিউট্রনের সমষ্টিকে ভরসংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ

কোনো মৌলের ভরসংখ্যা = ঐ মৌলের পরমাণুতে (প্রোটনের সংখ্যা + নিউট্রনের সংখ্যা)

যেমন অক্সিজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ৮টি প্রোটন আর ৮টি নিউট্রন থাকে। তাই অক্সিজেনের ভরসংখ্যা ১৬। আবার সোডিয়ামের একটি পরমাণুতে ১১টি প্রোটন আর ১২টি নিউট্রন আছে। তাই সোডিয়ামের ভরসংখ্যা ১১+১২=২৩। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পারমাণবিক সংখ্যা ও ভরসংখ্যা জানা থাকলে নিউট্রন সংখ্যা জানা যায়। নিচের উদাহরণ থেকে তোমরা এটি ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

উদাহরণ : ক নামক একটি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা ১৭ ও ভরসংখ্যা ৩৫। ঐ মৌলের একটি পরমাণুতে কয়টি করে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন আছে?

সমাধান : ক মৌলটির পারমাণবিক সংখ্যা ১৭। কোনো মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা আসলে ঐ মৌলের একটি পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যা। তাই এক্ষেত্রে ক মৌলটির পরমাণুতে প্রোটন আছে ১৭টি।

আবার কোনো পরমাণুতে প্রোটন আর ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান। তাই ক মৌলের একটি পরমাণুতে ইলেকট্রন রয়েছে ১৭টি।

কোনো মৌলের পরমাণুর প্রোটনের সংখ্যা + নিউট্রনের সংখ্যা = ঐ মৌলের ভরসংখ্যা

অর্থাৎ ক মৌলের নিউট্রনের সংখ্যা = ক মৌলের ভরসংখ্যা – ক মৌলের প্রোটন সংখ্যা

অতএব, ক মৌলের নিউট্রনের সংখ্যা = ৩৫ – ১৭ = ১৮

আইসোটোপ : তোমরা ইতোমধ্যেই জেনেছ যে, একটি মৌলের প্রতিটি পরমাণুতে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রন থাকে। কিন্তু একটি মৌলের সকল পরমাণুর ভর এক নাও হতে পারে। কারণ একটি মৌলের বিভিন্ন পরমাণুতে বিভিন্ন সংখ্যায় নিউট্রন থাকতে পারে। যেমন হাইড্রোজেনের সকল পরমাণুতে একটি করে প্রোটন ও ইলেকট্রন থাকে। নিচের চিত্রগুলো দেখ।

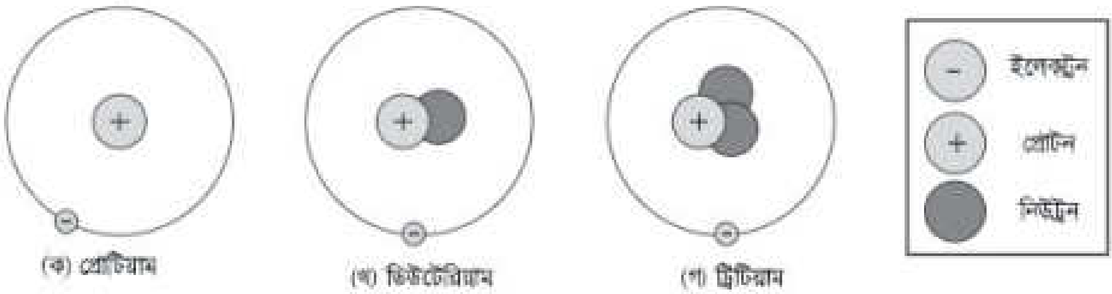

চিত্র ৬.২ : হাইড্রোজেনের আইসোটোপ

হাইড্রোজেনের (প্রোটিয়ামের) পরমাণুতে কোনো নিউট্রন নেই (ক চিত্রের পরমাণু)। তাই এদের ভরসংখ্যা ১। কিন্তু খ চিত্রের পরমাণুটির মতো হাইড্রোজেনের কিছু পরমাণুতে একটি নিউট্রন থাকে। এদের ভরসংখ্যা ২। আবার গ চিত্রের পরমাণুটির মতো হাইড্রোজেনের কিছু পরমাণুতে দুটি নিউট্রন থাকে। এদের ভরসংখ্যা ৩। চিত্রের তিনটি পরমাণু হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপ। এরকমভাবে, কোনো মৌলের ভিন্ন ধরনের পরমাণু যাদের প্রোটন বা পারমাণবিক সংখ্যা সমান কিন্তু ভরসংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে ঐ মৌলের আইসোটোপ বলে।

কার্বনের বেশিরভাগ পরমাণুতে ৬টি প্রোটন ও ৬টি নিউট্রন রয়েছে। কিন্তু কার্বনের কিছু পরমাণুতে ৭টি বা ৮টি নিউট্রনও থাকতে পারে। কার্বনের প্রধানত তিনটি আইসোটোপ রয়েছে।

পাঠ ৭ ও ৮ : আইসোটোপের ধর্ম ও ব্যবহার

একই মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপের প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যা সমান বলে আইসোটোপগুলোর মধ্যে রাসায়নিক ধর্মে তেমন পার্থক্য নেই। তবে যেহেতু তাদের ভর আলাদা তাই তাদের সহজেই শনাক্ত করা যায়।

সাধারণত আইসোটোপ অস্থায়ী। অস্থায়ী আইসোটোপ বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও কণা বিকিরণ করে। তাই এদেরকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বলা হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের এ ধর্ম কাজে লাগানো হয়। নিচে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইসোটোপের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে : বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে ও নিরাময়ে আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়। কোনো ক্ষুদ্র রক্তনালি ক্ষতিগ্রস্ত হলে রক্তের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কতগুলো মৌলের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাঠিয়ে তা শনাক্ত করা যায়। একইভাবে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর কোন কোষ ক্যান্সার আক্রান্ত, তা আইসোটোপ দিয়ে নির্ণয় করা যায়। আবার ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ ধ্বংস করা যায় আইসোটোপের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ব্যবহার করে। এছাড়াও তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করা হয়।

কৃষিক্ষেত্রে : কৃষিক্ষেত্রে পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে আইসোটোপের তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া কখন কোন সার কী পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে তা জানতে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়।

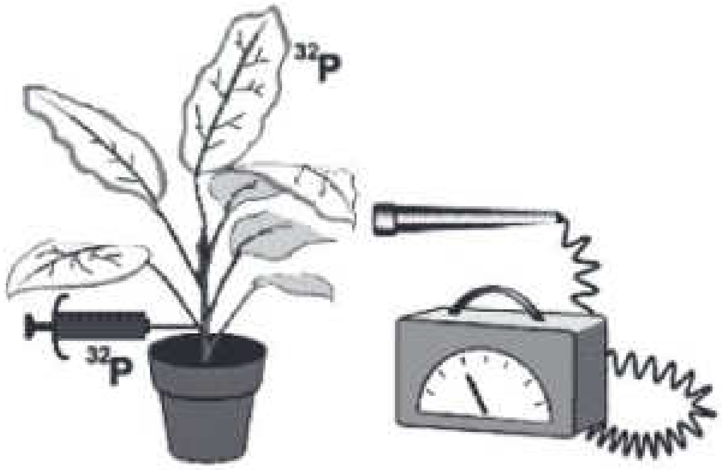

চিত্র ৬.৩ : কৃষি ক্ষেত্রে আইসোটোপের ব্যবহার

খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে : ব্যাকটেরিয়াসহ অনেক জীবাণু তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে মারা যায়। তাই তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করে খাদ্যদ্রব্য বা ফলমূলকে জীবাণুমুক্ত করে সংরক্ষণ করা হয়।

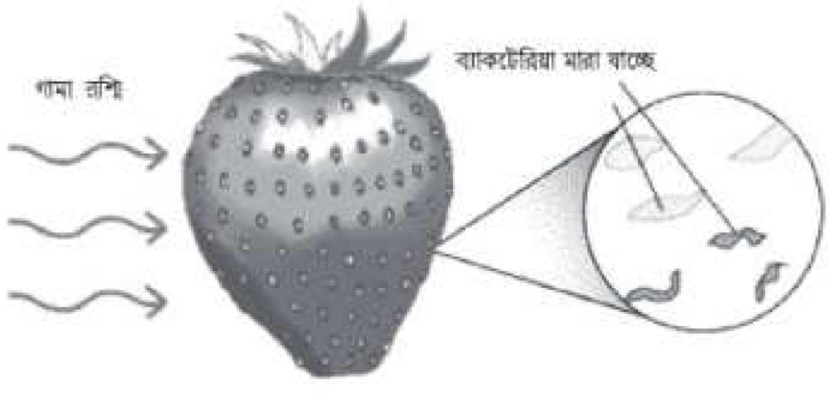

চিত্র ৬.৪: তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করে জীবাণুমুক্ত করা

ভূ-তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজে : তোমরা অনেক সময় খবরে শুনে থাক যে, কোনো দেশে কয়েক কোটি বছরের পুরনো ফসিল পাওয়া গেছে। কীভাবে বিজ্ঞানীরা জানেন যে, ফসিলটি কত বছরের পুরনো? এটি জানা যায় আইসোটোপের ক্ষয় থেকে। কোনো ফসিলে স্থায়ী ও অস্থায়ী আইসোটোপের অনুপাত থেকে বোঝা যায় ফসিলটি কত বছরের পুরনো।

পাঠ ৯–১১ : পরমাণুতে ইলেকট্রন কীভাবে বিন্যস্ত থাকে

তোমরা জেনেছ যে, পরমাণুতে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরে এবং তাদের সুনির্দিষ্ট কক্ষপথ রয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, একটি কক্ষপথে কয়টি ইলেকট্রন থাকবে? চিত্র ৬.২ এর হাইড্রোজেনের ক চিত্রটি দেখ। হাইড্রোজেন পরমাণুতে ১টি ইলেকট্রন থাকে। যা নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরে। হিলিয়াম পরমাণুতে (চিত্র ৬.১) ২টি ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে একটি কক্ষপথে ঘুরে। কক্ষপথগুলোতে $2n^2$ (যেখানে $n = 1, 2, 3$........কক্ষপথের ক্রমিক নম্বর) সূত্রানুযায়ী সর্বোচ্চ সংখ্যক ইলেকট্রন বিন্যস্ত থাকতে পারে। সে অনুযায়ী, ১টি লিথিয়াম পরমাণুতে ৩টি ইলেকট্রন আছে। এদের মধ্যে ২টি ইলেকট্রন প্রথম কক্ষপথে থাকে আর তৃতীয়টি দ্বিতীয় কক্ষপথে থাকে। একইভাবে কার্বন পরমাণুতে ৬টি ইলেকট্রন থাকায় এদের ২টি ইলেকট্রন প্রথম কক্ষপথে এবং বাকি ৪টি ইলেকট্রন দ্বিতীয় কক্ষপথে থাকে। এভাবে প্রথম কক্ষপথে সর্বোচ্চ ২টি, দ্বিতীয় কক্ষপথে সর্বোচ্চ ৮টি এবং তৃতীয় কক্ষপথে সর্বোচ্চ ১৮টি ইলেকট্রন থাকতে পারে। কক্ষপথগুলোকে শক্তিস্তরও বলা হয়। যদিও কক্ষপথ একটি পথ এবং শক্তিস্তর শক্তির নির্দিষ্ট মান, কিন্তু চলিত অর্থে এই দুই দ্বারা অনেক সময় কক্ষপথকেই বোঝানো হয়।

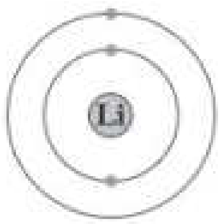

চিত্র ৬.৫ : লিথিয়াম পরমাণু

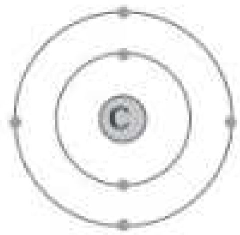

চিত্র ৬.৬ : কার্বন পরমাণু

এবার সোডিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস দেখা যাক। সোডিয়ামের ১টি পরমাণুতে ১১টি ইলেকট্রন থাকে। তাহলে এর ইলেকট্রনগুলো কয়টি কক্ষপথে থাকবে? নিশ্চয়ই ২, ৮, ১ এভাবে ৩টি কক্ষপথে থাকবে। অর্থাৎ প্রথম কক্ষপথে ২টি, দ্বিতীয় কক্ষপথে ৮টি এবং তৃতীয় কক্ষপথে ১টি থাকবে।

চিত্র ৬.৭ : সোডিয়াম পরমাণু

চিত্রের সাহায্যে ইলেকট্রন বিন্যাস বোঝা বেশ সহজ। কিন্তু সহজে এবং সংক্ষেপে সোডিয়াম পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাস বোঝাতে হলে ২, ৮, ১ এভাবে লেখা হয়। প্রদত্ত উদাহরণ থেকে নিচের ছকে বাকি মৌলগুলোর প্রতীক ও ইলেকট্রন বিন্যাস লেখ।

মৌল	পারমাণবিক সংখ্যা	প্রতীক	ইলেকট্রন বিন্যাস
হাইড্রোজেন	১		
হিলিয়াম	২		
লিথিয়াম	৩	Li	২, ১
বেরিলিয়াম	৪		
বোরন	৫		
কার্বন	৬		
নাইট্রোজেন	৭	N	২, ৫
অক্সিজেন	৮		
ফ্লোরিন	৯		
নিয়ন	১০		
সোডিয়াম	১১	Na	২, ৮, ১
ম্যাগনেসিয়াম	১২		
অ্যালুমিনিয়াম	১৩		
সিলিকন	১৪		
ফসফরাস	১৫		
সালফার	১৬		
ক্লোরিন	১৭	Cl	২, ৮, ৭
আর্গন	১৮		

পাঠ ১২ ও ১৩ : ইলেকট্রন বিন্যাস ও মৌলের ধর্ম

মৌলিক পদার্থের ধর্ম মূলত তাদের পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর নির্ভর করে। এ ইলেকট্রন বিন্যাসের ভিন্নতার কারণে সাধারণত মৌলগুলো কখনো নিষ্ক্রিয়, কখনো সক্রিয় বা আধান যুক্ত হয়।

১টি পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষপথে যে কয়টি ইলেকট্রন থাকতে পারে, যদি ঠিক সেই কয়টিই থাকে তাহলে কক্ষপথটি পূর্ণ থাকে। এরকম পরমাণুগুলো বেশ নিষ্ক্রিয় হয়। যেমন হিলিয়াম পরমাণুতে ২টি ইলেকট্রন থাকে। প্রথম কক্ষপথে যেহেতু সর্বোচ্চ ২টি ইলেকট্রন থাকতে পারে, সেহেতু হিলিয়াম পরমাণু বেশ নিষ্ক্রিয় এবং সেই সাথে স্থিতিশীল। প্রতিটি পরমাণুই এরকম স্থিতিশীল অবস্থায় থাকতে চায়।

১টি পরমাণুর শেষ কক্ষপথে বা শক্তিস্তরে যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বা কম ইলেকট্রন থাকে তাহলে কী হবে? ঐ পরমাণু অন্য পরমাণু থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে বা অন্য পরমাণুকে ইলেকট্রন দিয়ে বা অন্য পরমাণুর সাথে ভাগাভাগি করে সর্বাধিক স্থিতিশীল বা পূর্ণ অবস্থায় আসতে চায়। যেমন সোডিয়াম পরমাণুর প্রথম শক্তিস্তরে ২টি, দ্বিতীয় শক্তিস্তরে ৮টি এবং তৃতীয় শক্তিস্তরে ১টি ইলেকট্রন থাকে। এটি কি সর্বাধিক

স্থিতিশীল অবস্থা? নিশ্চয়ই না। তৃতীয় শক্তিস্তরে মাত্র ১টি ইলেকট্রন থাকায় এটি বেশ সক্রিয় এবং খুব স্থিতিশীল নয়। কীভাবে এটি স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারে? সোডিয়াম পরমাণু যদি ১টি ইলেকট্রন অন্য কোনো পরমাণুকে দিয়ে দিতে পারে তাহলে সোডিয়াম পরমাণুতে প্রথম শক্তিস্তরে ২টি এবং দ্বিতীয় শক্তিস্তরে ৮টি ইলেকট্রন থাকে। এটি একটি স্থিতিশীল অবস্থা। তবে ১টি ইলেকট্রন বর্জন করে বা হারিয়ে নিজে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তোমরা জানো পরমাণু আধান নিরপেক্ষ। কিন্তু সোডিয়াম পরমাণু ১টি ইলেকট্রন হারিয়ে কি আধান নিরপেক্ষ থাকে? না থাকে না।

১টি ইলেকট্রন হারানোর পর সোডিয়াম পরমাণু আর আধান নিরপেক্ষ নেই, আধানযুক্ত হয়েছে। এরকম আধানযুক্ত পরমাণুকে বলে আয়ন। যে আয়নে ধনাত্মক আধান আছে তাকে ক্যাটায়ন বলে। তাহলে সোডিয়াম পরমাণু ১টি ইলেকট্রন হারানোর পর ক্যাটায়নে পরিণত হয়েছে।

এবার আরেকটি উদাহরণ দেখা যাক। ফ্লোরিন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস ২, ৭। এটি কি সর্বাধিক স্থিতিশীল অবস্থা? নিশ্চয়ই না। কারণ দ্বিতীয় শক্তিস্তরে ৮টি ইলেকট্রন নেই। তাহলে সর্বাধিক স্থিতিশীল অবস্থায় যেতে চাইলে ফ্লোরিন পরমাণুকে কী করতে হবে? এটি কি সোডিয়াম পরমাণুর মতো ইলেকট্রন অন্যকে দিয়ে দেবে? না, ৭টি ইলেকট্রন দেওয়া বেশ কঠিন। বরং ফ্লোরিন পরমাণু যদি ১টি ইলেকট্রন কারো কাছ থেকে নিতে পারে তাহলে এটি আরো স্থিতিশীল হতে পারে কারণ তখন এটির দ্বিতীয় শক্তিস্তরে ৮টি ইলেকট্রন থাকবে। দেখা যাক, ১টি ইলেকট্রন যদি কারো কাছ থেকে পায় (ধরা যাক সোডিয়াম পরমাণু থেকে) তাহলে এটি কি আর আধান নিরপেক্ষ থাকে? না, আধানযুক্ত হয়ে যায়।

ফ্লোরিন পরমাণু ১টি ইলেকট্রন গ্রহণ করার পর ঋণাত্মক আধানযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয়েছে। এরকম ঋণাত্মক আধানযুক্ত আয়নকে অ্যানায়ন বলে।

ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জনের মাধ্যমে পরমাণু আয়নে পরিণত হয়। ২টি পরমাণুর মধ্যে যেটি ইলেকট্রন বর্জন করে সেটি ক্যাটায়নে বা ধনাত্মক আয়নে এবং যেটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে সেটি ঋণাত্মক আয়নে বা অ্যানায়নে পরিণত হয়। ফলে তাদের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল কাজ করে। তারা একে অন্যের কাছে আসলে ইলেকট্রন সজ্জা পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এভাবে ২টি বা ততোধিক ভিন্ন মৌলের পরমাণু থেকে যৌগ তৈরি হয়। এ সম্পর্কে তোমরা পরবর্তীকালে আরও জানবে।

$$Na \longrightarrow Na^{+} + e^{-}$$

$$F + e^{-} \longrightarrow F^{-}$$

$$Na + F \longrightarrow Na^{+}F^{-} \text{ বা } NaF$$

এ অধ্যায় শেষে যা শিখলাম–

- পরমাণু অবিভাজ্য নয়। পরমাণু ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত।
- পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট প্রোটন ও আধান নিরপেক্ষ নিউট্রন রয়েছে। পরমাণুর ভরের প্রায় পুরোটাই নিউক্লিয়াসে থাকে।

- ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে। ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী জায়গা ফাঁকা। প্রকৃতপক্ষে পরমাণুর বেশিরভাগ জায়গাই ফাঁকা।
- প্রথম কক্ষপথে সর্বোচ্চ ২টি, দ্বিতীয় কক্ষপথে সর্বোচ্চ ৮টি এবং তৃতীয় কক্ষপথে সর্বোচ্চ ১৮টি ইলেকট্রন থাকতে পারে। কক্ষপথগুলোকে শক্তিস্তরও বলা হয়।
- সর্বশেষ কক্ষপথে যে কয়টি ইলেকট্রন থাকতে পারে, ঠিক সেই কয়টি ইলেকট্রনই যদি ঐ শক্তিস্তরে থাকে, তাহলে সেই কক্ষপথটি পূর্ণ থাকে। এরকম পরমাণুগুলো বেশ নিষ্ক্রিয় হয়।
- ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জনের মাধ্যমে পরমাণু অধিকতর স্থিতিশীলতা অর্জন করে এবং আয়নে পরিণত হয়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. ———— এর মতবাদে পরমাণু অবিভাজ্য।

২. পরমাণুর ভরের প্রায় পুরোটাই ———— থাকে।

৩. পরমাণুর বেশিরভাগ জায়গাই————।

৪. পরমাণুতে———— সংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বলে।

৫. একটি মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপের প্রোটনের সংখ্যা ————।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. একটি পরমাণুতে কোথায় কোথায় ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন থাকে তা চিত্র এঁকে দেখাও ও বর্ণনা করো।

২. নাইট্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ৭। একটি নাইট্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস এঁকে দেখাও।

৩. চিকিৎসা ও কৃষিক্ষেত্রে আইসোটোপের ব্যবহার আলোচনা করো।

৪. পরমাণু কেন আয়নে পরিণত হয় তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

৫. ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন কীভাবে তৈরি হয় তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. একটি পরমাণুর দ্বিতীয় কক্ষপথে সর্বোচ্চ কয়টি ইলেকট্রন থাকে?

ক. ২ খ. ৮

গ. ১৮ ঘ. ৩২

২. রাদারফোর্ডের পরীক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে–

i. পরমাণু অবিভাজ্য

ii. পরমাণুকে ভাঙা যায়

iii. পরমাণুর বেশিরভাগ অংশই ফাঁকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ii খ. iii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

নিচের বাক্যটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

কোনো মৌলের একটি পরমাণুতে ১০টি প্রোটন ও ৮টি নিউট্রন রয়েছে।

৩. পরমাণুটির ভরসংখ্যা কত?

ক. ১০ খ. ১৬

গ. ১৮ ঘ. ২৬

৪. উদ্দীপকে উল্লেখিত মৌলটি কী?

ক. অক্সিজেন খ. সালফার

গ. সোডিয়াম ঘ. নিয়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. X পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা ১১। অন্যদিকে Y পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা ১৭ এবং নিউট্রন সংখ্যা ১৮।

ক. কার্বনের আইসোটোপ কয়টি?

খ. ক্যাটায়ন বলতে কী বোঝায়?

গ. Y পরমাণুর ভরসংখ্যা কত?

ঘ. X ও Y পরমাণুর ইলেকট্রনবিন্যাস প্রদর্শনপূর্বক এদের বন্ধন তৈরি করার সক্ষমতা ব্যাখ্যা করো।

২.

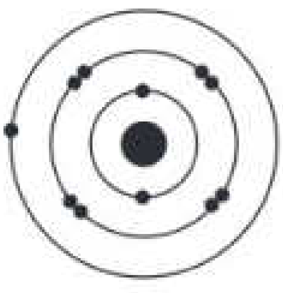

চিত্র- ১

চিত্র- ২

ক. এটম শব্দের অর্থ কী?

খ. অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ৮ বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের ১ নং চিত্রের পরমাণুটি সক্রিয় না নিষ্ক্রিয় ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ১ ও ২ নং চিত্রের পরমাণুর পারমাণবিক গঠনের তুলনামূলক আলোচনা করো।

সপ্তম অধ্যায়

পৃথিবী ও মহাকর্ষ

এ মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বল কি সকল ক্ষেত্রে সমান? কিসের উপর এই বলের মান নির্ভর করে? পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে পড়ন্ত বস্তুর যে ত্বরণ হয়, তার মান কত? এই মান কেন পরিবর্তিত হয়? এই অধ্যায়ে আমরা মহাকর্ষ, অভিকর্ষ, অভিকর্ষজ ত্বরণ, ভর ও ওজন নিয়ে আলোচনা করব।

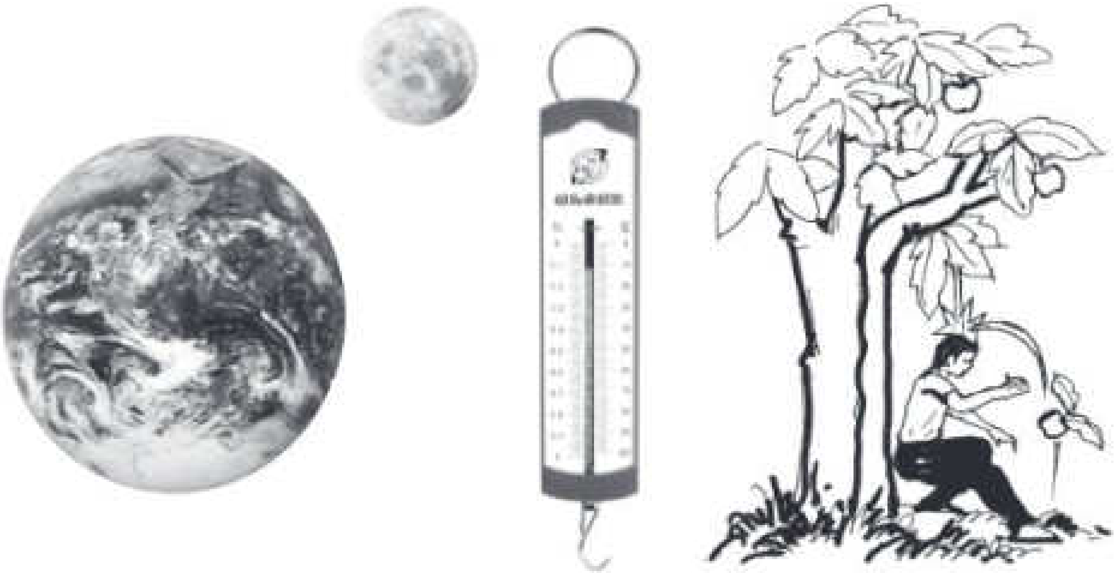

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- মহাকর্ষ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মহাকর্ষ ও অভিকর্ষের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অভিকর্ষজ ত্বরণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ভর ও ওজনের পার্থক্য করতে পারব;
- অভিকর্ষজ ত্বরণের প্রভাবে বস্তুর ওজনের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারব;
- আমাদের জীবনে অভিকর্ষজ ত্বরণের অবদান উপলব্ধি করব।

পাঠ ১ : মহাকর্ষ

আমরা লাফ দিয়ে উপরের দিকে উঠতে চাইলে বেশি দূর উঠতে পারি না। আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসি। গাছের ফল মাটিতে পড়ে। ক্রিকেট বলকে উপরের দিকে ছুড়ে দিলে মাটিতে পড়ে। এর কারণ কী? কারণ পৃথিবী আমাদেরকে তার নিজের দিকে টানে বা আকর্ষণ করে। শুধু পৃথিবী কেন, সবকিছুই আমাদের আকর্ষণ করে। আসলে এ মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুকণা পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বলকে মহাকর্ষ বল বলে। এই ঘটনাকে (Phenomenon) বলে মহাকর্ষ।

তোমরা নিশ্চয়ই নিউটন ও আপেল মাটিতে পড়ার কাহিনী শুনে থাকবে। কথিত আছে, নিউটন একদিন বাগানে বসে চিন্তা করছিলেন। এমন সময় তিনি গাছ থেকে একটি আপেল মাটিতে পড়তে দেখেন। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, আপেলটি মাটিতে পড়ল কেন? নিশ্চয়ই কেউ একে মাটির দিকে টানছে। চিন্তা-ভাবনা শেষে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পৃথিবী সকল বস্তুকে তার নিজের দিকে টানে। পরে তিনি আরও সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শুধু পৃথিবী নয়, এ মহাবিশ্বের সকল বস্তুকণাই একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এ বিশ্বের যেকোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ বল তাই মহাকর্ষ বল।

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র ও মহাকর্ষ বল

দুটি বস্তুকণার মধ্যকার এ আকর্ষণ বলের মান শুধু কণাদ্বয়ের ভর এবং এদের মধ্যকার দূরত্বের উপর নির্ভর করে। এদের প্রকৃতি কিংবা মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না। বস্তু কণাদ্বয়ের ভর বেশি হলে আকর্ষণ বলও বেশি হয় আর তাদের মধ্যে দূরত্ব বেশি হলে বল কম হয়। এ আকর্ষণ সম্পর্কে নিউটনের একটি সূত্র আছে যা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র নামে পরিচিত।

সূত্র : মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণ বলের মান বস্তুকণাদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এ বল বস্তুকণাদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।

ধরা যাক, m_1 এবং m_2 ভরের দুটি বস্তু কণা পরস্পর থেকে d দূরত্বে অবস্থিত (চিত্র ৭.১)। এদের মধ্যকার আকর্ষণ বল F হলে, মহাকর্ষ সূত্রানুসারে,

$$F = G\frac{m_1 m_2}{d^2}$$

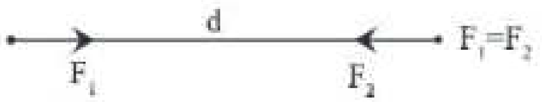

চিত্র ৭.১ : মহাকর্ষ বল

এখানে G একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। একে সর্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক বলে। এর অর্থ হচ্ছে, দুটি এক কিলোগ্রাম ভরের বস্তু এক মিটার দূরত্বে স্থাপন করলে এরা পরস্পরকে যে বলে আকর্ষণ করে, তার মান সংখ্যাগতভাবে G এর মানের সমান।

মহাকর্ষ সূত্রানুসারে আমরা দেখতে পাই, নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত দুটি বস্তু কণাদ্বয়ের বস্তুর ভরের গুণফল দ্বিগুণ হলে বল দ্বিগুণ হবে, ভরের গুণফল তিনগুণ হলে বল তিনগুণ হবে। আর নির্দিষ্ট ভরের দুটি বস্তু কণার মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্বিগুণ করলে বল এক-চতুর্থাংশ হবে, দূরত্ব তিনগুণ করলে বল নয় ভাগের এক ভাগ হবে।

মহাকর্ষ বলের প্রভাবে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে। এবার বলো, অন্য সকল গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরে কেন?

পাঠ ২ ও ৩ : অভিকর্ষ ও অভিকর্ষজ ত্বরণ

অভিকর্ষ : আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে, এ মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুকণাই একে অপরকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করে। এ মহাবিশ্বের যেকোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাই মহাকর্ষ। দুটি বস্তুর একটি যদি পৃথিবী হয়, তাহলে পৃথিবী বস্তুটিকে যে আকর্ষণ করে তাকে মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ বলে। অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণই অভিকর্ষ। গাছের ফল মাটিতে পড়ে। ক্রিকেট বলকে উপরের দিকে ছুড়ে দিলেও বলটি মাটিতে এসে পড়ে। এখানে পৃথিবী যেমন ফল বা ক্রিকেট বলকে আকর্ষণ করে, তেমনি এরাও পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। পৃথিবী অনেক বড় এবং এর আকর্ষণ বল অনেক বেশি হওয়ায় ফল ও ক্রিকেট বল মাটিতে পড়ে। সহজ কথায় পৃথিবী এবং অন্য যেকোনো বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাই অভিকর্ষ। সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে যে আকর্ষণ তা মহাকর্ষ, কিন্তু পৃথিবী এবং তোমার বিজ্ঞান বই–এর মধ্যে যে আকর্ষণ তা অভিকর্ষ।

অভিকর্ষজ ত্বরণ : আমরা জানি বল প্রয়োগ করলে কোনো বস্তুর বেগের পরিবর্তন হয়। সময়ের সাথে যে হারে বেগ বৃদ্ধি পায় তাকে ত্বরণ বলে। অভিকর্ষ বলের প্রভাবেও বস্তুর ত্বরণ হয়। এ ত্বরণকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বা মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ বলা হয়। যেহেতু বেগ বৃদ্ধির হারকে ত্বরণ বলে, সুতরাং অভিকর্ষ বলের প্রভাবে কোনো স্থানে মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলে।

অভিকর্ষজ ত্বরণকে g দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেহেতু অভিকর্ষজ ত্বরণ এক প্রকার ত্বরণ, সুতরাং এর একক হবে ত্বরণের একক অর্থাৎ মিটার/সেকেন্ড^2।

ধরা যাক, M = পৃথিবীর ভর, m = ভূপৃষ্ঠে বা এর নিকটে অবস্থিত কোনো বস্তুর ভর, d = বস্তু ও পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব। তাহলে মহাকর্ষ সূত্রানুসারে অভিকর্ষ বল, $F = G\frac{Mm}{d^2}$

আবার বলের পরিমাপ থেকে আমরা পাই, অভিকর্ষ বল = ভর × অভিকর্ষজ ত্বরণ

$$\text{অর্থাৎ } F = mg$$

উপরিউক্ত দুই সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়,

$$mg = \frac{GMm}{d^2}$$

$$\text{বা, } g = \frac{GM}{d^2}$$

এ সমীকরণের ডান পাশে বস্তুর ভর m অনুপস্থিত। সুতরাং অভিকর্ষজ ত্বরণ বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে না। যেহেতু G এবং পৃথিবীর ভর M ধ্রুবক, তাই g-এর মান পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুর দূরত্ব d-এর উপর নির্ভর করে। সুতরাং g–এর মান বস্তু নিরপেক্ষ হলেও স্থান নিরপেক্ষ নয়। এর অর্থ হলো পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব d বিভিন্ন হলে g-এর মানও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম হবে।

অভিকর্ষজ ত্বরণের পরিবর্তন : পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব অর্থাৎ পৃথিবীকে গোলাকার বিবেচনা করলে এর ব্যাসার্ধ = R হবে। আর ভূপৃষ্ঠে $g = \frac{GM}{R^2}$

যেহেতু পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার নয়, মেরু অঞ্চলে একটুখানি চাপা, তাই পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব R ধ্রুবক নয়। সুতরাং ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র g-এর মান সমান নয়। মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব R সবচেয়ে কম বলে সেখানে g-এর মান সবচেয়ে বেশি। মেরু অঞ্চলে g-এর মান ৯.৮৩ মিটার/সেকেন্ড^২। মেরু থেকে বিষুব অঞ্চলের দিকে R এর মান বাড়তে থাকায় g-এর মান কমতে থাকে। বিষুব অঞ্চলে R এর মান সবচেয়ে বেশি বলে g-এর মান সবচেয়ে কম। ৯.৭৮ মিটার/সেকেন্ড^২। হিসাবের সুবিধার জন্য ভূপৃষ্ঠে g-এর আদর্শ মান ধরা হয় ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড^২। এর অর্থ হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ প্রতি সেকেন্ডে ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

কোনো বস্তুকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে অভিকর্ষ বলের প্রভাবে ভূমিতে পৌঁছায়। একই উচ্চতা থেকে একই সময় এক টুকরা পাথর ও এক টুকরা কাগজ ছেড়ে দিলে এগুলো একই সময়ে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাবে কি? যেহেতু বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষজ ত্বরণ বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে না, তাই পাথর ও কাগজের উপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষজ ত্বরণ একই। সুতরাং তাদের একই সময়ে মাটিতে পৌঁছানো উচিত। কিন্তু বাস্তবে পাথরটি কাগজের আগেই মাটিতে পৌঁছায়। বাতাসের বাধার বিভিন্নতার কারণে এরূপ হয়। কাগজের টুকরার উপর বাতাসের বাধা তুলনামূলকভাবে বেশি। তাই এটি ধীরে নিচের দিকে পড়ে। বাতাসের বাধা না থাকলে পাথর এবং কাগজের টুকরো অবশ্যই একই সময়ে মাটিতে পৌঁছাত।

পাঠ ৪ : ভর ও ওজন

যখন আমরা বলি কবিরের ওজন ৯০ কিলোগ্রাম (কেজি) তখন আমরা আসলে বোঝাতে চাই যে, কবিরের দেহের ভর ৯০ কিলোগ্রাম (কেজি)। আমরা যখন ৫০ কেজি চাউলের বস্তা কিনি, তখন আমরা আসলে ঐ বস্তার চাউলের ভর ৫০ কেজি বুঝি, কিন্তু বস্তার চাউলের ওজন বোঝাই না।

পদার্থবিজ্ঞানে ভর ও ওজন সম্পূর্ণ পৃথক দুটি রাশি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা ওজন কথাটাকে অপব্যবহার করি। আসলে আমরা কোনো বস্তুর ভরকে ঐ বস্তুর ওজন বলে থাকি। তবে ভর ও ওজনের পার্থক্য কী ?

ভর : প্রত্যেক বস্তু পদার্থ দ্বারা গঠিত। ভর হলো কোনো বস্তুতে পদার্থের পরিমাণ। বস্তুর ভর এর অবস্থান, আকৃতি ও গতি পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তিত হয় না। যে পরমাণু ও অণু দিয়ে বস্তুটি গঠিত তার সংখ্যা ও সংযুক্তির উপর বস্তুটির ভর নির্ভর করে। ভরের আন্তর্জাতিক একক হলো কিলোগ্রাম বা কেজি (kg)। বেশি ভরকে (যেমন এক ট্রাক চাউল) মেট্রিক টনে মাপা হয়। এক টন ১০০০ কিলোগ্রামের সমান। অল্প ভরকে মাপা হয় গ্রামে। যেমন কোনো পেনসিলের ভর ৫ গ্রাম (g)। ১ কেজি বা কিলোগ্রাম সমান ১০০০ গ্রাম।

ওজন : আমরা জানি যে, কোনো বস্তুকে উপরের দিকে ছুড়ে দিলে ভূমিতে ফিরে আসে। এটা ঘটে বস্তুর ওজনের জন্য যা একে পৃথিবীর দিকে টানে। পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের কারণে এটা ফিরে আসে। ২০১৫

কোনো বস্তুকে পৃথিবী যে বল দ্বারা আকর্ষণ করে, তাকে ঐ বস্তুর ওজন বলে। কোনো বস্তুর উপর শুধু অভিকর্ষজ বল কাজ করলে এবং পৃথিবীর কোনো স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণ g এবং বস্তুটির ভর m হলে ঐ স্থানে বস্তুর ওজন W = mg হবে।

ওজনের একক হলো বলের একক অর্থাৎ নিউটন। পৃথিবী পৃষ্ঠে ১০ কেজি ভরের বস্তুর ওজন হবে,
W =১০ x ৯.৮ নিউটন = ৯৮ নিউটন

স্প্রিং নিক্তির সাহায্যে কোনো বস্তুর ওজন পরিমাপ করা যায়।

পাঠ ৫ : ভর ও ওজনের সম্পর্ক

আমরা জানি বস্তুর মধ্যে পদার্থের পরিমাণই হচ্ছে এর ভর। ভর হচ্ছে একটি ধ্রুব রাশি যা ভূপৃষ্ঠে বা ভূপৃষ্ঠের উপরে বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয় না। ৭৫ কেজি ভরের একজন মহাশূন্যচারীর ভর চাঁদে কিংবা পৃথিবীর কক্ষপথেও ৭৫ কেজিই থাকবে। মহাশূন্যচারী বা কোনো বস্তু যতটুকু পদার্থ দিয়ে তৈরি, বস্তু বা মহাশূন্যচারীর স্থান পরিবর্তনের ফলে তাতে কোনো পরিবর্তন হয় না বলে তার ভর সর্বত্র অপরিবর্তিত থাকে।

যেহেতু বস্তুর ভর একটি ধ্রুব রাশি, সুতরাং বস্তুর ওজন অভিকর্ষজ ত্বরণ g এর উপর নির্ভর করে। যেসব কারণে অভিকর্ষজ ত্বরণের পরিবর্তন ঘটে সেসব কারণে বস্তুর ওজনও পরিবর্তিত হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে উঠা যায় বস্তুর ওজন তত কমতে থাকে। বস্তুর ওজন বস্তুর মৌলিক ধর্ম নয়। কোনো বস্তুর ওজন থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণ শূন্য, তাই সেখানে বস্তুর ওজনও শূন্য। মহাশূন্যে কোনো বস্তুর ওজন শূন্য হলে তখন বস্তুর উপর কোনো মহাকর্ষ বল কাজ করে না। চাঁদের অভিকর্ষজনিত ত্বরণের মান পৃথিবীতে অভিকর্ষজ ত্বরণের প্রায় $\frac{১}{৬}$ ভাগ। সুতরাং চাঁদে ১ কেজি ভরের বস্তুর ওজন হবে প্রায় $\frac{৯.৮}{৬}$ নিউটন ≈ ১.৬৩ নিউটন (N)।

কোনো বস্তুর ওজন পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে তার দূরত্বের উপর নির্ভর করে। যদি দূরত্ব বাড়ানো হয় তাহলে তার উপর পৃথিবীর আকর্ষণ কমে যায়, ফলে বস্তুর ওজন হ্রাস পায়। ভূপৃষ্ঠে ১ কেজি ভরের কোনো বস্তুর ওজন ৯.৮ নিউটন হলেও পৃথিবী থেকে দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে বস্তুর ওজন কমতে থাকে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠেও কোনো বস্তুর ওজনের অতি সামান্য তারতম্য ঘটে। এর একটি কারণ হচ্ছে পৃথিবী সুষম গোলক নয় এবং ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র অভিকর্ষজ ত্বরণের মানও এক নয়। অবশ্য এ পার্থক্য এত ক্ষুদ্র যে কেবল সুবেদী ওজন মাপক যন্ত্রের সাহায্যেই তা পরিমাপ করা যাবে। অধিকাংশ হিসাব নিকাশের সময় আমরা এ পার্থক্য উপেক্ষা করি। ১ কেজি ভরের কোনো বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশি হবে পৃথিবীর দুই মেরুতে অর্থাৎ উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুতে। যেখানে এর ওজন হবে ৯.৮৩ নিউটন। বিষুবীয় অঞ্চলে এর ওজন সবচেয়ে কম হবে ৯.৭৮ নিউটন। ক্রান্তীয় অঞ্চলের ওজন হবে ৯.৭৯ নিউটন।

যেহেতু বস্তুর ভর বেশি হলে তার ওজনও বেশি হয়, ওজন ভরের সমানুপাতিক। সুতরাং যে সকল যন্ত্র দিয়ে ওজন মাপা যায় সেগুলো দিয়ে ভরও মাপা যায়। স্প্রিং নিক্তি অনেক সময় কিলোগ্রাম এককে দাগাঙ্কিত থাকে। নিক্তি এবং ওজন মাপক যন্ত্রগুলো এমনভাবে দাগাঙ্কিত থাকে যে, অনেক সময় আমরা ভর ও ওজন উভয়ের জন্যই কিলোগ্রাম একক ব্যবহার করে থাকি। এটি অবশ্যই ভুল। ওজন এক প্রকার বল এবং বৈজ্ঞানিক হিসাব-নিকাশের সময় তা অবশ্যই নিউটন এককে পরিমাপ করতে হবে। যখন আমরা ১কেজি লিখিত একটি চাউলের প্যাকেট বা একটি দুধের টিন কিনি–তখন বুঝি ঐ প্যাকেটের চাউলের বা টিনের দুধের ভর ১ কেজি কিন্তু ওজন ১ কেজি নয়, পৃথিবীতে এগুলোর ওজন হবে ৯.৮ নিউটন। চাউলের প্যাকেটের ওজন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বা চাঁদে ভিন্ন হবে, যদিও ভরের কোনো পরিবর্তন হবে না।

পাঠ ৬ : পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণ ও বস্তুর ওজন

বস্তুর ওজন অভিকর্ষজ ত্বরণ g এর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যে সকল কারণে অভিকর্ষজ ত্বরণের পরিবর্তন ঘটে সে সকল কারণে বস্তুর ওজনও পরিবর্তিত হয়। বস্তুর ওজন বস্তুর মৌলিক ধর্ম নয়। স্থানভেদে বস্তুর ওজনের পরিবর্তন হয়। যে সকল কারণে ওজনের পরিবর্তন হয় নিচে তা বর্ণনা করা হলো।

(ক) ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে : পৃথিবীর আকৃতি ও আহ্নিক গতির জন্য বিভিন্ন স্থানে বস্তুর ওজন বিভিন্ন হয়।

(১) পৃথিবীর আকৃতির জন্য : পৃথিবী সুষম গোলক না হওয়ায় পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের সকল স্থান সমদূরে নয়। যেহেতু g এর মান পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্বের উপর নির্ভর করে, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে g এর মানের পরিবর্তন হয়। বিষুবীয় অঞ্চলে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব সবচেয়ে বেশি হওয়ায় g এর মান সবচেয়ে কম (৯.৭৮ মিটার/সেকেন্ড^{২})। সুতরাং বিষুবীয় অঞ্চলে কোনো বস্তুর ওজন সবচেয়ে কম হয়। বিষুবীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে যত যাওয়া যায়, কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব তত কমতে থাকে এবং g এর মান বাড়তে থাকে (৯.৮৩ মিটার/সেকেন্ড^{২}) । এর ফলে বস্তুর ওজনও বাড়তে থাকে। মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব সবচেয়ে কম হওয়ায় g এর মান মেরু অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি। ফলে ওজনও সবচেয়ে বেশি হয়।

(২) পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য: পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণন গতি বা আহ্নিক গতির জন্য অভিকর্ষজ ত্বরণ হ্রাস পায়। যদি আহ্নিক গতি না থাকতো (অর্থাৎ ধরে নাও পৃথিবীতে রাত-দিন হচ্ছে না), তাহলে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান বর্তমানের (ঘূর্ণায়মান পৃথিবীতে) অভিকর্ষজ ত্বরণের চেয়ে বেশি হতো।

(৩) মেরু থেকে কৌণিক দূরত্ব (অক্ষাংশ) এর জন্য: অভিকর্ষজ ত্বরণ বিষুবীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বস্তুর ওজনও বৃদ্ধি পায়।

(খ) ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতর কোনো স্থানে : ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে উঠা যায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মানও তত কমতে থাকে। এর ফলে ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে উঠা যায় বস্তুর ওজনও তত কমতে থাকে। এই কারণে পাহাড় বা পর্বতশীর্ষে বস্তুর ওজন কম হয়।

(গ) পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোনো স্থানে : ভূপৃষ্ঠ থেকে যত নিচে যাওয়া যায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ততই কমতে থাকে। এর ফলে পৃথিবীর যত অভ্যন্তরে যাওয়া যায় বস্তুর ওজন তত কমতে থাকে। এ কারণে খনিতে কোনো

বস্তুর ওজন কম হয়। পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান শূন্য। সুতরাং পৃথিবীর কেন্দ্রে যদি কোনো বস্তুকে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে বস্তুর উপর পৃথিবীর কোনো আকর্ষণ থাকবে না, অর্থাৎ বস্তুর ওজন শূন্য হবে।

পাঠ ৭ ও ৮ : লিফটে ও মহাশূন্যে ওজনের তারতম্য : ওজনহীনতার অনুভূতি।

পৃথিবীর কোনো স্থানে g এর মান নির্দিষ্ট। ফলে সেখানে কোনো ব্যক্তির ওজনও নির্দিষ্ট। তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে কোনো স্থানে কোনো ব্যক্তি তার ওজনের ভিন্নতা অনুভব করতে পারেন, এমনকি নিজেকে ওজনহীনও মনে করতে পারেন। কারণ প্রকৃত ওজন ($W = mg$) এবং কোনো ব্যক্তির অনুভূত ওজন একই রাশি না। লিফটের ভিতরে অনুভূত ওজন এর একটি উদাহরণ।

(১) স্থির লিফটের ভিতরে অনুভূত ওজন ঃ স্থির লিফটের ভিতরে একজন আরোহী লিফটের মেঝের উপর তাঁর প্রকৃত ওজনের ($W = mg$) সমান বল প্রয়োগ করেন। লিফটের মেঝে বা তলদেশও আরোহীর উপর সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে, যা আরোহী ওজন হিসেবে অনুভব করেন। এক্ষেত্রে অনুভূত ওজন প্রকৃত ওজনের সমান মানের হয়।

(২) সমবেগে গতিশীল লিফটে অনুভূত ওজন ঃ সমবেগে উপরে অথবা নিচে গতিশীল লিফটের আরোহীও একই সাথে সমবেগে গতিশীল থাকেন। ফলে আরোহীর উপর শুধু তার প্রকৃত ওজন (পৃথিবীর আকর্ষণ বল) ক্রিয়া করে। আরোহী লিফটের উপর প্রকৃত ওজনের সমান বল প্রয়োগ করেন ও লিফটের মেঝে এর সমান প্রতিক্রিয়া বল আরোহীর উপর প্রয়োগ করে। আরোহীর অনুভূত ওজন তাঁর প্রকৃত ওজনের সমান মানের হয়।

(৩) উপরের দিকে ত্বরণযুক্ত লিফটে ওজন ঃ স্থির অবস্থা থেকে উপরের দিকে উঠতে শুরু করতে লিফটের কেবল বা তারের মাধ্যমে (লিফট ও আরোহীর মোট ওজনের চেয়ে বেশি) একটি অতিরিক্ত ঊর্ধ্বমুখী বল লিফটের উপর প্রয়োগ করতে হবে। লিফটের মেঝে বা তলদেশ আরোহীর উপর তাঁর প্রকৃত ওজনের চেয়ে বেশি বল প্রয়োগ করবে। ফলে আরোহীর অনুভূত ওজন তাঁর প্রকৃত ওজনের চেয়ে বেশি হয়। এই অনুভূত ওজনকে আমরা প্রতিক্রিয়া বল হিসেবেও চিন্তা করতে পারি।

(৪) নিচের দিকে ত্বরণযুক্ত লিফটে ওজন : উপরে অবস্থিত স্থির লিফটকে নিচের দিকে চলমান করতে লিফটের কেবল বা তারের মাধ্যেমে প্রযুক্ত টানকে (লিফট ও আরোহীর মোট ওজনের থেকে) কমিয়ে দিতে হবে। লিফটের সাথে সাথে নিচে চলমান আরোহীর উপর লিফটের তলদেশ বা মেঝে আরোহীর প্রকৃত ওজনের চেয়ে কম মানের বল প্রয়োগ করে। তাই আরোহীর অনুভূত ওজন তার প্রকৃত ওজনের চেয়ে কম হয়।

(৫) মুক্তভাবে পড়ন্ত লিফটের ভিতরে ওজন ঃ দুর্ভাগ্যক্রমে লিফটের ভারবহী কেবল বা তারটি ছিড়ে গেলে লিফটটি আরোহীসহ নিচের দিকে মুক্তভাবে (বাতাসের বাধা ও অন্যান্য ঘর্ষণ উপেক্ষা করলে) পড়তে থাকে। লিফটের দড়িতে কোনো টান না থাকায় (কেবল ছিড়ে যাওয়ায়) লিফটের তলদেশ বা মেঝে আরোহীর উপর কোনো বল প্রয়োগ করে না। ফলে আরোহী নিজেকে ওজনহীন অনুভব করেন।

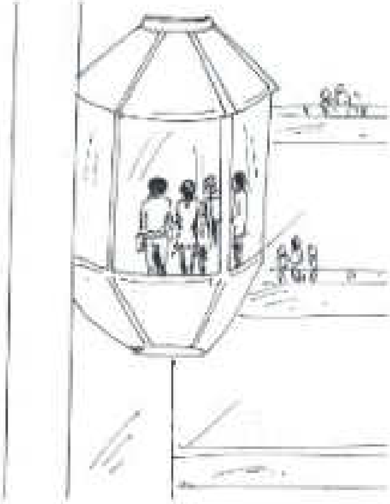

চিত্র ৭.২ : লিফট

মহাশূন্যযানের পৃথিবী বা চাঁদকে প্রদক্ষিণ করার সঙ্গে লিফটের মুক্তভাবে নিচে পড়ার সাদৃশ্য আছে। মহাশূন্যচারীরা মহাশূন্যযানে করে পৃথিবীকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে থাকেন। এ বৃত্তাকার গতি সৃষ্টির জন্য মহাশূন্যযানের ওজন ($W_s = m_sg$) এবং মহাশূন্যচারীর ওজন ($W_a = m_ag$) দায়ী এবং মহাশূন্যযান ও মহাকাশচারী দুই একই ত্বরণে গতিশীল থাকে। এজন্য মহাশূন্যযানের দেয়ালের সাপেক্ষে মহাশূন্যচারীর ত্বরণ শূন্য হয় এবং মহাশূন্যচারী মহাশূন্যযানের দেয়াল বা মেঝেতে কোনো বল প্রয়োগ করেন না। ফলে তিনি তার ওজনের বিপরীত কোনো প্রতিক্রিয়া বলও অনুভব করেন না। তাই তিনি ওজনহীনতা অনুভব করেন। এ অবস্থায় মহাশূন্যযান থেকে কোনো বস্তুকে ছেড়ে দিলে পড়ে না, গ্লাসের পানি উপুড় করলেও পড়বে না অর্থাৎ সবকিছুই ওজনহীন মনে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো কিছুই ওজনহীন হয় না, কেননা ঐ অবস্থানেও মহাশূন্যচারীর ভর আছে, ঐ স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণ g আছে, ফলে পৃথিবীর আকর্ষণ তথা ওজন আছে। কেবল মহাশূন্যযান g ত্বরণে গতিশীল হওয়ার কারণে এ আপাতত ওজনহীনতার উদ্ভব হচ্ছে। যদি ঐ স্থানে মহাশূন্যযান বৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ না করে, কিংবা পৃথিবীর দিকে মুক্তভাবে না পড়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু মহাশূন্যচারী অবশ্যই তাঁর ওজন টের পাবেন।

নতুন শব্দ : মহাকর্ষ, মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, অভিকর্ষ, অভিকর্ষজ ত্বরণ, ভর, ওজন, ওজনহীনতা, লিফট।

এ অধ্যায় শেষে যা শিখলাম–

- এ মহাবিশ্বের যেকোনো দুটি বস্তুর বা বস্তুকণার মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে মহাকর্ষ বলে।
- মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং এ আকর্ষণ বলের মান বস্তুকণাদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। এ বল বস্তুকণাদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।
- পৃথিবী এবং অন্য যেকোনো বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে অভিকর্ষজ বা মাধ্যাকর্ষণ বলে। ২০২১

- মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ বলে।
- অভিকর্ষজ ত্বরণ বা মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ g-এর আদর্শ মান ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড^2।
- বস্তুর মধ্যে পদার্থের পরিমাণই হচ্ছে এর ভর।
- কোনো বস্তুকে পৃথিবী যে বল দ্বারা আকর্ষণ করে তাকে বস্তুর ওজন বলে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব তিনগুণ বাড়ালে এদের আকর্ষণ বলের কী পরিবর্তন হবে এবং কেন পরিবর্তন হবে?

২. অভিকর্ষজ ত্বরণ বলতে কী বোঝায় ?

৩. ভর ও ওজনের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখ।

৪. কোনো বস্তুর ভর পৃথিবী ও চাঁদে সমান কেন? ব্যাখ্যা করো।

৫. পৃথিবীর মেরু অঞ্চল ও বিষুব অঞ্চলে একই বস্তুর ওজনে পার্থক্য দেখা যায় কেন ?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ওজনের একক কী?

ক. গ্রাম   খ. কিলোগ্রাম

গ. কুইন্টাল   ঘ. নিউটন

২. বস্তুর ভরের ক্ষেত্রে কোন বিবৃতিটি সঠিক?

ক. অবস্থানের পরিবর্তনে বস্তুর ভর পরিবর্তিত হয়   খ. বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলই ভর

গ. বস্তুর মধ্যে পদার্থের মোট পরিমাণই ভর   ঘ. ভরের একক নিউটন

নিচের চিত্র হতে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

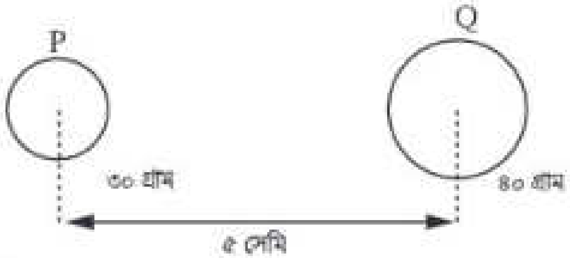

৩. P ও Q এর মধ্যকার আকর্ষণ বল নির্ভর করে–

i. বস্তু দুটির ভরের উপর

ii. মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর

iii. মাধ্যমের প্রকৃতির উপর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. বস্তুদ্বয়ের ভরের গুণফল ৩৬০০ গ্রাম² হলে বলের কী পরিবর্তন হবে?

ক. অর্ধেক হবে খ. দ্বিগুণ হবে

গ. তিনগুণ হবে ঘ. চারগুণ হবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নুহা তাদের বাসায় পাঁচতলার ছাদে উঠে ৫০ গ্রাম ভরের একটি পাথর এবং এক টুকরা কাগজ একই সাথে নিচে ফেলে দিল। মাটিতে দাঁড়ানো নুহার ছোট ভাই লক্ষ করল, পাথরটি কাগজের আগেই মাটিতে পৌঁছায়।

ক. অভিকর্ষ কী?

খ. অভিকর্ষজ ত্বরণ বলতে কী বোঝায়?

গ. পাথরটির ওজন নির্ণয় করো।

ঘ. পাথরটি আগেই মাটিতে পড়ার কারণ বিশ্লেষণ করো।

২. একটি বস্তুর ভর ১২০ কেজি। একটি রকেটে করে একে চাঁদে নিয়ে যাওয়া হলো। এতে দেখা গেল বস্তুটির ভরের কোনো পরিবর্তন না ঘটলেও ওজনের পরিবর্তন ঘটল।

ক. ভর কাকে বলে?

খ. ভর ও ওজনের মধ্যে পার্থক্য কী?

গ. চাঁদে বস্তুটির ওজন কত হবে নির্ণয় করো।

ঘ. চাঁদে বস্তুটির ওজনের কেন পরিবর্তন ঘটল ব্যাখ্যা করো।

অষ্টম অধ্যায়

রাসায়নিক বিক্রিয়া

আমাদের চারপাশে নানা রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে যাচ্ছে। এই সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া কখনো শক্তি উৎপন্ন করে, কখনো ব্যবহার উপযোগী নতুন পদার্থ তৈরি করে আবার কখনো বা রোগ নিরাময়েও সাহায্য করে।

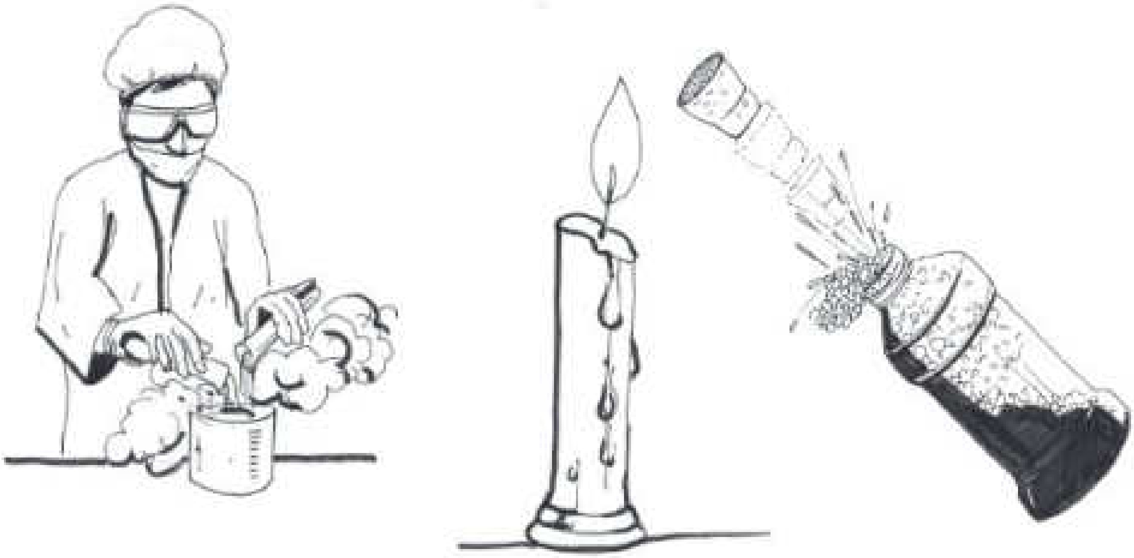

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব;
- রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের শক্তির রূপান্তর ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শুষ্ক কোষের শক্তির রূপান্তর ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তড়িৎ বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পরীক্ষণ কাজে রাসায়নিক পদার্থ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার সঠিকভাবে করতে পারব;
- আমাদের জীবনে রাসায়নিক বিক্রিয়ার অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

পাঠ ১ ও ২ : প্রতীক, সংকেত ও যোজনী

সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা প্রতীক ও সংকেত সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়েছ। রসায়নবিদগণ গঠন অনুসারে পৃথিবীর সকল পদার্থকে মৌলিক ও যৌগিক এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এ পর্যন্ত মোট ১১৮ টি মৌলিক পদার্থের কথা জানা গেছে। সাধারণত মৌলের পুরো নাম না লিখে ইংরেজি বা ল্যাটিন নামের একটি বা দুইটি অক্ষর দিয়ে সংক্ষেপে মৌলটিকে প্রকাশ করা হয়। মৌলের পুরো নামের এ সংক্ষিপ্তরূপকে প্রতীক বলা হয়। যেমন– H (হাইড্রোজেন), O (অক্সিজেন), Ca (ক্যালসিয়াম) ইত্যাদি।

আবার কোনো মৌল বা যৌগের অণুর সংক্ষিপ্তরূপকে সংকেত বলা হয়। যেমন– হাইড্রোজেন অণুর সংকেত H_2, অক্সিজেন অণুর সংকেত O_2, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অণুর সংকেত HCl ইত্যাদি।

যৌগের সংকেত লেখার সময় আমাদেরকে মৌলের যোজনী সংখ্যা সম্পর্কে ভাবতে হবে। মৌলের যোজনীর সংখ্যা অনুযায়ী মৌলগুলো একে অন্যের সাথে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। মৌলিক পদার্থের যোজনীকে আমরা এক একটি হাতের সাথে তুলনা করতে পারি। যে মৌলের একটি হাত তার যোজনী হবে ১। হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন উভয়ই একহাত বিশিষ্ট মৌল। অর্থাৎ উভয়ের যোজনী ১। তাই হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সংকেত হবে HCl। অক্সিজেনের যোজনী ২ অর্থাৎ অক্সিজেনের ১টি পরমাণুর ২টি হাত আছে। এ ২টি হাত দিয়ে অক্সিজেন একযোজী বা ১ হাত বিশিষ্ট ২টি হাইড্রোজেনের পরমাণুকে ধরতে পারে। এ কারণে পানির সংকেত H_2O।

নাইট্রোজেন ও কার্বনের যোজনী যথাক্রমে ৩ এবং ৪। ফলে অ্যামোনিয়ার সংকেত NH_3 এবং মিথেনের সংকেত CH_4। হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, পানি, অ্যামোনিয়া ও মিথেনের অণুকে নিম্নরূপভাবে দেখানো যেতে পারে–

হাইড্রোজেন ক্লোরাইড | পানি | অ্যামোনিয়া | মিথেন

উল্লেখ্য কোনো কোনো মৌলের একাধিক যোজনীও থাকতে পারে। যেমন– সালফার এর যোজনী ২ ও ৪, আয়রন এর যোজনী ২ ও ৩ ইত্যাদি।

অতএব কোনো মৌলের যোজনী হলো ঐ মৌলের একটি পরমাণু কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়, তার সংখ্যা। কোনো যৌগ গঠনের সময় সাধারণভাবে লক্ষ রাখতে হবে যেন মৌলের সবগুলো হাত বা যোজনী কাজে লাগে।

কয়েকটি মৌল ও যৌগমূলকের যোজনী

	যোজনী – ১	যোজনী – ২	যোজনী – ৩	যোজনী – ৪
অধাতু (মৌল)	হাইড্রোজেন (H) ফ্লোরিন (F) ক্লোরিন (Cl) ব্রোমিন (Br) আয়োডিন (I)	অক্সিজেন (O) সালফার (S) কার্বন (C)	নাইট্রোজেন (N) ফসফরাস (P)	কার্বন (C) সালফার (S)
ধাতু (মৌল)	সোডিয়াম (Na) পটাশিয়াম (K) কপার (Cu) (আস) সিলভার (Ag) গোল্ড (Au) (আস)	ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ক্যালসিয়াম (Ca) আয়রন (Fe) (আস) কপার (Cu) (ইক) জিঙ্ক (Zn) টিন (Sn) (আস) লেড (Pb) (আস)	অ্যালুমিনিয়াম (Al) আয়রন (Fe) (ইক) গোল্ড (Au) (ইক)	টিন (Sn) (ইক) লেড (Pb) (ইক)
যৌগমূলক	অ্যামোনিয়াম (NH_4^+) হাইড্রোক্সিল (OH^-) নাইট্রাইট (NO_2^-) নাইট্রেট (NO_3^-) হাইড্রোজেন কার্বনেট (HCO_3^-)	কার্বনেট (CO_3^{2-}) সালফাইট (SO_3^{2-}) সালফেট (SO_4^{2-})	ফসফেট (PO_4^{3-})	

ছকে উল্লেখিত SO_4^{2-}, CO_3^{2-}, NO_3^-, NH_4^+ ইত্যাদি পরমাণুগুচ্ছ স্বাধীনভাবে থাকে না। মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মতো যৌগ গঠনে অংশ নেয়। এ জাতীয় পরমাণুগুচ্ছকে যৌগমূলক বা র‍্যাডিকেল বলে।
যৌগের আণবিক সংকেত লেখার ক্ষেত্রে যে সকল নিয়ম অনুসরণ করা হয় তা নিম্নরূপ :

(১) যৌগে উভয় মৌল বা যৌগমূলকের যোজনী একই হলে সংকেতে যোজনী লেখার প্রয়োজন হয় না। শুধু মৌল কিংবা মূলকগুলো পাশাপাশি লিখলেই চলে। যেমন : CaO (ক্যালসিয়াম অক্সাইড), NH_4Cl (অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড), NH_4NO_3 (অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট) ইত্যাদি।

(২) উভয় মৌলের কিংবা উভয় মূলকের যোজনী কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার গুণিতক হলে ঐ সংখ্যা দিয়ে যোজনীকে ভাগ করে বিনিময় করে লিখতে হয়। যেমন– কার্বন ডাইঅক্সাইড এর ক্ষেত্রে $C_2O_4 \longrightarrow CO_2$, এখানে কার্বন ও অক্সিজেনের যোজনী যথাক্রমে 4 এবং 2।

(৩) উভয় মৌলের কিংবা উভয় মূলকের যোজনী ভিন্ন এবং গুণিতক না হলে, অর্থাৎ A মৌলের যোজনী x এবং B মৌলের যোজনী y হলে A ও B মৌল দ্বারা গঠিত যৌগের সংকেতটি হবে AyBx। A মৌলের যোজনী সংখ্যা B মৌলের ডানপাশে সামান্য নিচে ছোট করে এবং B মৌলের যোজনী সংখ্যা A মৌলের ডানপাশে নিচের দিকে ছোট করে লিখতে হয়। যেমন- অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3)।

পাঠ ৩ ও ৪ : রাসায়নিক সমীকরণ

যেকোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিবরণ দিতে হলে আমাদের রাসায়নিক সমীকরণ সম্বন্ধে ধারণা থাকা অপরিহার্য। একটি রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দুইটি অংশে ভাগ করা যায়। এক অংশে বিক্রিয়ক পদার্থ এবং অন্য অংশে বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন নতুন পদার্থ থাকে। যেমন–

$$\underset{\text{সালফার}}{S} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{O_2} \longrightarrow \underset{\text{সালফার ডাইঅক্সাইড}}{SO_2}$$

বিক্রিয়ক পদার্থ হলো রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটনের পূর্বাবস্থা এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থ হলো রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটনের শেষ বা পরবর্তী অবস্থা। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোনো পরমাণু ধ্বংস বা নতুন করে সৃষ্টি হয় না, পরমাণুর শুধু পুনর্বিন্যাস ঘটে। অতএব বিক্রিয়ার পূর্বে বিভিন্ন বিক্রিয়ক পদার্থে যতগুলো পরমাণু থাকে বিক্রিয়ার পরে বিভিন্ন বিক্রিয়াজাত পদার্থেও ততগুলো পরমাণু থাকে। ফলে বিক্রিয়ক দ্রব্য এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে পরমাণু সংখ্যার সমতা বিরাজ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়কদ্রব্য এবং উৎপন্ন দ্রব্যকে প্রতীক, সংকেত ও কতগুলো চিহ্নের (+, ⟶ বা =) সাহায্যে সংক্ষেপে প্রকাশ করাকে রাসায়নিক সমীকরণ বলে। যেমন:

$$\underset{\text{জিঙ্ক}}{Zn} + \underset{\text{সালফিউরিক এসিড}}{H_2SO_4} \longrightarrow \underset{\text{জিঙ্ক সালফেট}}{ZnSO_4} + \underset{\text{হাইড্রোজেন}}{H_2}$$

রাসায়নিক সমীকরণ লেখার নিয়মগুলো নিম্নরূপ–

(১) রাসায়নিক সমীকরণে বিক্রিয়ক পদার্থ বা পদার্থগুলোর স্ব স্ব প্রতীক বা সংকেত সমীকরণটির তীর চিহ্নের (⟶) বামদিকে লিখতে হয়। বিক্রিয়াজাত পদার্থ বা পদার্থগুলোর স্ব স্ব প্রতীক বা সংকেত সমীকরণটির তীর চিহ্নের (⟶) ডান দিকে লিখতে হয়।

(২) বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থ একাধিক হলে তাদের সংকেতের মধ্যে যোগ চিহ্ন (+) দেওয়া হয়।

(৩) কোনো পদার্থের অণুর সংখ্যা একাধিক হলে অণুর সংকেতের আগে সেই সংখ্যা লেখা হয়।

(৪) বিক্রিয়ক এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলোর মধ্যে তীর চিহ্নের পরিবর্তে সমান চিহ্নও (=) বসানো যায়। তবে এক্ষেত্রে উভয়পক্ষের পরমাণুর সমতাকরণ প্রয়োজন।

(৫) বিক্রিয়ার আগে বিভিন্ন পদার্থের অণুর মধ্যে যত সংখ্যক বিভিন্ন মৌলের পরমাণু থাকে, বিক্রিয়ার পরে গঠিত নতুন অণুগুলোর মধ্যে ঠিক তত সংখ্যক বিভিন্ন মৌলের পরমাণু থাকতে হবে। তাই সমীকরণের উভয় পক্ষে মৌলের পরমাণু সংখ্যার সমতা আনার জন্য প্রতীক ও সংকেতগুলোকে প্রয়োজনীয় সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হয়।

রাসায়নিক সমীকরণের সমতাকরণ

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় পানি উৎপন্ন হয়। সুতরাং সমতা চিহ্নের বামদিকে বসবে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন অণুর সংকেত এবং ডানদিকে বসবে বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন পদার্থ পানির অণুর সংকেত। সুতরাং বিক্রিয়াটিকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়–

$$\underset{\text{হাইড্রোজেন}}{H_2} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{O_2} \longrightarrow \underset{\text{পানি}}{H_2O}$$

কিন্তু বিক্রিয়ার আগে যত সংখ্যক H পরমাণু এবং O পরমাণু থাকে, বিক্রিয়ার পরেও বিক্রিয়াজাত পদার্থে তত সংখ্যক H এবং O পরমাণু থাকা উচিত। তাই বিক্রিয়ার সমতা স্থাপনের জন্য H_2 অণু, O_2 অণু ও H_2O অণুর সংখ্যা এবং সমীকরণ হবে নিম্নরূপ–

$$2H_2 + O_2 = 2H_2O$$

এই সমীকরণ থেকে বিক্রিয়ার পুর্বে এবং বিক্রিয়ার পরে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মোট পরমাণুর সংখ্যা গণনা করা যায়। বোঝার সুবিধার্থে উপরের সমীকরণটিকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হলো–

	$2H_2$	+	$1O_2$	=	$2H_2O_1$
	(2×2)		(1×2)		$2\times(2+1)$
বা,	4	+	2	=	2×3
বা,			6	=	6

সুতরাং উপরের সমীকরণে বিক্রিয়ার আগের পরমাণুর সংখ্যা এবং বিক্রিয়ার পরের পরমাণুর সংখ্যা সমান।

পাঠ ৫ : রাসায়নিক বিক্রিয়া ; সংযোজন (Addition)

কাজ : সংযোজন বিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : টেস্টটিউব, মর্টার, স্পিরিট ল্যাম্প বা বার্নার, লোহার গুঁড়া, সালফার, নিক্তি

পদ্ধতি : টেস্টটিউবটি ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে নাও। ৭ গ্রাম লোহার গুঁড়া ও ৪ গ্রাম সালফার (সমানুপাতিক হারে ভিন্ন পরিমাণও নেওয়া যায়) নিক্তি দিয়ে মেপে মর্টারে নাও ও খুব ভালোভাবে পিষে নাও এবং তারপর শুকনা টেস্টটিউবে ঢেলে দাও। এবার স্পিরিট ল্যাম্প বা বার্নার দিয়ে টেস্টটিউবের তলায় তাপ দিতে থাক। তাপ দেওয়ার সময় খেয়াল রাখ যেন আগুনের শিখা ছোট হয়। তাপ দিতে দিতে টেস্টটিউবের মিশ্রণটি যখন রক্তিমাভার মতো হবে তখন তাপ দেওয়া বন্ধ করো। টেস্টটিউবটি মর্টারের উপরে ধরে রাখ, যেন এটি ভেঙে গেলেও টেস্টটিউবের ভিতরের বস্তু নষ্ট না হয়ে যায়। অতঃপর টেস্টটিউবটি ঠান্ডা করো ও ভেঙে ভিতরের বস্তুটিকে আলাদা করো।

টেস্টটিউব থেকে যে বস্তুটি পেলে তা দেখতে গাঢ় ধূসর বর্ণের। তোমরা এতে হালকা হলুদ রঙের সালফার বা লোহার (আয়রন) গুঁড়া কোনোটিই দেখতে পাচ্ছ না, কারণ এখানে আয়রন ও সালফার একে অপরের সাথে মিলে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নতুন পদার্থ ফেরাস সালফাইড তৈরি করেছে।

$$Fe + S \longrightarrow FeS$$

আয়রন সালফার ফেরাস সালফাইড

এ ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন, যেখানে একের অধিক পদার্থ একত্রিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নতুন একটি রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে, তাকে সংযোজন বিক্রিয়া বলে। একইভাবে জিংক ও সালফারের বিক্রিয়ায় জিংক সালফাইড তৈরির বিক্রিয়াও সংযোজন বিক্রিয়া।

$$Zn + S \longrightarrow ZnS$$

জিংক সালফার জিংক সালফাইড

এখানে উল্লিখিত দুটি বিক্রিয়াকেই মৌল থেকে যৌগ তৈরির সংযোজন বিক্রিয়া দেখানো হয়েছে। তবে দুটি যৌগ যুক্ত হয়েও কিন্তু সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন আরেকটি যৌগ তৈরি হতে পারে। যেমন– অ্যামোনিয়ার সাথে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সংযোজনে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।

$$NH_3 + HCl \longrightarrow NH_4Cl$$

অ্যামোনিয়া + হাইড্রোজেন ক্লোরাইড → অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড

পাঠ ৬ ও ৭ : দহন বিক্রিয়া (Combustion reaction)

কাজ : সালফার ও অক্সিজেনের দহন বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি লম্বা হাতলযুক্ত দহন চামচ, কিছু সালফার, স্পিরিট ল্যাম্প বা বার্নার

পদ্ধতি : তোমরা দহন চামচে কিছু সালফার নাও। স্পিরিট ল্যাম্প বা বার্নার দিয়ে চামচটিতে তাপ দিতে থাক। কী দেখতে পাচ্ছ?

প্রথমে সালফার গলে গেল তারপর নীল আগুনের শিখা দেখতে পাচ্ছ এবং ঝাঁঝালো গন্ধ পেয়েছ। কারণ তাপ দেওয়ার ফলে সালফার বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে দহন বিক্রিয়ার মাধ্যমে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস তৈরি করেছে যার জন্য তোমরা ঝাঁঝালো গন্ধ পেয়েছ।

$$S + O_2 \xrightarrow{\text{তাপ}} SO_2$$

সালফার + অক্সিজেন → সালফার ডাইঅক্সাইড

কাজ : ম্যাগনেসিয়াম ও অক্সিজেনের দহন বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ম্যাগনেসিয়াম রিবন, চিমটা, লাইটার, স্পিরিট ল্যাম্প/ বুনসেন বার্নার

পদ্ধতি : ম্যাগনেসিয়াম রিবনের একটি ছোট টুকরার (৮ সেন্টিমিটার) একমাথা চিমটা দিয়ে ধরো। চোখে নিরাপত্তা চশমা পরে নাও। রিবনের অন্য মাথাটি বুনসেন বার্নারের শিখার উপর ধরো। লাইটার দিয়েও এটি করা যায়। খুব ভালোভাবে লক্ষ করো কী ঘটছে?

রিবনে আগুন ধরে গেল এবং অত্যন্ত প্রজ্বলিত শিখাসহ জ্বলতে লাগল। এর কারণ হলো ম্যাগনেসিয়াম বাতাসের অক্সিজেনে দহন বিক্রিয়ার মাধ্যমে পুড়তে থাকে আর তোমরা প্রজ্বলিত শিখা দেখতে পাও। এভাবে যখন সমস্ত ম্যাগনেসিয়াম পুড়ে শেষ হয়ে যায়, তখন আপনা আপনি শিখা নিভে যায়। শেষে তোমরা ছাই এর মতো কিছু দেখতে পাচ্ছ কি? এটি আসলে ম্যাগনেসিয়াম ও অক্সিজেন পুড়ে তৈরি হওয়া ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড।

$$2Mg + O_2 \longrightarrow 2MgO$$

ম্যাগনেসিয়াম + অক্সিজেন → ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড

২০২৫

কাজ : মোমের দহন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : মোমবাতি, দিয়াশলাই

পদ্ধতি : দিয়াশলাই দিয়ে মোমবাতি জ্বালাও। খুব ভালোভাবে খেয়াল কর কী ঘটছে? সময়ের সাথে সাথে মোমবাতির আকার ছোট হয়ে যাচ্ছে। বলতো এর কারণ কী? মোমবাতি জ্বালানোর ফলে উৎপন্ন তাপে মোম গলে যাচ্ছে। এই গলিত মোমের ছোট একটি অংশ ঠান্ডা হয়ে মোমের গা বেয়ে নিচে পড়ছে কিন্তু বেশিরভাগ অংশই সলতের মধ্য দিয়ে উপরে উঠে উৎপন্ন তাপে বাষ্পীভূত হচ্ছে। এই বাষ্পীভূত মোম দহন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুর অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করছে। এর ফলে তাপ ও আলোকশক্তি উৎপন্ন হচ্ছে।

পাঠ ৮ ও ৯ : প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (Substitution or displacement reaction)

কাজ : লোহা ও তুঁতের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : লোহার গুঁড়া, তুঁতে, পানি, টেস্টটিউব

পদ্ধতি : টেস্টটিউবের চার ভাগের এক ভাগ পানি নাও। কিছু তুঁতে যোগ করে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে তুঁতের দ্রবণ তৈরি করো। এবার তুঁতের নীল দ্রবণে কিছু লোহার গুঁড়া যোগ করে ভালোভাবে ঝাঁকাও। কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ কি? দ্রবণের নীল রং আস্তে আস্তে হালকা সবুজ হয়ে যাচ্ছে আর তামার ছোট ছোট কণা টেস্টটিউবের তলায় জমতে শুরু করেছে। নীল দ্রবণ কেন হালকা সবুজ হলো?

এখানে লোহার গুঁড়া (আয়রন) ও কপার সালফেটের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে। ফলে ফেরাস সালফেট ও কপার তৈরি হয়েছে। উৎপন্ন ফেরাস সালফেটের রং হালকা সবুজ বলেই দ্রবণের রং নীল থেকে হালকা সবুজ হলো।

$$Fe + CuSO_4 \longrightarrow FeSO_4 + Cu$$

আয়রন (লোহা) + কপার সালফেট → ফেরাস সালফেট + কপার

এখানে লোহা, কপার সালফেট থেকে কপারকে সরিয়ে নিজে ঐ স্থান দখল করে ফেরাস সালফেট তৈরি করেছে। এ সকল বিক্রিয়া, যেখানে একটি মৌল কোনো যৌগ থেকে অপর একটি মৌলকে সরিয়ে নিজে ঐ স্থান দখল করে নতুন যৌগ তৈরি করে, তাকে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলে।

তোমরা এখন তুঁতের দ্রবণে জিংক বা দস্তা, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি যোগ করে দেখ কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে।

বিয়োজন বিক্রিয়া (Decomposition reaction)

কাজ : চুনা পাথরের বিয়োজন বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : চুনা পাথর, স্পেচুলা বা চামচ, টেস্টটিউব, নির্গমন নল, বুনসেন বার্নার বা স্পিরিট ল্যাম্প, ক্ল্যাম্প, স্ট্যান্ড, কর্ক ও হাতমোজা

পদ্ধতি : হাতমোজা পরে স্পেচুলা বা চামচ দিয়ে প্রায় ৫ গ্রাম চুনাপাথর টেস্টটিউবে নাও। এবার স্পিরিট ল্যাম্প বা বুনসেন বার্নার দিয়ে তাপ দিতে থাক। খুব ভালোভাবে খেয়াল করো কী ঘটছে।

কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে টেস্টটিউবে নেওয়া চুনাপাথর তাপ দেওয়ার ফলে বিয়োজিত হয়ে বা ভেঙে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও ক্যালসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে।

$$CaCO_3 \xrightarrow{\text{তাপ}} CaO + CO_2$$

ক্যালসিয়াম কার্বোনেট (চুনা পাথর) ক্যালসিয়াম অক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড

গ্যাসটি কার্বন ডাইঅক্সাইড কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে পার। অপর একটি টেস্টটিউবে ১–২ মিলিলিটার স্বচ্ছ চুনের পানি নিয়ে একটি নির্গমন নল প্রথম টেস্টটিউবের সাথে লাগাও। দেখবে চুনের পানি ঘোলা হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্বিতীয় টেস্টটিউবে (নির্গমন নলের মাধ্যমে) যাওয়ার ফলে সেখানে চুনের পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড বিক্রিয়া করে আবার ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তৈরি হওয়ায় চুনের পানি ঘোলা হয়ে যাচ্ছে।

$$CO_2 + Ca(OH)_2 \longrightarrow CaCO_3 + H_2O$$

কার্বন ডাইঅক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড (চুনের পানি) ক্যালসিয়াম কার্বনেট পানি

নিম্নে বিয়োজন বিক্রিয়ার আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো।

কপার কার্বোনেটকে তাপ দিলে তা ভেঙে কপার অক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়।

$$CuCO_3 \xrightarrow{\text{তাপ}} CuO + CO_2$$

কপার কার্বনেট কপার অক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড

চিত্র ৮.১ : বিয়োজন

পক্ষান্তরে পটাশিয়াম ক্লোরেটকে তাপ দিলে এটি বিয়োজিত হয়ে পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

$$2KClO_3 \xrightarrow{\text{তাপ}} 2KCl + 3O_2$$

পটাশিয়াম ক্লোরেট পটাশিয়াম ক্লোরাইড অক্সিজেন

এ সকল বিক্রিয়ার মতো যে সকল বিক্রিয়ায় একটি যৌগ ভেঙে একাধিক মৌল বা যৌগ উৎপন্ন হয় তাদেরকে বিয়োজন বিক্রিয়া বলে।

পাঠ ১০ ও ১১ : রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপশক্তির রূপান্তর

তোমরা মোম জ্বালালে কী ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় তা জেনেছ। এবার বলতো এখানে কোনো ধরনের শক্তির রূপান্তর ঘটছে কি? জ্বলন্ত মোমের কাছাকাছি হাত নিলে হাতে গরম লাগে। আবার অন্ধকারে মোম জ্বালালে আমরা এর আশেপাশে দেখতে পাই। তাহলে একথা বলা যায় যে, মোম জ্বালানোর ফলে তাপশক্তি উৎপন্ন হয় বলেই হাতে গরম লাগে আর আলোক শক্তি উৎপন্ন হয় বলেই অন্ধকারে মোম জ্বালালে আমরা এর আশেপাশের জিনিস দেখতে পাই। মোম একটি রাসায়নিক বস্তু। একে পোড়ালে এতে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি পরিবর্তিত হয়ে তাপশক্তি ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। একইভাবে গ্যাসের চুলায় গ্যাস জ্বালালেও

গ্যাসে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি পরিবর্তিত হয়ে প্রচুর তাপশক্তি ও আলোক শক্তি উৎপন্ন করে। উৎপন্ন তাপশক্তি দিয়েই আমরা রান্নাবান্নার কাজ করি।

তাহলে আমরা দেখলাম যে, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর ঘটে।

কাজ : খাবার সোডা ও লেবুর রসের বিক্রিয়া

প্রয়োজনীয় উপকরণ : খাবার সোডা বা বেকিং সোডা, টেস্টটিউব, লেবুর রস, ড্রপার

পদ্ধতি : টেস্টটিউবে কিছু খাবার সোডা নাও। ড্রপার দিয়ে আস্তে আস্তে লেবুর রস টেস্টটিউবে যোগ করো। কী দেখতে পাচ্ছ? গ্যাসের বুদবুদ উঠছে? হ্যাঁ, প্রচুর গ্যাসের বুদবুদ উঠছে। টেস্টটিউবের তলায় স্পর্শ করে দেখ হাতে ঠান্ডা লাগে কি?

লেবুর রসে থাকে প্রচুর সাইট্রিক এসিড যা বেকিং সোডার সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম সাইট্রেট, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও পানি তৈরি করে। আমরা যে বুদবুদ দেখি তা কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়া আর কিছুই নয়।

বেকিং সোডা + সাইট্রিক এসিড ⟶ সোডিয়াম সাইট্রেট + কার্বন ডাইঅক্সাইড + পানি

টেস্টটিউব স্পর্শ করলে ঠান্ডা লাগার কারণ কী ? কারণ হলো এই বিক্রিয়ায় তাপশক্তি হ্রাস পায়। তা না হলে ঠান্ডা লাগত না।

এখন তোমরা বেকিং সোডার সাথে লেবুর রসের বদলে ভিনেগার বা এসিটিক এসিড যোগ করে দেখ কী ঘটে?

কাজ : চুন ও ভিনেগারের রাসায়নিক বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

উপকরণ : চুন, ভিনেগার, বিকার, হাতমোজা, ড্রপার

পদ্ধতি : হাতমোজা পরে কিছু চুন বিকারে নাও। এবার এতে ড্রপার দিয়ে আস্তে আস্তে ভিনেগার যোগ করো। বিকারটি হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখ। গরম লাগছে? কারণ কী? এখানে চুনের সাথে ভিনেগারের বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম এসিটেট ও পানি তৈরি হচ্ছে আর প্রচুর তাপশক্তিও উৎপন্ন হচ্ছে। উৎপন্ন তাপের কারণেই বিকার স্পর্শ করলে গরম লাগছে।

$$CaO + CH_3COOH \longrightarrow (CH_3COO)_2Ca + H_2O$$

ক্যালসিয়াম অক্সাইড + এসিটিক এসিড ⟶ ক্যালসিয়াম এসিটেট + পানি

এখানে চুন হলো ক্ষারীয় পদার্থ ও এসিটিক এসিড হলো অম্লধর্মী পদার্থ আর উৎপাদিত ক্যালসিয়াম এসিটেট হলো নিরপেক্ষ পদার্থ। এ জাতীয় বিক্রিয়ায়, যেখানে বিপরীতধর্মী পদার্থ একে অপরের সাথে বিক্রিয়া করে নিরপেক্ষ পদার্থ তৈরি করে, তাকে প্রশমন বিক্রিয়া (Neutralization reaction) বলে।

এখন তোমরা চুনে ভিনেগারের বদলে লেবুর রস দিয়ে দেখ কী ধরনের বিক্রিয়া ঘটে?

> **কাজ :** চুনের সাথে পানির বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ
>
> **প্রয়োজনীয় উপকরণ :** চুন, পানি, বিকার, হাতমোজা, স্পেচুলা, ড্রপার
>
> **পদ্ধতি :** ৫ গ্রাম (ভিন্ন পরিমাণও নেওয়া যেতে পারে) চুন বিকারে নাও। ড্রপার দিয়ে ২০ গ্রাম পানি আস্তে আস্তে যোগ কর। হাতমোজা পরে বিকার স্পর্শ করো। পানি যোগ করার পর কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ?

বিকার অনেক বেশি গরম হয়ে যাচ্ছে আর বিকারের মিশ্রণটি পানি ফুটানোর সময় যে রকম টগবগ করে, অনেকটা সেরকম করছে। এখানে চুনে পানি যোগ করার ফলে, চুন ও পানির মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হয়।

$$CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$$

ক্যালসিয়াম অক্সাইড (চুন) পানি ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড

উৎপন্ন $Ca(OH)_2$ স্ল্যাকড লাইম নামেই বেশি পরিচিত। এই বিক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তি উৎপন্ন হয় যার ফলে পানি ফুটতে থাকে। স্ল্যাকড লাইম বা $Ca(OH)_2$ পানিতে খুব অল্প পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। আর পানিতে $Ca(OH)_2$ এর সম্পৃক্ত দ্রবণকেই চুনের পানি বা লাইম ওয়াটার বলা হয়।

উপরের পরীক্ষাতে তোমরা যে সাসপেনসনটি পেলে তা কিছুক্ষণ রেখে দাও। উপরে পরিষ্কার পানির মতো যে অংশটি দেখা যাচ্ছে সেটিই কিন্তু চুনের পানি।

পাঠ ১২–১৪ : শুষ্ক কোষ (Dry cell)

আমরা টর্চ লাইট, বিভিন্ন রকম রিমোট কন্ট্রোলার, নানারকম খেলনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে ব্যাটারি ব্যবহার করি, এগুলোকে ড্রাইসেল বা শুষ্ক কোষ বলে।

তোমরা কি জানো, এই শুষ্ক কোষ কীভাবে তৈরি করা হয় ?

প্রথমে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl), কয়লার গুঁড়া এবং ম্যাংগানিজ ডাইঅক্সাইড (MnO_2) ভালোভাবে মিশিয়ে তাতে অল্প পরিমাণ পানি যোগ করে একটি পেস্ট বা লেই তৈরি করা হয়। এই মিশ্রণটি সিলিন্ডার আকৃতির দস্তার চোঙে নিয়ে তার মধ্যে একটি কার্বন দণ্ড এমনভাবে বসানো হয় যাতে দণ্ডটি দস্তার চোঙকে স্পর্শ না করে। কার্বন দণ্ডের মাথায় একটি ধাতব টুপি পরানো থাকে। শুষ্ক কোষের উপরের অংশ কার্বন দণ্ডটির চারপাশ পিচের আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। দস্তার চোঙটিকে একটি শক্ত কাগজ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। এখানে দস্তার চোঙ ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার বা অ্যানোড হিসেবে কাজ করে আর ধাতব টুপি দিয়ে ঢাকা কার্বন দণ্ডের উপরিভাগ ধনাত্মক তড়িৎদ্বার বা ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে। এখন আমরা দেখে নিই কীভাবে শুষ্ক কোষ কাজ করে।

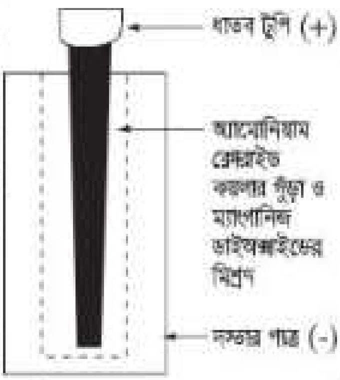

চিত্র ৮.২ : শুষ্ক কোষ

কাজ : শুষ্ক কোষ দিয়ে তড়িৎ বর্তনী তৈরি করে শক্তির রূপান্তর দেখা
প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি বৈদ্যুতিক বাল্ব, ১টি শুষ্ক কোষ, ২টি তামার তার
পদ্ধতি : ১টি তামার তারের এক প্রান্ত শুষ্ক কোষের অ্যানোড ও অপর তামার তারটি ক্যাথোডের সাথে যুক্ত করো। এবার চিত্রের মতো করে বৈদ্যুতিক বাল্বের সাথে তার দুটির সংযোগ দাও। বাল্বটি জ্বলে উঠল। কারণ হলো এখানে তামার তারের মাধ্যমে বাল্ব ও কোষের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক সার্কিট তৈরি হয়েছে।

এখানে কী ধরনের শক্তির রূপান্তর ঘটল? বর্তনী তৈরি হওয়ার ফলে বাল্ব জ্বলছে এবং তা আলোকশক্তি দিচ্ছে। এই আলোক শক্তি হচ্ছে কোষের রাসায়নিক শক্তির একটি রূপ। আর কোষের শক্তির উৎস হলো এখানে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ অর্থাৎ দস্তা, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, কয়লার গুঁড়া ও ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড। তাহলে বলা যায় যে, ঐ সকল রাসায়নিক পদার্থের সঞ্চিত শক্তিই রূপান্তরিত হয়ে আলোক শক্তি উৎপন্ন করছে। অর্থাৎ এখানে রাসায়নিক শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

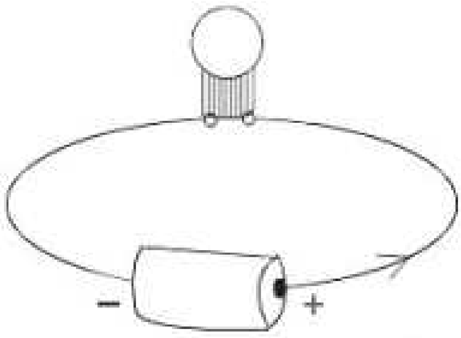

চিত্র ৮.৩ : শুষ্ক কোষের বর্তনী

তড়িৎ বিশ্লেষণ (Electrolysis)

কাজ : তড়িৎ বিশ্লেষণ সম্পর্কে জানা
প্রয়োজনীয় উপকরণ : ব্যাটারি, তামার তার (দুটি), দুটি জিংক দণ্ড (তড়িৎদ্বার), পানি, লবণ, একটি কাচ পাত্র
পদ্ধতি : কাচ পাত্রে ৩০০ মিলিলিটার পানি নিয়ে ৩০ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ যোগ করে ভালোভাবে নাড়া দাও। এবার জিংক দণ্ড দুটি চিত্র অনুযায়ী তামার তার দিয়ে ব্যাটারির সাথে সংযুক্ত করো। জিংক দণ্ডের দিকে ভালো করে লক্ষ করো। উভয় দণ্ডের গায়ে গ্যাসের বুদবুদ দেখতে পাচ্ছ কি?

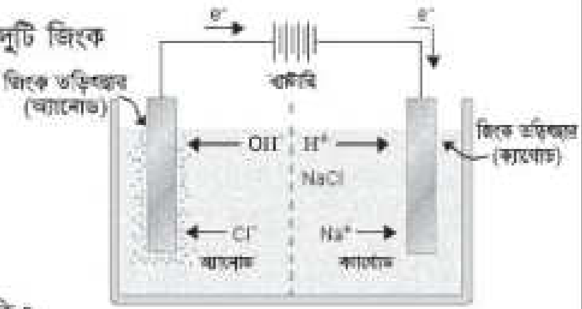

চিত্র ৮.৪ : তড়িৎ বিশ্লেষণ

হ্যাঁ, এর কারণ হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে ধনাত্মক সোডিয়াম আয়ন (Na^+) ও ঋণাত্মক ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) উৎপন্ন হয়।

$$NaCl \rightleftharpoons Na^+ + Cl^-$$

একইভাবে দ্রবণে পানি বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন ও হাইড্রোক্সিল আয়ন উৎপন্ন করে।

$$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$

ব্যাটারির সাথে সংযোগ দিয়ে দ্রবীভূত লবণের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে হাইড্রোক্সিল আয়ন ও ক্লোরাইড আয়ন অ্যানোডের দিকে অগ্রসর হয়। ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) অ্যানোডে গিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ক্লোরিন গ্যাস (Cl_2) উৎপন্ন করে। তাই আমরা অ্যানোডে গ্যাসের বুদবুদ দেখতে পাই। অন্যদিকে সোডিয়াম আয়ন ও হাইড্রোজেন আয়ন ক্যাথোডের দিকে অগ্রসর হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) ক্যাথোডে গিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে হাইড্রোজেন গ্যাস (H_2) উৎপন্ন করে, যার ফলে ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদবুদ দেখা যায় ও দ্রবণে সোডিয়াম আয়ন (Na^+) ও হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) থেকে যায়।

Cl^-	−	e	⟶	Cl
ক্লোরাইড আয়ন		ইলেকট্রন		ক্লোরিন পরমাণু
Cl	+	Cl	⟶	Cl_2
ক্লোরিন পরমাণু		ক্লোরিন পরমাণু		ক্লোরিন গ্যাস
H^+	+	e	⟶	H
হাইড্রোজেন আয়ন		ইলেকট্রন		হাইড্রোজেন পরমাণু
H	+	H	⟶	H_2
হাইড্রোজেন পরমাণু		হাইড্রোজেন পরমাণু		হাইড্রোজেন গ্যাস

সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের ফলে অ্যানোডে ক্লোরিন গ্যাস, ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং দ্রবণে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড থেকে যায়।

যে সমস্ত পদার্থ দ্রবীভূত বা বিগলিত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন করে এবং তড়িৎ প্রবাহের ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে অন্য পদার্থে পরিণত হয়, তাদেরকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য (Electrolyte) বলে। যেমন-লবণ।

সব পদার্থ তড়িৎ প্রবাহের ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না। যে সমস্ত পদার্থ দ্রবীভূত বা বিগলিত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন করে না ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়াও করে না, তাদেরকে তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থ বলে। যেমন– চিনি, গ্লুকোজ ইত্যাদি।

নতুন শব্দ : যোজনী, যৌগমূলক, সংযোজন, দহন, প্রতিস্থাপন, প্রশমন, অ্যানোড, ক্যাথোড, তড়িৎ বিশ্লেষণ, তড়িৎ বিশ্লেষ্য, স্ল্যাক লাইম।

এই অধ্যায় শেষে যা শিখলাম–

- মৌলের যোজনীর সংখ্যা অনুযায়ী মৌলগুলো একে অন্যের সাথে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে।
- রাসায়নিক সমীকরণে পদার্থগুলো সমীকরণটির তীর চিহ্নের বামদিকে এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলো তীর চিহ্নের ডানদিকে হবে।
- সংযোজন বিক্রিয়ায় একের অধিক পদার্থ একত্রিত হয়ে একটি নতুন পদার্থ তৈরি করে।
- দহন বিক্রিয়ায় একটি পদার্থ বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে পুড়ে প্রচুর তাপশক্তি ও আলোকশক্তি উৎপন্ন করে।
- প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় একটি মৌল কোনো যৌগ থেকে অপর একটি মৌলকে প্রতিস্থাপিত করে নতুন পদার্থ তৈরি করে।

- যে বিক্রিয়ায় একটি যৌগ ভেঙে একের অধিক নতুন পদার্থে পরিণত হয় তাকে বিয়োজন বিক্রিয়া বলে।
- প্রশমন বিক্রিয়ায় বিপরীতধর্মী পদার্থ বিক্রিয়া করে একে অপরকে নিষ্ক্রিয় করে নিরপেক্ষ পদার্থ উৎপন্ন করে। দহন বিক্রিয়ায় সাধারণত রাসায়নিক শক্তি তাপ ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
- রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর ঘটে।
- শুষ্ক কোষ ব্যবহার করলে রাসায়নিক শক্তি রূপান্তরিত হয়ে আলোকশক্তি বা অন্য কোনো শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
- যে সমস্ত পদার্থ দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে তাদেরকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ বলে।
- যে সমস্ত পদার্থ দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে না তাদেরকে তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থ বলে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ——————সৃষ্টি হয়।

২. ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তৈরির বিক্রিয়া একটি —————— বিক্রিয়া।

৩. দহন বিক্রিয়ায় ——————শক্তি উৎপন্ন হয়।

৪. শুষ্ক কোষে দস্তার চোঙ —————— হিসেবে কাজ করে।

৫. হাইড্রোক্লোরিক এসিড তড়িৎ —————— পদার্থ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দহন বিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দাও।

২. প্রশমন বিক্রিয়া কী তা ব্যাখ্যা করো।

৩. চুনে পানি যোগ করলে কী ঘটে ব্যাখ্যা করো।

৪. শুষ্ক কোষের গঠন সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করো।

৫. তড়িৎ বিশ্লেষ্য ও তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থের মূল পার্থক্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি স্ল্যাক লাইম?

ক. CaO খ. $CaCO_3$

গ. $CaCl_2$ ঘ. $Ca(OH)_2$

২. একজন ডুবুরি নিচের কোন যৌগটির বিয়োজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন পায়?

ক. $CaCO_3$ খ. $CuCO_3$

গ. $KClO_3$ ঘ. NH_4Cl

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সাহানা ল্যাবরেটরিতে একটি বিকারে কিছু চুন নিল। অতঃপর এর মধ্যে ড্রপার দিয়ে ভিনেগার যোগ করল। কিছুক্ষণ পর সে বিকারটি হাত দিয়ে স্পর্শ করে তাপমাত্রার পরিবর্তন লক্ষ করল।

৩. বিকারে উল্লেখিত যৌগের মধ্যে কোন ধরনের বিক্রিয়া ঘটবে?

ক. দহন
খ. প্রশমন
গ. সংযোজন
ঘ. প্রতিস্থাপন

৪. উদ্দীপকে উল্লেখিত যৌগের মধ্যে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হবে–

i. ক্যালসিয়াম এসিটেট
ii. ক্যালসিয়াম কার্বনেট
iii. পানি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফাহাদ ও ফারহান কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটালো, বিক্রিয়াগুলো নিম্নরূপ :

i. কার্বন + অক্সিজেন $\xrightarrow{\text{তাপ}}$
ii. চুনাপাথর $\xrightarrow{\text{তাপ}}$
iii. হাইড্রোজেন + অক্সিজেন $\longrightarrow$
iv. জিঙ্ক + সালফিউরিক এসিড $\longrightarrow$

ক. খাবার সোডার সংকেত কী?
খ. ii নং বিক্রিয়াটি কী ধরনের বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের যে বিক্রিয়ায় মৌলিক গ্যাস উৎপন্ন হয় সেটি ব্যাখ্যা করো।
ঘ. i ও iii নং বিক্রিয়া দুটি সংযোজন হলেও এদের মধ্যে ভিন্নতা আছে বিশ্লেষণ করো।

২. তামান্না তার পুতুলে ব্যাটারির সংযোগ দিয়ে পুতুল নাচ দেখছিল। এমন সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় ওর ছোট বোন তাহসিনা একটি মোম জ্বালিয়ে আনল।

ক. প্রশমন বিক্রিয়া কী?
খ. লাইম ওয়াটার বলতে কী বোঝায়?
গ. তামান্নার পুতুলে ব্যবহৃত ব্যাটারির গঠন ব্যাখ্যা করো।
ঘ. পুতুল ও মোমবাতিতে শক্তির কী ধরনের রূপান্তর ঘটে? বিশ্লেষণ করো।

প্রজেক্ট : তোমরা নিজেরা ৪–৫ জনের গ্রুপ তৈরি করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অন্তত ৫টি রাসায়নিক বিক্রিয়া খুঁজে বের করো। এ সকল বিক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর ঘটে কিনা চিন্তা করো। শক্তির রূপান্তর ঘটলে কী ধরনের রূপান্তর ঘটে তার উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

নবম অধ্যায়

বর্তনী ও চলবিদ্যুৎ

আমরা জানি, পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেক্ট্রনসমূহ বিন্যস্ত আছে। কিছু কিছু পদার্থের পরমাণুর সর্ববহিস্থ স্তরের ইলেক্ট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের সাথে দুর্বলভাবে যুক্ত থাকে। এ সকল পদার্থে ইলেক্ট্রনসমূহ সহজে চলাচল করতে পারে এবং এদেরকে পরিবাহী বলে। বিদ্যুৎ প্রবাহ হলো মূলত ইলেক্ট্রনের প্রবাহ। পরিবাহী পদার্থের একটি আবদ্ধ পথ, যেখানে ইলেক্ট্রন চলাচল করতে পারে তাই বৈদ্যুতিক বর্তনী। এই বর্তনীতে তড়িৎযন্ত্র এবং তড়িৎ উপকরণসমূহ মূলত দুইভাবে সংযুক্ত করা যায় : শ্রেণি ও সমান্তরাল সংযোগ।

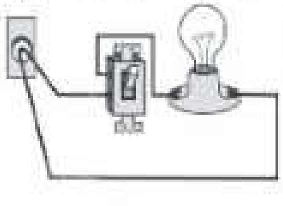
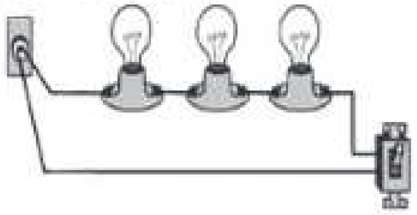
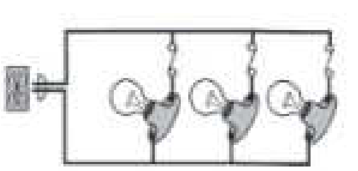

একটি বর্তনীর উপাদানের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের জন্য এর দুই প্রান্তের মধ্যে বৈদ্যুতিক বা তড়িৎ বিভব পার্থক্য তৈরি করতে হয়।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- তড়িৎ বা বৈদ্যুতিক বিভব ও বিভব পার্থক্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তড়িৎ প্রবাহ এবং বিভব পার্থক্যের মধ্যকার সম্পর্ক লেখচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দুই প্রকারের বিদ্যুৎ প্রবাহ- এসি এবং ডিসি প্রবাহের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তড়িৎ বর্তনীতে রোধ, ফিউজ এবং চাবির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শ্রেণি ও সমান্তরাল বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ এবং বিভব পার্থক্যের ভিন্নতা প্রদর্শন করতে পারব;
- তড়িৎ প্রবাহ এবং বিভব পার্থক্য পরিমাপে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সঠিক ব্যবহার করতে পারব;
- তড়িতের কার্যকর ব্যবহার এবং অপচয় রোধে নিজে সচেতন হব এবং অন্যদের সচেতন করব।

পাঠ ১ : তড়িৎ বিভব এবং তড়িৎ প্রবাহ

আধুনিক ইলেকট্রন তত্ত্ব থেকে আমরা জানি প্রত্যেক ধাতব পদার্থে কিছু কিছু মুক্ত ইলেক্ট্রন থাকে, যারা ঐ পদার্থের মধ্যে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে। যখন দুটি ভিন্ন ধাতব বস্তুকে তার দ্বারা সংযুক্ত করা হয় তখন একটি ধাতব বস্তু থেকে ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেক্ট্রন অন্য ধাতব বস্তুর দিকে প্রবাহিত হবে কি না, তা নির্ভর করে ধাতব বস্তু দুইটির একটি বৈদ্যুতিক অবস্থা বা বৈশিষ্ট্যের উপর, যাকে আমরা বৈদ্যুতিক বিভব বলি।

ইলেক্ট্রনের এই প্রবাহের জন্য দুইটি ধাতব বস্তুর মধ্যে বিভবের পার্থক্য থাকা আবশ্যক। যতক্ষণ পর্যন্ত ধাতব বস্তু দুইটির মধ্যে বিভবের পার্থক্য বর্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইলেক্ট্রনের এই প্রবাহ চলে। আধানের প্রবাহকে আমরা বলি তড়িৎ প্রবাহ। ধাতুতে ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেক্ট্রনের প্রবাহর জন্যই তড়িৎ প্রবাহিত হয়।

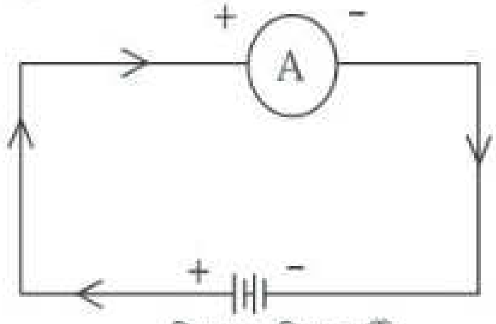

চিত্র ৯.১ : বিদ্যুৎ বর্তনী

তড়িৎ প্রবাহ

কোনো পরিবাহীর যেকোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে একক সময়ে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় তাই হলো তড়িৎ প্রবাহ।

প্রচলিত তড়িৎ প্রবাহের দিক ইলেক্ট্রনের প্রবাহের বিপরীত দিকে হয়।

তড়িৎ প্রবাহের একক : তড়িৎ প্রবাহের একক হলো অ্যাম্পিয়ার। একে সাধারণত A দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

তড়িৎ বিভব

অসীম দূরত্ব থেকে একটি একক ধনাত্মক আধান বা চার্জকে সমবেগে গতিশীল করে কোনো আধানযুক্ত বা চার্জিত বস্তুর পাশে কোনো বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ কাজ করা হয় তাকে ঐ বিন্দুর তড়িৎ বিভব বলে।

তড়িৎ বিভব পার্থক্য

প্রতি একক ধনাত্মক আধানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে সমবেগে স্থানান্তর করতে সম্পন্ন কাজের পরিমাণ হলো ঐ বিন্দু দু'টির তড়িৎ বিভব পার্থক্য। দু'টি বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য না থাকলে তড়িৎ প্রবাহিত হতে কোনো কাজও সম্পন্ন হবে না।

পাঠ ২ ও ৩ : তড়িৎ প্রবাহের প্রকারভেদ

তড়িৎ প্রবাহ প্রধানত দুই প্রকার– (ক) একমুখী প্রবাহ বা সমপ্রবাহ (খ) পরিবর্তী প্রবাহ।

(ক) একমুখী বা ডিসি প্রবাহ

যখন সময়ের সাথে সাধারণত তড়িৎ প্রবাহের দিকের কোনো পরিবর্তন ঘটে না, অর্থাৎ যে তড়িৎ প্রবাহ সকসময় একই দিকে প্রবাহিত হয়, সেই প্রবাহকে একমুখী প্রবাহ বলে। তড়িৎ কোষ বা ব্যাটারি থেকে একমুখী প্রবাহ পাওয়া যায় (চিত্র ৯.২)। আবার ডিসি জেনারেটরের সাহায্যেও এই প্রকার তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন করা যায়।

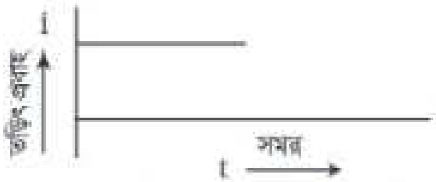

চিত্র ৯.২ : একমুখী প্রবাহ

(খ) পরিবর্তী বা এসি প্রবাহ

যদি সময়ের সাথে তড়িৎ প্রবাহের দিক বারবার পরিবর্তিত হয়, সেই তড়িৎ প্রবাহকে পরিবর্তী প্রবাহ বলে যদি দিক পরিবর্তনের মধ্যবর্তী সময় স্থির থাকে তবে এটিকে পর্যাবৃত্ত পরিবর্তী প্রবাহ বা সাধারনভাবে পর্যাবৃত্ত প্রবাহ বলে। বর্তমান বিশ্বের সকল দেশের তড়িৎ প্রবাহই পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ। এর কারণ তুলনামূলকভাবে এটি উৎপন্ন ও সরবরাহ করা সহজ এবং সাশ্রয়ী। পর্যায়বৃত্ত প্রবাহের উৎস জেনারেটর বা ডায়নামো। দেশের বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে জেনারেটরের সাহায্যে পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ উৎপন্ন করা হয়। পর্যায়বৃত্ত পরিবর্তী প্রবাহের দিক পরিবর্তনের হার দেশভেদে বিভিন্ন হয়। যেমন– বাংলাদেশে পর্যায়বৃত্ত পরিবর্তী প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে পঞ্চাশবার এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি সেকেন্ডে ষাটবার দিক পরিবর্তন করে।

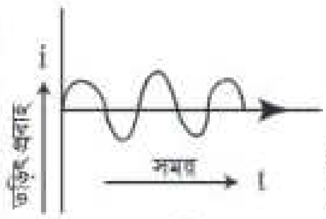

চিত্র ৯.৩ : পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ

২০১৫

পাঠ ৪ ও ৫ : রোধ

আমরা জানি, বিদ্যুৎ প্রবাহ তৈরি হয় ইলেকট্রনের প্রবাহের জন্য। কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য থাকলে এই প্রবাহ শুরু হয়। এক্ষেত্রে ইলেকট্রন নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে প্রবাহিত হয়। এই ইলেকট্রন স্রোত পরিবাহীর মধ্য দিয়ে চলার সময় পরিবাহীর অভ্যন্তরস্থ অণু-পরমাণুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে এর গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বিদ্যুৎ প্রবাহও বিঘ্নিত হয়। পরিবাহীর এই বাধাদানের ধর্ম হলো রোধ। মূলত পরিবাহীর যে ধর্মের জন্য এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়, তাই হলো রোধ।

ও'মের সূত্র

কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হবে কিনা তা নির্ভর করছে ঐ পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের উপর। এছাড়াও পরিবাহীর আকৃতি ও উপাদান এমনকি পরিবাহীর তাপমাত্রার উপরও এর তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা নির্ভর করে। তাপমাত্রা যদি স্থির রাখা যায় তবে নির্দিষ্ট পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ শুধুমাত্র এর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ও এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের অনুপাত থেকে ঐ তাপমাত্রায় ঐ পরিবাহীর রোধ পরিমাপ করা হয়। অনেক পরিবাহীর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট আকৃতির একটি পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ এর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সাথে একটি নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়মটির জন্য জর্জ সাইমন ও'ম (১৭৮৩-১৮৫৪) একটি সূত্র প্রণয়ন করেন, যা ও'মের সূত্র নামে পরিচিত। যে ধরনের পরিবাহী ও'মের সূত্র মেনে চলে তাদের ও'মীয় পরিবাহী (Ohmic Conductor) বলে।

ও'মের সূত্র : তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের মান পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের মানের সমানুপাতিক।

ও'মের সূত্র থেকে এটা সহজেই বলা যায় যে, পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য বেশি থাকলে তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা বেশি হবে। আবার এই বিভব পার্থক্য কম থাকলে তড়িৎ প্রবাহ কম হবে (চিত্র ৯.৪)।

কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য V, এর রোধ R এবং তড়িৎ প্রবাহ I হলে $I \propto V$ এবং

চিত্র ৯.৪ : ও'মের সূত্রের লেখচিত্র

তড়িৎ প্রবাহ, $I = \dfrac{V}{R}$

সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ পরিবাহীর নিজস্ব রোধের ব্যস্তানুপাতিক।

রোধের একক

রোধের এস আই একক হলো ও'ম। কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ১ ভোল্ট এবং এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ ১ অ্যাম্পিয়ার হলে, ঐ পরিবাহীর রোধ হবে ১ ও'ম।

পাঠ ৬–৮ : তড়িৎ বর্তনী

মানুষের চলার জন্য যেমন পথের প্রয়োজন, তড়িৎ প্রবাহের জন্যও প্রয়োজন নির্দিষ্ট পথ। তড়িৎ প্রবাহ চলার এই সম্পূর্ণ বা আবদ্ধ পথকেই তড়িৎ বর্তনী বলে। যখন তড়িৎ উৎসের দুই প্রান্তকে এক বা একাধিক রোধ, তড়িৎ যন্ত্র বা উপকরণের সাথে যুক্ত করা হয়, তখন একটি তড়িৎ বর্তনী তৈরি হয়। একটি চাবি বা সুইচের সাহায্যে বর্তনী বন্ধ করা বা খোলা যায়। চাবি বন্ধ থাকলে বর্তনী সম্পূর্ণ হবে এবং তড়িৎ প্রবাহিত হবে, চাবি খোলা থাকলে বর্তনী সম্পূর্ণ হবে না এবং তড়িৎ প্রবাহিত হবে না।

সাধারণত বর্তনীতে তড়িৎযন্ত্র ও উপকরণসমূহ দু'ভাবে সংযুক্ত করা হয়। এগুলো হলো :

(ক) শ্রেণিসংযোগ বর্তনী (খ) সমান্তরাল সংযোগ বর্তনী

(ক) শ্রেণি সংযোগ বর্তনী

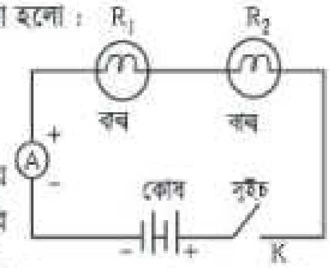

চিত্র ৯.৫ : শ্রেণিসংযোগ বর্তনী

কোনো বর্তনীতে যদি রোধ, তড়িৎযন্ত্র বা উপকরণসমূহ এমনভাবে সংযুক্ত হয় যেন প্রথমটির এক প্রান্তের সাথে দ্বিতীয়টির অন্য প্রান্ত, দ্বিতীয়টির অপর প্রান্তের সাথে তৃতীয়টির এক প্রান্ত এবং এরূপে সব কয়টি পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে, তবে সেই সংযোগকে অনুক্রম বা শ্রেণিসংযোগ বলে।

চিত্রে রোধ R_1, R_2, অ্যামিটার A এবং চাবি K-কে অনুক্রমে সংযুক্ত করা হয়েছে। তড়িৎ প্রবাহ পরিমাপের জন্য অ্যামিটার ব্যবহৃত হয় এবং একে বর্তনীতে অন্যান্য উপকরণের সাথে অনুক্রমে যুক্ত করা হয়। অ্যামিটারের প্রান্তদ্বয়ে + এবং – চিহ্ন থাকলে + চিহ্নিত প্রান্তকে অবশ্যই কোষের ধনাত্মক প্রান্তের সাথে অর্থাৎ যে প্রান্ত থেকে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় তার বিপরীত প্রান্তের সাথে যুক্ত করতে হবে। এ সংযোগের ক্ষেত্রে বর্তনী সকল অংশে সর্বদা একই পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ হয়। কিন্তু বিভিন্ন অংশে বিভব পার্থক্য ভিন্ন হতে পারে।

(খ) সমান্তরাল সংযোগ বর্তনী

কোনো বর্তনীতে দুই বা ততোধিক রোধ, তড়িৎ উপকরণ বা যন্ত্র যদি এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে সব কয়টির এক প্রান্ত একটি সাধারণ বিন্দুতে এবং অপর প্রান্তগুলো অপর একটি সাধারণ বিন্দুতে সংযুক্ত হয়, তবে সেই সংযোগকে সমান্তরাল সংযোগ বলে। সমান্তরাল সংযোগে প্রত্যেকটির মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন তড়িৎ প্রবাহ চলে কিন্তু প্রত্যেকটির দুই সাধারণ বিন্দুর বিভব পার্থক্য একই থাকে।

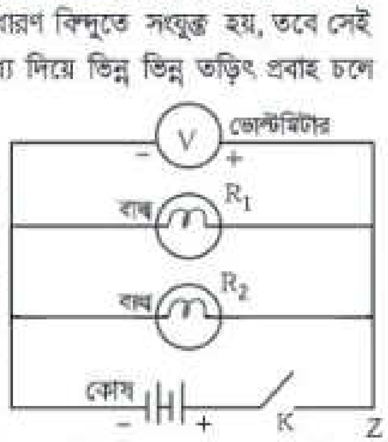

চিত্র ৯.৬ : সমান্তরাল বর্তনী

চিত্রে রোধ R_1 ও R_2, এবং ভোল্টমিটার V পরস্পরের সাথে সমান্তরালভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। কোনো রোধকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য পরিমাপের জন্য ভোল্টমিটার ব্যবহৃত হয় এবং এ কারণে একে রোধকের দুই প্রান্তের সাথে সমান্তরালে যুক্ত করতে হয়। ভোল্টমিটারে + প্রান্তকেও অবশ্যই কোষের ধনাত্মক প্রান্ত বা ধনাত্মক বিভবের অংশের সাথে যুক্ত করতে হয়, অন্যথায় যন্ত্রটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কোনো একটি বর্তনীতে যদি দুটি বাল্ব সংযোগ করা হয়, তাহলে কি বাল্ব দুটি একইভাবে জ্বলবে ?

সিরিজ সংযোগে একই তড়িৎ প্রবাহ দুটি বাল্বের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। একটি বাল্ব যত উজ্জ্বলভাবে জ্বলত, দুটি বাল্ব সিরিজ সংযোজনের ফলে তার চেয়ে কম উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে। আবার কোনো একটি বাল্ব যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সমস্ত বর্তনীর মধ্য দিয়েই তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে অপর বাল্বটিও জ্বলবে না।

সমান্তরাল সংযোগের প্রত্যেকটি বাল্বের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। তাই একটি বাল্ব নষ্ট হলেও অন্যটি জ্বলবে। প্রতিটি বাল্বই পৃথক পৃথকভাবে জ্বালানো বা নেভানো যাবে। প্রতিটি বাল্বের প্রান্তদ্বয়ের বিভব পার্থক্য একই থাকবে। অর্থাৎ প্রতিটি বাল্বই তড়িৎ কোষের পূর্ণ বিদ্যুৎ চালক শক্তি পাবে। ফলে দুটি বাল্বই উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে। বাল্ব দুটি যদি এক এক করে তড়িৎ কোষের সাথে সংযুক্ত করা হতো তখন যত উজ্জ্বলভাবে জ্বলতো, বাল্ব দুটি সমান্তরালভাবে সংযুক্ত করলেও একই উজ্জ্বলতা থাকবে। গৃহে বিদ্যুতায়নের জন্য সমান্তরাল বর্তনীই সুবিধাজনক।

কাজ : বড় সাদা কাগজে শ্রেণিসংযোগ ও সমান্তরাল বর্তনীর চিত্র অংকন করে বিদ্যুৎ প্রবাহ চিহ্নিত করো।

পাঠ ৯ ও ১০ : অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার

অ্যামিটার

অ্যামিটার একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র। এর সাহায্যে বর্তনীর তড়িৎ প্রবাহ সরাসরি অ্যাম্পিয়ার এককে পরিমাপ করা যায়। অ্যামিটার বর্তনীর সাথে শ্রেণি সংযোগে যুক্ত থাকে। এই যন্ত্রে মূলত একটি গ্যালভানোমিটার থাকে। গ্যালভানোমিটার হচ্ছে সেই যন্ত্র যার সাহায্যে বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহের অস্তিত্ব ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। গ্যালভানোমিটার সম্পর্কে তোমরা পরে বিস্তারিত জানবে।

এই গ্যালভানোমিটারে বিক্ষেপ নির্ণয়ের জন্য একটি সূচক বা কাঁটা লাগানো থাকে। সূচকটি অ্যাম্পিয়ার, মিলিঅ্যাম্পিয়ার বা মাইক্রোঅ্যাম্পিয়ার এককে দাগকাটা একটি স্কেলের উপর ঘুরতে পারে। বিদ্যুৎ কোষের মতো অ্যামিটারেও দুটি সংযোগ প্রান্ত থাকে, একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক প্রান্ত। সাধারণত ধনাত্মক প্রান্ত লাল এবং ঋণাত্মক প্রান্ত কালো রঙের হয়। বর্তনীতে অ্যামিটারকে +—(A)—− চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

চিত্র ৯.৭ : অ্যামিটার

ভোল্টমিটার

যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর যেকোনো দুই বিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্য সরাসরি ভোল্ট এককে পরিমাপ করা যায়, তাকে ভোল্টমিটার বলে। বর্তনীর যে দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য পরিমাপ করতে হবে, ভোল্টমিটারকে সেই দুই বিন্দুর সাথে সমান্তরালে সংযুক্ত করতে হয়।

ভোল্টমিটারে মূলতঃ এই যন্ত্রে একটি গ্যালভানোমিটার থাকে। এর বিক্ষেপ নির্ণয়ের জন্য একটি সূচক বা কাঁটা লাগানো থাকে। সূচকটি ভোল্ট এককে দাগাঙ্কিত একটি স্কেলের উপর ঘুরতে পারে। বর্তনীর যে দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য পরিমাপ করতে হয় ভোল্টমিটারটিকে সেই দুই বিন্দুর সাথে সমান্তরালে সংযুক্ত করতে হয়। তড়িৎ কোষ বা অ্যামিটারের মতো ভোল্টমিটারেও দুটি সংযোগ প্রান্ত থাকে, একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক প্রান্ত। সাধারণত ধনাত্মক প্রান্ত লাল এবং ঋণাত্মক প্রান্ত কালো রঙের হয়। বর্তনীতে ভোল্টমিটারকে —+(V)−— চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

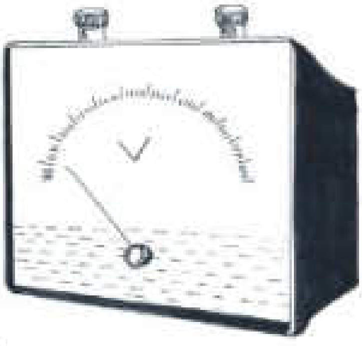

চিত্র ৯.৮ : ভোল্টমিটার

পাঠ ১১ : ফিউজ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেসব তড়িৎ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি, সেগুলোর মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি তড়িৎ প্রবাহিত হলে তা নষ্ট হয়ে যায়। বাড়ির তড়িৎ বর্তনীতে কোনো কারণে অতিরিক্ত তড়িৎ প্রবাহিত হলে অনেক সময় তার থেকে বাড়িতে আগুন পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। এ ধরনের বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য বর্তনীতে এক ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই বিশেষ ব্যবস্থা হলো ফিউজ তার। ফিউজ সাধারণত টিন ও সীসার একটি সংকর ধাতুর তৈরি ছোট সরু তার। এটি একটি চিনামাটির কাঠামোর উপর দিয়ে আটকানো থাকে। তারটি সরু এবং এর গলনাঙ্ক কম। এর মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার অতিরিক্ত তড়িৎ প্রবাহিত হলে এটি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে গলে যায়। ফলে তড়িৎ বর্তনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এভাবে তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে ফিউজ যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করে। বর্তনীতে ফিউজ সিরিজ সংযোগ করতে হয়।

ফিউজ তারের মান বিভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত আমরা ৫ অ্যাম্পিয়ার, ১৫ অ্যাম্পিয়ার, ৩০ অ্যাম্পিয়ার এবং ৬০ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ তার ব্যবহার করে থাকি। ১০ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ তার মানে এর মধ্য দিয়ে ১০ অ্যাম্পিয়ারের বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে এটি গলে যাবে। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির জন্য বিভিন্ন মানের ফিউজ ব্যবহার করতে হয়। বাতি, পাখা, টিভি ইত্যাদির জন্য ৫ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ এবং ইলেকট্রিক কেটলি বা ইস্ত্রির জন্য ১৫ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ ব্যবহার করতে হয়। বাড়ির মেইন ফিউজ ৩০ বা ৬০ অ্যাম্পিয়ারের হয়ে থাকে।

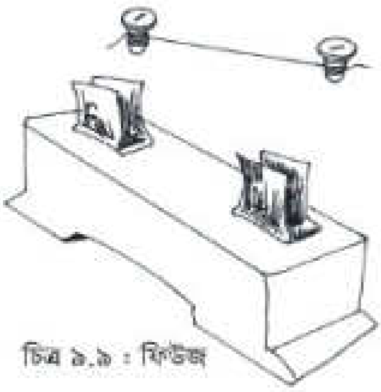

চিত্র ৯.৯ : ফিউজ

ব্যাপারটা আর একটু বোঝার চেষ্টা করো। টেলিভিশন ৫ অ্যাম্পিয়ারের বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য পুড়ে যায়। এখন যদি টেলিভিশনের সাথে ৩০ অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ লাগাও তাহলে কী হবে? এ ফিউজ কোনো কাজে আসবে না। ইলেকট্রিক কেটলির সাথে ৫ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ লাগালে কী হবে? সুইচ অন করলেই ফিউজটি গলে যাবে। কারণ ইলেকট্রিক কেটলিতে ৫ অ্যাম্পিয়ারের বেশি বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। যেখানে যা প্রয়োজন,

সেখানে তেমন মানের ফিউজ ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মানের ফিউজ ব্যবহার করলে কোনো কাজ দিবে না, অর্থাৎ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে না। আবার কম মানের ফিউজ ব্যবহার করলে বারবার ফিউজ তার পুড়ে যেয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করবে। কেউ কেউ আবার বাড়িতে ফিউজ পুড়ে গেলে তার লাগাবার সময় দুই তিনটি তার একত্র করে লাগান। এ রকম কখনো করা উচিত নয়। কারণ, এতে ফিউজের মান বেড়ে যায়। দুইটি ১০ অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ তার একত্র করলে ২০ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ হয়ে যাবে।

পাঠ ১২ : বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার ও অপচয় রোধে সচেতনতা

আমাদের দেশে দিন দিন বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েই চলছে। চাহিদার সাথে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেও চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তার মধ্যে বাড়তি যোগ হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তন। যার প্রভাব পড়ছে বিদ্যুতের চাহিদার উপর। বাড়ছে অফিস, বাসা, শপিং কমপ্লেক্সে বিদ্যুৎ ব্যবহার। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বড় বড় বিল্ডিং করার সাথে বাড়ছে লিফটের চাহিদা। বাড়ছে নির্মাণ কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করার প্রবণতা। এই সমস্যা থেকে বের হয়ে আসার জন্য সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়ে নানাবিধ উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব। বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার করে এর অপচয় রোধে সকলকে সমভাবে এগিয়ে আসতে হবে। বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার ও অপচয় রোধে আমরা নিচের কাজগুলো করতে পারি:

- বাসায় বা অফিসে প্রয়োজন ব্যতীত লাইট ফ্যান বা এয়ারকুলার বন্ধ রাখার ব্যাপারে সচেতন থাকা।
- সাধারণ বাল্বের পরিবর্তে ফ্লোরোসেন্স বা এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করতে হবে, এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়।
- রান্নার কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার পরিহার করতে হবে। প্রেসার কুকারে রান্না করলে ২৫% বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়।
- অপ্রয়োজনে এয়ারকুলারের ব্যবহার না করা নিশ্চিত করতে হবে।
- ফ্রিজ কেনার সময় প্রয়োজনীয় সাইজের কেনা উচিত। প্রয়োজনের চেয়ে বড় সাইজের ফ্রিজে বেশি বিদ্যুৎ লাগে।
- বড় বড় ফ্যাক্টরিগুলোতে নিজেদের জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করা।
- সোলার বিদ্যুৎ ব্যবহারে স্ব-উদ্যোগী হওয়া।

নতুন শব্দ

তড়িৎ প্রবাহ, তড়িৎ বিভব, রোধ, একমুখী প্রবাহ, পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ, তড়িৎ বর্তনী, অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ফিউজ।

এই অধ্যায় শেষে যা শিখলাম–

- দুটি ভিন্ন বিভবের ধাতব বস্তুকে সংযুক্ত করলে এদের যে বৈদ্যুতিক অবস্থা এদের মধ্যে চার্জ আদান প্রদানের দিক নির্ণয় করে, তাই হলো বৈদ্যুতিক বিভব।
- যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি ধাতব বস্তুর মধ্যে বিভব পার্থক্য বর্তমান থাকে, তড়িৎ প্রবাহ ততক্ষণ পর্যন্ত চলে।
- কোনোভাবে যদি ধাতব বস্তুদ্বয়ের মধ্যবর্তী বিভব পার্থক্য বজায় রাখা যায়, তখন তড়িৎ প্রবাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে।
- পরিবাহীর যে ধর্মের জন্য এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ চলাচল বাধাগ্রস্ত হয় তাই হলো রোধ।

১৭

- তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের মান পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের মানের সমানুপাতিক।
- যখন তড়িৎ প্রবাহ সবসময় একই দিকে প্রবাহিত হয়, সেই প্রবাহকে একমুখী প্রবাহ বলে।
- যখন নির্দিষ্ট সময় পর পর তড়িৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয়, সেই তড়িৎ প্রবাহকে পর্যায়বৃত্ত পরিবাহী প্রবাহ বলে।
- বর্তনীতে তড়িৎযন্ত্র ও উপকরণসমূহ দু'ভাবে সংযুক্ত করা হয়। এগুলো হলো শ্রেণিসংযোগ বর্তনী ও সমান্তরাল সংযোগ বর্তনী।
- অ্যামিটারের সাহায্যে বর্তনীর তড়িৎ প্রবাহ সরাসরি অ্যাম্পিয়ার এককে পরিমাপ করা যায়।
- যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর যেকোনো দুই বিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্য সরাসরি ভোল্ট এককে পরিমাপ করা যায় তাই ভোল্টমিটার।
- ফিউজ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য বর্তনীতে এক ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা।
- বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার করে এর অপচয় রোধে সকলকে সমভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. দুটি ধাতব বস্তুর মধ্যে ———— থাকলে তড়িৎ ———— হয়।

২. পরিবাহীর দুই প্রান্তের ———— কম থাকলে ———— মাত্রা কম হয়।

৩. ইলেকট্রনিক কেটলির সাথে ———— ফিউজ লাগালে এটি ———— যাবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ও'মের সূত্রের ব্যাখ্যা দাও।

২. কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ প্রবাহের সাথে এর রোধের সম্পর্ক কেমন ?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বিদ্যুৎ প্রবাহের একক কী?

ক. কুলম্ব খ. অ্যাম্পিয়ার

গ. ভোল্ট ঘ. ও'ম

২. পর্যায়বৃত্ত প্রবাহের উৎস কোনটি?

ক. ব্যাটারি খ. ডিসি জেনারেটর

গ. জেনারেটর ঘ. বিদ্যুৎকোষ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

হুমায়রা পড়ার ঘরে ২টি বাল্ব ও ১টি ফ্যানের সংযোগ দেওয়া আছে। অন্যদিকে তাদের খাবার ঘরে ২টি টিউবলাইট, ১টি ফ্যান ও ১টি ইলেকট্রিক কেটলির সংযোগ দেওয়া আছে।

৩. হুমায়রার পড়ার ঘরে কত অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ ব্যবহার করতে হবে?

ক. ৫ খ. ১০

গ. ১৫ ঘ. ৩০

৪. হুমায়রাদের খাবার ঘরে ৫ অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ ব্যবহার করলে–

i. বিদ্যুৎ খরচ কম হবে

ii. প্রায়ই বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটবে

iii. সুইচ অন করা মাত্র গলে যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. হক সাহেব তার অফিসকক্ষে ৬০ ওয়াটের দুটি বাল্ব শ্রেণিতে সংযুক্ত করলেন। কিন্তু ১টি ফ্যান ও ১টি টেলিভিশন সমান্তরালে সংযুক্ত করেন।

ক. বিদ্যুৎ প্রবাহ কাকে বলে?

খ. ৫ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ বলতে কী বোঝায়?

গ. হক সাহেবের ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলোর সাহায্যে একটি সমান্তরাল বর্তনী আঁক।

ঘ. বর্তনী দুটির মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক তুলনামূলক আলোচনা করে মতামত দাও।

২. কাফি সাহেবের বাসার বৈদ্যুতিক বর্তনীতে ইদানীং প্রায়ই ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যেমন– সুইচ অন করার সময় শক লাগা, বাল্ব ফিউজ হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি। এমতাবস্থায় ইলেকট্রিশিয়ান ডাকা হলে তিনি দুটি যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ ও ভোল্টেজ পরীক্ষা করে কিছু ত্রুটি লক্ষ করলেন। তিনি বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহারে পরিবারের সদস্যদের আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিলেন।

ক. রোধ কাকে বলে?

খ. ১০ কিলোওহম বলতে কী বোঝায়?

গ. যন্ত্র দুটির সংযোগ প্রক্রিয়া চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

ঘ. বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহারে কাফি সাহেবের পরিবার সচেতন হলে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে এর কীরূপ প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো।

দশম অধ্যায়

অম্ল, ক্ষারক ও লবণ

লেবুর রস, ভিনেগার, চুন, এন্টাসিড ঔষধ, খাবার লবণ এগুলো আমাদের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী। এদের মধ্যে কোনোটি অম্ল বা এসিড, কোনোটি ক্ষারক আবার কোনোটি হয়তো লবণ। এদের রাসায়নিক ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন। ধর্ম অনুযায়ী এদের একেকটি একেক কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

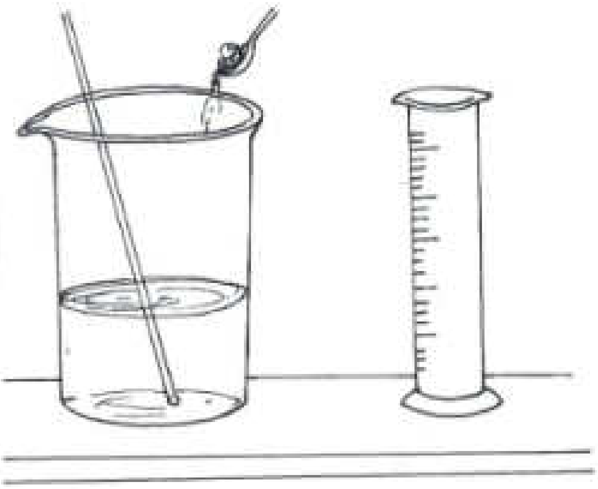

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- অম্ল ও ক্ষারকের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ক্ষারের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- লবণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নিরপেক্ষ পদার্থ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পরীক্ষণ কার্যক্রমে যন্ত্রপাতির ব্যবহার সঠিকভাবে করতে পারব;
- আমাদের জীবনে অম্ল, ক্ষার ও লবণের অবদান উপলব্ধি করতে পারব;
- পরীক্ষণ কার্যক্রম চলাকালীন প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণে দলীয় সদস্যদের সচেতন করতে পারব।

পাঠ ১–৪ : অম্ল, ক্ষারক ও নির্দেশক

> কাজ : অম্ল কী তা জানা
>
> প্রয়োজনীয় উপকরণ : লেবুর রস, লিটমাস পেপার, বিকার, চিমটা
>
> পদ্ধতি : টেস্টটিউবে ২–৩ মিলিলিটার লেবুর রস নাও। প্রথমে চিমটা দিয়ে লাল লিটমাস কাগজ বিকারে নেওয়া লেবুর রসে ডুবাও। কাগজের রং কি পরিবর্তন হলো ? না, হলো না। এবার নীল লিটমাস কাগজ লেবুর রসে ডুবাও। এখন কি লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন হলো ? হ্যাঁ, লিটমাস কাগজের রং নীল থেকে লাল হয়ে গেল।

তোমরা কি জানো এর কারণ কী? লিটমাস কাগজ তৈরি করা হয় লাইকেন (Lichens) নামক এক ধরনের গাছ থেকে প্রাপ্ত রঙের সাহায্যে। এভাবে প্রাপ্ত লিটমাস কাগজ দেখতে লালবর্ণের হয়। এ লালবর্ণের লিটমাস কাগজকে যেকোনো ক্ষারীয় দ্রবণে ডুবালে তা নীলবর্ণ ধারণ করে। অন্যদিকে নীলবর্ণের লিটমাস কাগজে কোনো এসিড যোগ করলে তা লাল বর্ণের লিটমাস কাগজে পরিণত হয়।

লেবুর রসে থাকে সাইট্রিক এসিড। এতে যখন লাল লিটমাস ডুবানো হয়, তখন কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় না, ফলে লিটমাস কাগজের রঙের কোনোই পরিবর্তন হয় না। পক্ষান্তরে নীল লিটমাস কাগজ ডুবালে লিটমাসের সাথে লেবুর সাইট্রিক এসিডের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, ফলে লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তিত হয়ে যায়।

> কাজ : লেবুর রসের বদলে তোমরা নিজেদের মধ্যে দল করে ভিনেগার, কামরাঙা, কমলার রস ইত্যাদি নিয়ে লাল ও নীল লিটমাস কাগজ দিয়ে পরীক্ষা করে রং পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করো।

তাহলে একথা বলা যায় যে, এসিডের একটি ধর্ম হলো এরা নীল লিটমাসকে লাল করে।

তোমরা কি জানো, লেবুর রসের মতো আমলকি, করমচা, কামরাঙা, বাতাবি লেবু, আঙুর ইত্যাদি টক লাগে কেন? কারণ হলো এই ফলগুলোতে নানা রকম এসিড থাকে। অর্থাৎ এটা বলা যায় যে, এসিডসমূহ টক স্বাদযুক্ত হয়।

নিচের টেবিলে বেশ কিছু ফল ও এতে উপস্থিত এসিডের নাম দেওয়া হলো।

ফলের নাম	উপস্থিত এসিড
আঙুর, কমলা, লেবু	সাইট্রিক এসিড
তেঁতুল	টারটারিক এসিড
টমেটো	অক্সালিক এসিড
আমলকি	এসকরবিক এসিড
আপেল, আনারস	ম্যালিক এসিড

> কাজ : ক্ষারক সম্পর্কে জানা
>
> **প্রয়োজনীয় উপকরণ :** চুন, বিকার, পানি, লাল ও নীল লিটমাস কাগজ, হাতমোজা, নাড়ানি, চামচ, ড্রপার, চিমটা
>
> **পদ্ধতি :** হাতমোজা পরে চামচ দিয়ে ৫–১০ গ্রাম চুন বিকারে নাও। এবার ড্রপার দিয়ে আস্তে আস্তে ১০০ মিলিলিটার পানি যোগ করো। নাড়ানি দিয়ে ভালোভাবে নাড়া দাও। এরপর ১০ মিনিট মিশ্রণটিকে রেখে দাও। সতর্কতার সাথে মিশ্রণের উপরিভাগ থেকে পরিষ্কার দ্রবণ আলাদা করে নাও। এই পরিষ্কার দ্রবণটিই হলো চুনের পানি। এখন চুনের পানিতে চিমটা দিয়ে লাল ও নীল লিটমাস কাগজ ডুবাও। লিটমাস কাগজের রং কি পরিবর্তন হলো ?

হ্যাঁ, লাল লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তিত হয়ে নীল হয়ে গেল আর নীল লিটমাসের রং পরিবর্তন হলো না। পরবর্তীতে তোমরা রং পরিবর্তনের কারণ আরও বিশদভাবে জানতে পারবে।

চুনের পানিতে থাকা $Ca(OH)_2$ এর মতো যে সকল রাসায়নিক পদার্থ লাল লিটমাস কাগজকে নীল করে, তাদেরকে আমরা ক্ষারক বলি। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) একটি ক্ষারক, যা সাবান তৈরির একটি মূল উপাদান। এটি কাগজ ও রেয়ন শিল্পেও ব্যবহৃত হয়।

নির্দেশক : তোমরা উপরে যে লিটমাস কাগজ ব্যবহার করলে, তা নিজের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো একটি পদার্থ অম্ল না ক্ষারক তা নির্দেশ করল। লিটমাস কাগজ এর মতো যেসব পদার্থ নিজেদের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো একটি বস্তু অম্ল না ক্ষার বা কোনোটিই নয় তা নির্দেশ করে, তাদেরকে নির্দেশক বলে। লিটমাস কাগজের মতো মিথাইল অরেঞ্জ, ফেনোফথালিন, মিথাইল রেড এগুলো নানা রকমের নির্দেশক যা একটি অজানা পদার্থ এসিড, ক্ষারক না নিরপেক্ষ তা বুঝতে সাহায্য করে।

এসিড : আমরা কয়েকটি এসিডের সংকেত লক্ষ করি। ভিনেগার বা এসিটিক এসিড (CH_3COOH), অক্সালিক এসিড (HOOC-COOH), হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl), সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) ।

এই সবগুলো এসিডের মিল কোথায়?

এদের সবগুলোতেই এক বা একাধিক H পরমাণু আছে এবং এরা সবাই পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) তৈরি করে। তাহলে বলা যায় যে, এসিড হলো ঐ সকল রাসায়নিক পদার্থ যাদের মধ্যে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং যারা পানিতে H^+ উৎপন্ন করে।

$$HCl \xrightarrow{H_2O} H^+ + Cl^-$$

$$CH_3COOH \xrightarrow{H_2O} H^+ + CH_3COO^-$$

মিথেন (CH_4) কি এসিড

এটি এসিড নয়। মিথেনে ৪টি H পরমাণু আছে, কিন্তু মিথেন পানিতে H^+ উৎপন্ন করে না।

এবার দুটি ক্ষারকের দিকে লক্ষ করি। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড [$Ca(OH)_2$]।

ক্ষারক হলো সেই সকল রাসায়নিক পদার্থ যাদের মধ্যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং যারা পানিতে হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) তৈরি করে।

$$NaOH \xrightarrow{H_2O} Na^+ + OH^-$$

$$Ca(OH)_2 \xrightarrow{H_2O} Ca^{2+} + 2OH^-$$

তবে কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ, যেমন– ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা চুন, অ্যামোনিয়া (NH_3), যাদের মধ্যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন দু'ধরনের পরমাণু নেই, কিন্তু এরা পানিতে OH^- তৈরি করে, এদেরকেও ক্ষারক বলা হয়।

$$CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$$

$$NH_3 + H_2O \longrightarrow NH_4OH$$

ক্ষারক : তোমরা এর আগে জেনেছ যে, ক্ষারক হলো মূলত ধাতব অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড। কিছু কিছু ক্ষারক আছে যারা পানিতে দ্রবীভূত হয় আর কিছু আছে যারা দ্রবীভূত হয় না। যে সমস্ত ক্ষারক পানিতে দ্রবীভূত হয় তাদেরকে ক্ষার বলে। তাহলে ক্ষার হলো বিশেষ ধরনের ক্ষারক। $NaOH$, $Ca(OH)_2$, NH_4OH এগুলো ক্ষার। এগুলোকে কিন্তু ক্ষারকও বলা যায়। পক্ষান্তরে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড [$Al(OH)_3$] পানিতে দ্রবীভূত হয় না। তাই এটি একটি ক্ষারক হলেও ক্ষার নয়। অতএব একথা বলা যায় যে, **সকল ক্ষার ক্ষারক হলেও সকল ক্ষারক কিন্তু ক্ষার নয়।**

তোমরা সবাই জানো যে, সাবান স্পর্শ করলে পিচ্ছিল মনে হয়। এর কারণ হলো সাবানে ক্ষার থাকে। তাহলে বলা যায় যে, ক্ষার ও ক্ষারকের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এরা পিচ্ছিল হয়। আবার দেখা গেছে যে, ক্ষার ও ক্ষারকসমূহ সাধারণত কটু স্বাদযুক্ত হয়। উল্লেখ্য ক্ষারকের স্বাদ পরীক্ষা না করাই ভালো।

পাঠ ৫ ও ৬ : এসিড ও ক্ষারকের ব্যবহার

তোমরা কি জানো, আমাদের বহুল ব্যবহৃত ব্লিচিং পাউডার কীভাবে তৈরি হয়?

এটি তৈরি হয় শুকনো ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও ক্লোরিন গ্যাসের (Cl_2) বিক্রিয়া ঘটিয়ে। আবার ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের পাতলা দ্রবণ যা চুনের পানি বা লাইম ওয়াটার (Lime water) নামে পরিচিত, সেটি আমাদের ঘরবাড়ি হোয়াইট ওয়াশ করতে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে পানি ও ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের তৈরি পেস্ট যা মিল্ক অফ লাইম (Milk of Lime) নামে অধিক পরিচিত, তা পোকামাকড় দমনে ব্যবহৃত হয়।

তোমরা কি জানো, আমাদের পাকস্থলীতে এসিডিটি হলে যে এন্টাসিড ঔষধ খাই তা আসলে কী?

এন্টাসিড ঔষধ হলো মূলত ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড [$Mg(OH)_2$] যা সাসপেনশান ও ট্যাবলেট দুভাবেই পাওয়া যায়। ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড [$Mg(OH)_2$] এর সাসপেনশান মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া (Milk of Magnesia) নামেই অধিক পরিচিত। কখনো কখনো এন্টাসিডে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডও [$Al(OH)_3$] থাকে।

ফলমূল বা সবজিতে যে সকল এসিড থাকে এদেরকে জৈব এসিড বলে। এদেরকে খাওয়া যায় এবং কোনো কোনোটি মানব দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। যেমন– এসকরবিক এসিড যা আমরা ভিটামিন সি বলে জানি। এর অভাবে মানবদেহে স্কার্ভি (Scurvy) রোগ হয়। অন্যদিকে কিছু কিছু এসিড আছে যেমন– হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl), সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4), ফসফরিক এসিড (H_3PO_4), নাইট্রিক এসিড (HNO_3), পারক্লোরিক এসিড ($HClO_4$) ইত্যাদি প্রকৃতিতে প্রাপ্ত নানারকম খনিজ পদার্থ থেকে তৈরি করা হয়, এদেরকে খনিজ এসিড (Mineral Acids) বলে। এগুলো খাওয়ার উপযোগী নয়। বরং বলা যায় এরা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। খনিজ এসিড ত্বকে লাগলে ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

তোমরা কি জানো, আমাদের সমাজের কিছু খারাপ চরিত্রের লোক যে এসিড ছুড়ে মানুষের শরীর ঝলসে দেয় সেগুলো কোন ধরনের এসিড? এগুলো হলো খনিজ এসিড।

তোমরা কি জানো, এসিড ছোড়ার শাস্তি কী?

এসিড ছোড়ার শাস্তি খুবই কঠোর, এমনকি মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে।

দুষ্ট চরিত্রের লোকেরা এসিড ছুড়ে একদিকে যেমন মারাত্মক অপরাধ করছে, অন্যদিকে শিল্প কারখানায় অতি প্রয়োজনীয় এসিড অপচয় করছে। এর বিরুদ্ধে অবশ্যই আমাদের সোচ্চার হতে হবে এবং মানুষকে সচেতন করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা পোস্টার, লিফলেট এগুলো তৈরি করে মানুষের মধ্যে বিলি করতে পারি। এতে একদিকে যেমন আমাদের মূল্যবান সম্পদ খনিজ এসিডসমূহের অপচয় রোধ করা যাবে, অন্যদিকে এসিড ছোড়ার মতো মারাত্মক শাস্তিযোগ্য অপরাধ থেকে আমাদের সমাজও রক্ষা পাবে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এবং শিল্প কারখানায় এসিডের ব্যবহার অনস্বীকার্য। আমরা টয়লেট পরিষ্কারের কাজে যে সমস্ত পরিষ্কারক ব্যবহার করি তাতে এসিড থাকে। সোনার গহনা তৈরির সময় স্বর্ণকাররা নাইট্রিক এসিড ব্যবহার করেন। আমরা বিভিন্ন কাজে যেমন– আইপিএস, গাড়ি, মাইক বাজানোর সময়, সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে ব্যাটারি ব্যবহার করি তাতে সালফিউরিক এসিড ব্যবহৃত হয়। তোমরা অনেকে হয়তো জানো যে, বাসাবাড়িতে সাপের উপদ্রব কমানোর জন্য যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়, সেটি হলো কার্বোলিক এসিড।

তোমরা কি জানো, আমাদের খাদ্যদ্রব্য হজম করার জন্য পাকস্থলীতে এসিড অত্যাবশ্যকীয় এবং সেটি হলো হাইড্রোক্লোরিক এসিড।

সার কারখানায় অতি প্রয়োজনীয় একটি উপাদান হলো সালফিউরিক এসিড। এছাড়া ডিটারজেন্ট থেকে শুরু করে নানারকম রং, ঔষধপত্র, কীটনাশক পেইন্ট, কাগজ, বিস্ফোরক ও রেয়ন তৈরিতে প্রচুর H_2SO_4 ব্যবহৃত হয়।

কোনো একটি দেশ কতটা শিল্পোন্নত তা বিচার করা হয় ঐ দেশ কতটুকু H_2SO_4 ব্যবহার করে, তার উপর ভিত্তি করে। ইস্পাত তৈরির কারখানা, ঔষধ, চামড়া শিল্প ইত্যাদি অনেক শিল্পে HCl ব্যবহৃত হয়।

সার কারখানায়, বিস্ফোরক প্রস্তুতি, খনি থেকে মূল্যবান ধাতু যেমন সোনা আহরণে ও রকেটে জ্বালানির সাথে HNO_3 ব্যবহৃত হয়।

পাঠ ৭– ১০ : এসিড ও ক্ষারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

> **কাজ :** চুনাপাথরের সাথে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ
>
> **প্রয়োজনীয় উপকরণ :** চুনাপাথর, চামচ, পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড, কাচের ড্রপার, এ্যাপ্রোন
>
> **পদ্ধতি :** এ্যাপ্রোনটি পরে নাও। চুনাপাথর গুঁড়া করে চামচে নাও। এবার কাচের ড্রপার দিয়ে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড চামচে যোগ করতে থাক। কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ? গ্যাসের বুদবুদ উঠছে? হ্যাঁ, গ্যাসের বুদবুদ উঠছে এবং অনেকটা ফেনার মতো মনে হচ্ছে। কারণ চুনাপাথরে ($CaCO_3$) পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগ করাতে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং সে কারণেই আমরা বুদবুদ দেখি। উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড চলে গেলে আমরা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও পানির পরিষ্কার দ্রবণ দেখতে পাই।

হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মতো প্রায় সকল এসিডই কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।

$$CaCO_3 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে যে, কখনো কখনো এসিডের এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে উৎপন্ন CO_2 আগুন নেভানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

তোমরা বলোতো খাবার সোডা ($NaHCO_3$) ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় কী ঘটবে ?

খাবার সোডা ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ, পানি ও CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হবে।

$$NaHCO_3 + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$$

তোমরা পূর্বের শ্রেণিতে খাবার সোডাতে লেবুর রস বা ভিনেগার যোগ করলে কী ঘটে তা জেনেছ। তোমাদের কি তা মনে আছে? এখানে কী ধরনের বিক্রিয়া ঘটবে লেখ।

> **কাজ :** এসিডের সাথে ধাতু মেশালে কী ঘটে তা পর্যবেক্ষণ
>
> **প্রয়োজনীয় উপকরণ :** ধাতু হিসেবে দস্তার গুঁড়া (Zn), পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড, স্পিরিট ল্যাম্প, টেস্টটিউব, এ্যাপ্রোন
>
> **পদ্ধতি :** এ্যাপ্রোন পরে নাও। টেস্টটিউবের অর্ধেক পরিমাণ পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড নাও। অল্প পরিমাণ দস্তার গুঁড়া টেস্টটিউবে নেওয়া এসিডে ছেড়ে দাও। কোনো গ্যাসের বুদবুদ উঠছে কি? না উঠলে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়ে টেস্ট টিউবের তলায় হালকা তাপ দাও। গ্যাসের বুদবুদ উঠছে কি?

এটি দস্তা ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদবুদ। এটি হাইড্রোজেন গ্যাস কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে পার। টেস্টটিউবের মুখে একটি জ্বলন্ত দিয়াশলাই ধরে দেখ কী ঘটে? পপ পপ শব্দ করে জ্বলছে? হ্যাঁ ঠিক তাই। এটি হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য গ্যাস হলে এমন শব্দ হতো না।

$$Zn + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow$$

হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মতো প্রায় সকল এসিডই ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।

কাজ : চুনের পানির সাথে এসিডের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : চুন, পানি, সালফিউরিক এসিড, বিকার, লাল লিটমাস কাগজ, নাড়ানি, চিমটা, ড্রপার

পদ্ধতি : চুনের পানি তৈরি করো। ছোট বিকারে ১০ মিলিলিটার চুনের পানি নাও। এবার চিমটা দিয়ে লাল লিটমাস কাগজকে চুনের পানিতে ডুবাও। লিটমাস কাগজের রং লাল থেকে নীল হয়ে গেল কি? হ্যাঁ, ঠিক তাই। এতে প্রমাণিত হলো চুনের পানি একটি ক্ষারকীয় পদার্থ। এবার পাতলা সালফিউরিক এসিড ড্রপার দিয়ে আস্তে আস্তে যোগ করো ও নাড়ানি দিয়ে নাড়া দাও। লিটমাস কাগজ বিকারের দ্রবণে ডুবিয়ে দেখ এর রঙের কী ধরনের পরিবর্তন হয়। এভাবে আস্তে আস্তে H_2SO_4 যোগ করতে থাক এবং লিটমাস কাগজ ডুবিয়ে পরীক্ষা করো। এক পর্যায়ে দেখবে লিটমাস কাগজের রং আর পরিবর্তন হচ্ছে না।

কেন লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন হচ্ছে না?

কারণ হলো, চুনের পানিতে থাকা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড $[Ca(OH)_2]$ এর সাথে সালফিউরিক এসিড $[H_2SO_4]$ বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম সালফেট ও পানি উৎপন্ন করে। ফলে ধীরে ধীরে $Ca(OH)_2$ এর পরিমাণ কমতে থাকে এবং যখন সব $Ca(OH)_2$, H_2SO_4 এর সাথে বিক্রিয়া করে ফেলে তখন লিটমাস কাগজের রং আর পরিবর্তন হয় না।

$Ca(OH)_2$	+	H_2SO_4	$\longrightarrow$	$CaSO_4$	+	$2H_2O$
ক্ষারক		এসিড		লবণ		পানি

এখানে উৎপন্ন ক্যালসিয়াম সালফেট হলো একটি লবণ। তাহলে আমরা বলতে পারি ক্ষারক ও এসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন মূল পদার্থই হলো লবণ।

আরও কিছু ক্ষারক ও এসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন লবণ দেখে নেওয়া যাক :

ক্ষারক		এসিড		লবণ		পানি
NaOH	+	HCl	$\longrightarrow$	NaCl	+	H_2O
KOH	+	HNO_3	$\longrightarrow$	KNO_3	+	H_2O

তবে একমাত্র ক্ষারক ও এসিডের বিক্রিয়াতেই যে লবণ উৎপন্ন হয় তা নয়। অন্য বিক্রিয়ার মাধ্যমেও লবণ উৎপন্ন করা যায়। যেমন– ধাতু ও এসিডের মধ্যে বিক্রিয়ায় লবণ উৎপন্ন হয়।

$$Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2\uparrow$$

$$Na + 2HCl \longrightarrow NaCl + H_2\uparrow$$

আবার কার্বনেটের সাথে (যা একটি লবণ) এসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়েও লবণ উৎপন্ন করা যায়।

$$Na_2CO_3 + 2HCl \longrightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$$

পাঠ ১১–১৩ : অম্ল, ক্ষার ও লবণ শনাক্তকরণ

কাজ : পানি ও খাবার লবণের মিশ্রণে লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন হয় কি না তা পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : বিকার, নাড়ানি, লবণ, পানি, লাল ও নীল লিটমাস কাগজ, চিমটা

পদ্ধতি : একটি বিকারে ৫০ মিলিলিটার পানি নিয়ে তাতে ১০–১৫ গ্রাম খাবার লবণ যোগ করো। নাড়ানি দিয়ে ভালোভাবে নাড়া দাও। এবার চিমটা দিয়ে প্রথমে নীল লিটমাস কাগজ ও পরে লাল লিটমাস কাগজ লবণ-পানির মিশ্রণে ডুবাও। লিটমাস কাগজের রং কি পরিবর্তন হলো? না, হলো না। কেন হলো না?

কারণ এখানে কোনো এসিড বা ক্ষারক নেই। এসিড থাকলে নীল লিটমাস লাল হতো আর ক্ষারক থাকলে লাল লিটমাস নীল হতো। পানিতে যে লবণ আছে তা একটি নিরপেক্ষ পদার্থ। না এসিড, না ক্ষারক। তাই কোনো লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন হয় না। খাবার লবণের মতো অনেক লবণ আছে যারা নিরপেক্ষ পদার্থ, অর্থাৎ এরা লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন করে না।

কখনো কখনো বিশেষ কারণে অর্থাৎ দূষিত পানিতে এসিড বা ক্ষারক থাকতে পারে। তখন কিন্তু নিরপেক্ষ পদার্থ হলেও পানি লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন করতে পারে।

কাজ : ফুল ও সবজির নির্যাস তৈরি এবং অম্ল ও ক্ষারক শনাক্তকরণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : জবা, বাগান বিলাস ও হলুদ কৃষ্ণচূড়া ফুলের পাপড়ি, বেগুনি বাঁধাকপির পাতা, সালাদ তৈরির বীট, পুঁই শাকের বীজ, বিকার (৬টি), নাড়ানি, পানি, বুনসেন বার্নার বা গ্যাসের চুলা, ফিল্টার কাগজ, বোতল, কাগজ, কলম, লেবুর রস, ভিনেগার, টক দই, চুনের পানি, সাবান পানি, খাবার সোডা, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, কাচের খণ্ড, ড্রপার।

পদ্ধতি : উপরে বর্ণিত নানা রকম ফুল ও সবজির উপাদান সংগ্রহ করো। আলাদাভাবে এক একটি বিকারে এক একটি ফুলের পাপড়ি বা সবজির উপাদান নিয়ে তাতে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে বুনসেন বার্নার বা চুলায় জ্বাল দাও। পানি প্রায় অর্ধেক হলে মিশ্রণগুলো ঠান্ডা করো। ফিল্টার কাগজ দিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে ছেঁকে প্রাপ্ত নির্যাস ভিন্ন ভিন্ন বোতলে রাখ। কোন বোতলে কোন ধরনের নির্যাস তা বোতলের গায়ে লিখে রাখ। এবার টেস্টটিউব নিয়ে একে একে লেবুর রস, চুনের পানি, টক দই, ভিনেগার, সাবান পানি, খাবার সোডা, HCl, NaOH নাও ও কোনটিতে কী নিলে তা গায়ে লিখে রাখ। এবার একটি নির্যাস নিয়ে ড্রপার দিয়ে অল্প পরিমাণে প্রতিটি টেস্টটিউবে যোগ করে ভালোভাবে ঝাঁকাও। নির্যাসের রঙে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ? কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে বর্ণ লাল ও কোন কোন ক্ষেত্রে নীল হয়েছে তা ছক তৈরি করে লিখে রাখ। এই ছক থেকে তোমরা বুঝতে পারবে কোন দ্রব্যটি এসিডীয় ও কোনটি ক্ষারকীয়।

একে একে প্রতিটি নির্যাস নিয়ে রং পরিবর্তন ছকে লিখে রাখ। এবার প্রতিটি দ্রব্য নিয়ে লাল ও নীল লিটমাস কাগজ দিয়ে দেখ কোন দ্রব্যটি অম্লীয় আর কোনটি ক্ষারকীয়। লক্ষ করো, একই ধরনের সকল বস্তু একই রকম বর্ণ ধারণ করে।

নতুন শব্দ : অম্ল, ক্ষারক, নির্দেশক, লিটমাস, লাইম ওয়াটার, এন্টাসিড।

এই অধ্যায় শেষে যা শিখলাম–

– যে সমস্ত পদার্থ পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে তারা হলো অম্ল বা এসিড।

– অম্ল নীল লিটমাসকে লাল করে। অম্ল টক স্বাদযুক্ত হয়।

– ধাতব অক্সাইড ও হাইড্রোক্সাইডসমূহ হলো ক্ষারক। ক্ষারক লাল লিটমাসকে নীল করে।

– ক্ষার হলো সেই সমস্ত ক্ষারক যারা পানিতে দ্রবীভূত হয়। ক্ষারকসমূহ কটু স্বাদের হয়।

– নির্দেশকসমূহ নিজেদের বর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো একটি বস্তু অম্ল, ক্ষারক না নিরপেক্ষ তা নির্দেশ করে।

– লবণ হলো অম্ল ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন নিরপেক্ষ পদার্থ।

– এসিডের সাথে ধাতব কার্বনেট বা বাইকার্বনেটের বিক্রিয়ায় লবণ, পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়।

– এসিডের সাথে ধাতুর বিক্রিয়ায় লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. এসিডসমূহ পানিতে ———————— উৎপন্ন করে।

২. ক্ষার হলো এক ধরনের ক্ষারক যারা ————————।

৩. সকল ————————কিন্তু সকল———————— নয়।

৪. এসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় ———————— উৎপন্ন হয়।

৫. এন্টাসিড হলো ———————— জাতীয় পদার্থ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. এসিড ও ক্ষারকের মূল পার্থক্য কী?

২. সকল ক্ষারই ক্ষারক কিন্তু সকল ক্ষারক ক্ষার নয়– এ কথার ব্যাখ্যা দাও।

৩. চুনের পানিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালনা করলে কী ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তা বিক্রিয়াসহ লেখ।

৪. বিশুদ্ধ পানি ও লবণ কি লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন করে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৫. নির্দেশক বলতে কী বোঝায়?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. টমেটোতে কোন এসিড থাকে?

ক. এসিটিক এসিড খ. অক্সালিক এসিড

গ. ম্যালিক এসিড ঘ. সাইট্রিক এসিড

২. কোন এসিড খাওয়া যায়?

ক. HNO_3 খ. HCl

গ. H_2SO_4 ঘ. CH_3COOH

নিচের বাক্যটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

আদিল একদিন জিঙ্ক অক্সাইড ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়া ঘটালো।

৩. বিক্রিয়াটিতে উৎপন্ন যৌগ হলো–

i. লবণ ii. ক্ষার iii. পানি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. কার্বনেটযুক্ত লবণের সাথে দ্বিতীয় যৌগটির বিক্রিয়া ঘটালে কী উৎপন্ন হবে?

ক. H_2 খ. O_2

গ. CO_2 ঘ. Cl_2

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফারাহ তৈলাক্ত খাবার খেতে পছন্দ করে। ইদানীং তার পেটে প্রায়ই ব্যথা হয়। ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার জানালেন তার এসিডিটি হয়েছে। ডাক্তার তাকে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করার পাশাপাশি একটি ঔষধ খেতে পরামর্শ দিলেন।

ক. লবণ কী?

খ. মিল্ক অফ লাইম বলতে কী বোঝায়?

গ. ডাক্তার কী ঔষধ খাওয়ার পরামর্শ দিলেন এবং কেন দিলেন?

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত এসিডিটি তৈরি হওয়ার উপাদানটি কোন ধরনের যৌগ এবং কেন? বিশ্লেষণ কর।

২. মানছুরা খানম মাঝে মাঝে পান খান। তিনি একদিন একটি পাত্রে চুন ভিজিয়ে রাখলেন। কিছুক্ষণ পর লক্ষ করলেন, পাত্রটি অনেক গরম হয়ে গেছে। তিনি আরও লক্ষ করলেন, পাত্র থেকে চুন নেওয়ার সময় চুনের পানিতে নিঃশ্বাস পড়ায় পানিটা ঘোলা হয়ে গেল।

ক. ক্ষার কী?

খ. চুনের পানি ঘোলা হওয়ার কারণ কী?

গ. মানছুরা খানমের পাত্রে ভিজানো যৌগটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উৎপন্ন ১ম যৌগটি ক্ষার ও ক্ষারক উভয় ধর্মই প্রদর্শন করে, বিশ্লেষণ করো।

কাজ : বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত নানা রকম অম্ল, ক্ষারক ও লবণের তালিকা তৈরি করে উপস্থাপন করো।

একাদশ অধ্যায়

আলো

আলোক রশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে তীর্যকভাবে আপতিত হলে মাধ্যম পরিবর্তনে এর গতিপথের দিক পরিবর্তন দেখা যায়। এটি হলো আলোর প্রতিসরণ। এই অধ্যায়ে আমরা দৈনন্দিন জীবনে সংঘটিত আলোর প্রতিসরণের বিভিন্ন ঘটনা, পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এবং এর প্রয়োগ হিসাবে অপটিক্যাল ফাইবারের সাথে পরিচিত হব। এছাড়া ম্যাগনিফাইং গ্লাসের কাজ, মানব চক্ষু ও ক্যামেরার কার্যক্রম তুলনা নিয়ে আলোচনা করব।

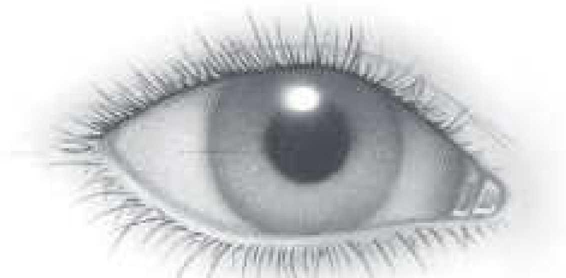

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- দৈনন্দিন জীবনে সংঘটিত আলোর প্রতিসরণের ঘটনাগুলো চিত্র অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করতে পারব
- পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অপটিক্যাল ফাইবারের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ম্যাগনিফাইং গ্লাসের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- চশমার কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ক্যামেরা এবং চোখের কার্যক্রম তুলনা করতে পারব;
- আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কার্যক্রমে আলোর অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

পাঠ ১ : আলোর প্রতিসরণ

তোমরা কি কখনো কোনো কাঁচের বা গ্লাসের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছবি দেখার চেষ্টা করেছ? গ্লাস থেকে আলোর প্রতিফলনের ফলে তোমরা কি একটা অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখেছ? এই প্রতিবিম্বটা কি কোনো আয়নায় তৈরি তোমাদের প্রতিবিম্ব থেকে ভিন্ন? এটাকে অনেক বেশি আবছা লাগে কেন বলতে পার? গ্লাস বা কাঁচ হলো স্বচ্ছ মাধ্যম। অধিকাংশ আলোই এর মধ্য দিয়ে চলে যায়, খুবই কম অংশ প্রতিফলিত হয় বলেই প্রতিফলিত প্রতিবিম্বটি এতটা আবছা দেখা যায়। তাহলে আলো যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে চলে তখন এর গতিপথ কেমন হয়? চলো আমরা এবার এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানব। তবে প্রথমে তোমরা নিচের কাজটি করে নাও।

কাজ : আলোর প্রতিসরণের ধারণা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি পেন্সিল, একটি কাচের গ্লাস, পানি।

পদ্ধতি : একটি কাঁচের গ্লাসে ৩/৪ অংশ পূর্ণ করে পানি নাও। এবার একটি পেন্সিলকে একটু কাত করে চিত্রের মতো পানির ভিতর রাখলে পানির ভিতরে পেন্সিলের অংশটুকু কেমন দেখাবে?

তুমি পানির মধ্যে পেন্সিলটিকে পর্যবেক্ষণ করো। তোমার পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফল লেখ। আমরা জানি, কোনো বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়লেই কেবল ঐ বস্তুকে দেখতে পারি। তুমি দেখছ নিশ্চয়ই পেন্সিলটিকে পানির মধ্যে খাটো, মোটা এবং পানির তল বরাবর এটি ভেঙ্গে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

চিত্র ১১.১ : আলোর প্রতিসরণ

উপরের কাজটির ক্ষেত্রে পানির ভিতরে পেন্সিলের নিচের অংশ থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ছে। এর পূর্বে এটি এক স্বচ্ছ মাধ্যম পানি থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যম বায়ুতে এসে তোমাদের চোখে পড়ছে। দুইটি ভিন্ন মাধ্যমে আলো যদি একই সরল রেখায় চলত তাহলে পেন্সিলটিকে নিশ্চয়ই সোজা দেখাত। কিন্তু তোমরা দেখতে পেলে এটিকে পানির তলে ভেঙ্গে গেছে বলে মনে হচ্ছে। এর থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, আলো যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন এটি তার গতিপথের দিক পরিবর্তন করে। আলোক রশ্মির এই দিক পরিবর্তনকে আমরা বলি আলোর প্রতিসরণ। একটি নির্দিষ্ট স্বচ্ছ মাধ্যমে আলো সরল রেখায় চলে, কিন্তু অন্য মাধ্যমে প্রবেশের সাথে সাথেই এটি মাধ্যমের আলোকীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে দিক পরিবর্তন করে। এখানে উল্লেখ্য যে, লম্বভাবে আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে যাওয়ার সময় এর গতিপথের কোনো দিক পরিবর্তন হয় না।

পাঠ ২ ও ৩ : আলোর প্রতিসরণের নিয়ম

আলোক রশ্মি প্রতিসরণের সময় যে নিয়মগুলো মেনে চলে তা বোঝার জন্য প্রথমেই পরীক্ষাটা করে নাও।

কাজ : কাচফলকে আলোর প্রতিসরণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : আলপিন, কাচফলক, ড্রইং বোর্ড

পদ্ধতি : প্রথমেই ড্রইং বোর্ডে একটি সাদা কাগজ আটকিয়ে নাও। কাঁচফলকটিকে সাদা কাগজের কেন্দ্রে রাখ এবং এর চারদিকে দাগাঙ্কিত করো। এবার কাঁচফলকটি সরিয়ে নাও এবং একটি আপতিত রশ্মি AB আঁক। মোটামুটি ৫ সে মি দূরত্বে AB রেখার উপর P এবং Q বিন্দুতে দুটি পিন খাড়াভাবে রাখ। কাচফলকটি পুনরায় পূর্বের স্থানে রাখ এবং পিন যে প্রান্তে রেখেছ তার উল্টো দিক থেকে পিন দুটিকে দেখার চেষ্টা করো (শিক্ষকের নির্দেশনা প্রয়োজন)।

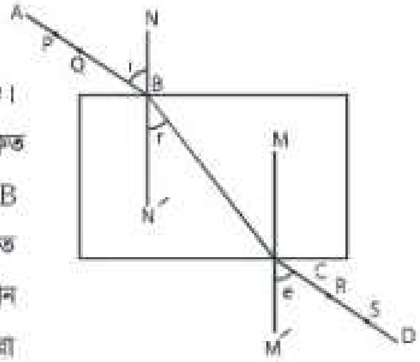

চিত্র ১১.২ : কাঁচের সাপেক্ষে আলোর প্রতিসরণ

এবার কাঁচফলকের অপর প্রান্তে R এবং S বিন্দুতে আরও দুটি পিন খাড়াভাবে রাখ যেন কাঁচফলকের মধ্য দিয়ে P, Q, R ও S একই লাইনে আছে বলে মনে হয়। R এবং S বিন্দু দুটি চিহ্নিত করে পুনরায় কাঁচফলক সরিয়ে CD লাইন টান। পাশাপাশি BC প্রতিসরিত রশ্মি, অভিলম্ব MM´ এবং NN´ আঁক। চাঁদা দিয়ে আপতন কোণ ABN, প্রতিসরণ কোণ CBN´ এবং নির্গত কোণ DCM´ চিহ্নিত করে মাপ।

উপরের কাজটি করে তোমরা কী পর্যবেক্ষণ করতে পারছ? এখানে আলোক রশ্মি হালকা মাধ্যম (বায়ু) থেকে ঘন মাধ্যমে (কাঁচ) প্রবেশ করেছে। কোণগুলোকে মেপে দেখা যাচ্ছে আপতন কোণ i প্রতিসরণ কোণ r অপেক্ষা বড় এবং আপতন কোণ i ও নির্গমন কোণ e সমান। তাহলে তোমরা সিদ্ধান্ত নিতে পার :

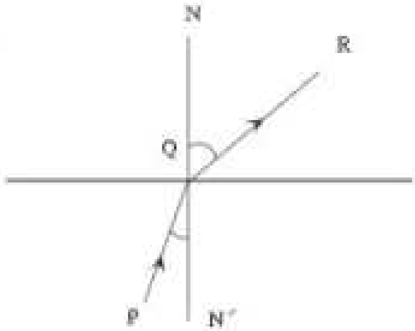

চিত্র ১১.৩ : ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণ

- আলোক রশ্মি যখন হালকা মাধ্যমে থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন এটি অভিলম্বের দিকে সরে আসে। এই ক্ষেত্রে আপতন কোণ প্রতিসরণ কোণ আপেক্ষা বড় হয়।
- আলোকরশ্মি প্রথমে একটি মাধ্যম থেকে (যেমন বায়ু) অন্য মাধ্যমে (কাঁচ) প্রতিসরিত হওয়ার পর পুনরায় একই মাধ্যমে (বায়ু) নির্গত হলে আপতন কোণ ও নির্গমন কোণ সমান হয়।

- আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে।
- এছাড়াও উপরের পরীক্ষাটির ন্যায় অনুরূপ পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে, আলোক রশ্মি যখন ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন এটি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। এই ক্ষেত্রে আপতন কোণ প্রতিসরণ কোণ অপেক্ষা ছোট হয়।
- আলোক রশ্মি যখন অভিলম্ব বরাবর আপতিত হয় তখন আপতন কোণ, প্রতিসরণ কোণ ও নির্গত কোণের মান শূন্য হয়। এক্ষেত্রে আপতিত রশ্মির দিক পরিবর্তন হয় না।

পাঠ ৪ ও ৫ : প্রতিসরণের বাস্তব প্রয়োগ

তোমরা এখন নিচের কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রতিসরণের বাস্তব প্রয়োগ দেখতে পাবে।

(১) একটি সোজা লাঠিকে কাত করে পানিতে ডুবালে উপর থেকে তাকালে পানির ভিতর লাঠির অংশটি কেমন দেখাবে। পর্যবেক্ষণ করে দেখ লাঠিটি ছোট, মোটা এবং উপরে দেখা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে? আসলে প্রতিসরণের ফলে এমন হচ্ছে। চিত্র অনুসারে এখানে ঘন মাধ্যম পানি থেকে আলো প্রতিসরিত হয়ে হালকা মাধ্যমে তোমার চোখে প্রতিফলিত হচ্ছে। লাঠিটির নিমজ্জিত অংশের প্রতিটি বিন্দু উপরে উঠে আসে। ফলে লাঠিকে খানিকটা উপরে, দৈর্ঘ্যে কম এবং মোটা দেখায়।

চিত্র ১১.৪ : আলোর প্রতিসরণ

(২) একটি স্টিলের মগ বা চিনামাটির বাটি নাও। এরপর মগ বা বাটিতে একটি মুদ্রা রাখ। এখন তোমার চোখকে এমন স্থানে রাখ যেন তুমি মুদ্রাটিকে দেখতে না পাও। এবার অন্য একজনকে ধীরে ধীরে মগ বা পাত্রে পানি ঢালতে বলো। কী হবে এবং কেন হবে তা বলতে পারবে? পর্যবেক্ষণ করে দেখবে, আস্তে আস্তে তুমি মুদ্রাটিকে দেখতে পাবে। এটি প্রতিসরণের ফলে সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিসরণের ফলে আলো ঘন মাধ্যম পানি থেকে হালকা মাধ্যম বায়ুতে তোমার চোখে প্রতিসরিত হওয়ায় তুমি মুদ্রাটির অবাস্তব প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছ।

চিত্র ১১.৫ : আলোর প্রতিসরণের ফলে মুদ্রার অবস্থানের পরিবর্তন

(৩) তুমি কি কখনো মাছ শিকার করেছ? সাধারণত পানিতে যে জায়গায় মাছটি দেখা যায় আসলে কি মাছটি ঐ জায়গায় থাকে? মোটেই না? আসলে যে মাছটি আমরা দেখি এটি হলো তার অবাস্তব প্রতিবিম্ব। প্রকৃতপক্ষে মাছ থাকে আরেকটু দূরে এবং গভীরে। যদি তুমি টেঁটা বা কোচ দিয়ে মাছ মারতে চাও, তাহলে এটিকে মারতে হবে আরও নিচে ও দূরে।

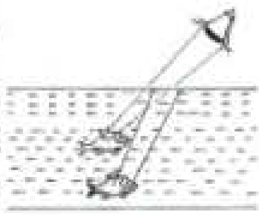

চিত্র ১১.৬ : আলোর প্রতিসরণের ফলে মাছের অবস্থানের পরিবর্তন

(৪) তুমি নিশ্চয়ই বর্ষাকালে দেখেছ যে পুকুর ঘাট পানিতে তলিয়ে যায়। বর্ষার স্বচ্ছ পানির জন্য পুকুর ঘাটের সিঁড়িটা কোথায় দেখা যায় ? আসলে এটিকে যেখানে দেখা যায় এটি থাকে তার চেয়ে একটু নিচে। ফলে অনেকেই বুঝতে না পেরে পড়ে যায়। এমন ঘটনা আরও দেখতে পাবে তোমরা যদি সেন্টমার্টিন দ্বীপের পাশে অবস্থিত ছেঁড়া দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে থাক। ওখানকার স্বচ্ছ পানিতে নিচের পাথর ও শৈবাল অনেক কাছে মনে হয়। এটা হয় মূলত আলোর প্রতিসরণের জন্যই।

পাঠ ৬ ও ৭ : পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ও সংকট কোণ (ক্রান্তি কোণ)

আলোক রশ্মি যখন ঘন স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে হালকা স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন প্রতিসরিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। ফলে প্রতিসরণ কোণ আপতন কোণের চেয়ে বড় হয়। এভাবে আপতন কোণের মান ক্রমশ বাড়তে থাকলে প্রতিসরণ কোণও অনুরূপভাবে বাড়তে থাকে।

কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট দুটি মাধ্যমের জন্য আপতন কোণের কোনো একটি মানের জন্য (এ ক্ষেত্রে অবশ্যই ৯০° অপেক্ষা কম) প্রতিসরণ কোণের মান ৯০° হয় অর্থাৎ প্রতিসরিত রশ্মিটি বিভেদ তল বরাবর চলে যায়। এ ক্ষেত্রে ঐ আপতন কোণকে আমরা সংকট কোণ বলি। এখন আপতন কোণের মান যদি সংকট কোণের চেয়ে বেশি হয় তখন কী হবে? প্রতিসরণ কোণের মান তো আর ৯০° এর বেশি হতে পারে না?

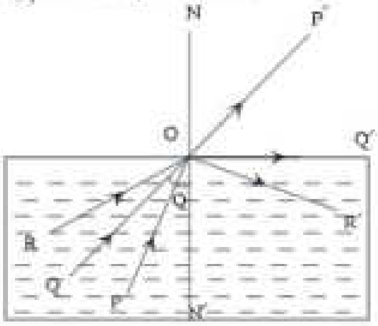

চিত্র ১১.৭ : পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ও সংকট কোণ

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ঐ ক্ষেত্রে আলোক রশ্মি আর প্রতিসরিত না হয়ে বিভেদ তল থেকে একই মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে আসবে। এক্ষেত্রে বিভেদ তল প্রতিফলক হিসেবে কাজ করে এবং এই প্রতিফলন সাধারণ প্রতিফলনের নিয়মানুসারে হয়। এই ঘটনাকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলা হয়। অর্থাৎ ঘন মাধ্যম থেকে আপতিত রশ্মি তখন দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে সাধারণ প্রতিফলনের নিয়মানুসারে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়ে আবার ঘন মাধ্যমেই ফিরে আসে।

চিত্র অনুসারে PO আপতিত রশ্মির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে ছোট, যার প্রতিসরিত রশ্মি হলো OP′। QO আপতিত রশ্মিটির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের সমান। যার প্রতিসরিত রশ্মি হলো OQ′ রশ্মি এবং এটি বিভেদ তল বরাবর প্রতিসরিত হয়েছে অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণ ৯০°। RO রশ্মিটির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে বড়। এক্ষেত্রে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়েছে OR′ রশ্মিটি প্রতিফলিত রশ্মি।

এখন প্রশ্ন হলো এর সাথে সাধারণ প্রতিফলনের পার্থক্য কোথায়? সাধারণ প্রতিফলনের সময় দেখা যায় আলোর কিছু অংশ প্রতিসরিত হয়, কিন্তু পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে দেখা যায় সমস্ত আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হয়।

পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের শর্ত

১. আলোক রশ্মি কেবলমাত্র ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় এটি ঘটে।

২. ঘন মাধ্যমে আপতন কোণ অবশ্যই এই মাধ্যম দুটির সংকট কোণের চেয়ে বড় হতে হবে।

পাঠ ৮ : অপটিক্যাল ফাইবার ও ম্যাগনিফাইং গ্লাস

অপটিক্যাল ফাইবার

অপটিক্যাল ফাইবার হলো একটি খুব সরু কাঁচতন্তু। এটা মানুষের চুলের মতো চিকন এবং নমনীয়। আলোক রশ্মিকে বহনের কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। আলোক রশ্মি যখন এই কাঁচতন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে তখন এর দেয়ালে বারবার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটতে থাকে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে আলোক রশ্মি কাঁচতন্তু অপর প্রান্ত দিয়ে বের না হওয়া পর্যন্ত। সাধারণত চিকিৎসকেরা মানবদেহের ভিতরের কোনো অংশ (যেমন পাকস্থলী, কোলন ইত্যাদি দেখার জন্য) যে আলোক নলটি ব্যবহার করে এটি একগুচ্ছ অপটিক্যাল ফাইবারের সমন্বয়ে গঠিত। এছাড়া অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহারের আরেকটি ক্ষেত্র হলো টেলিযোগাযোগ। এতে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করার ফলে একই সাথে অনেকগুলো সংকেত প্রেরণ করা যায়। এই সংকেত অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে না।

বিবর্ধক কাঁচ বা ম্যাগনিফাইং গ্লাস

তোমরা কোনো কিছুকে বড় আকারে দেখার জন্য বিবর্ধক কাঁচ ব্যবহার করে থাকবে। এটি এক ধরনের উত্তল লেন্স। কোনো উত্তল লেন্সের নির্দিষ্ট একটি দূরত্বের মধ্যে কোনো বস্তুকে স্থাপন করে লেন্সের অপর পাশ থেকে বস্তুটিকে দেখলে বস্তুটির একটি সোজা, বিবর্ধিত ও অবাস্তব প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এখন এই প্রতিবিম্ব চোখের যত কাছে গঠিত হবে চোখের বীক্ষণ কোণও তত বড় হবে এবং প্রতিবিম্বটিকেও বড় দেখাবে। কিন্তু প্রতিবিম্ব চোখের খুব কাছের একটি বিন্দু, যাকে নিকট বিন্দু বলে, তার চেয়ে কাছে গঠিত হলে সেই প্রতিবিম্ব আর স্পষ্ট দেখা যায় না। প্রতিবিম্ব যখন চোখের স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্বে গঠিত হয়, তখনই তা খালি চোখে সবচেয়ে স্পষ্ট দেখা যায়। একে চোখের নিকট বিন্দু বলে। কোনো উত্তল লেন্সের উপর এর অক্ষের সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুচ্ছ আপতিত হলে যে বিন্দুতে রশ্মিগুচ্ছ মিলিত হয় তাকে ফোকাস বিন্দু বলে। অক্ষ বরাবর লেন্স থেকে ফোকাস বিন্দুর দূরত্বকে ফোকাস দূরত্ব বলে। যে সমস্ত লেখা বা বস্তু চোখে পরিষ্কার দেখা যায় না তা স্পষ্ট ও বড় করে দেখার জন্য, এমন একটি উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয়, যার ফোকাস দূরত্ব স্বল্প। উপযুক্ত ফ্রেমে আবদ্ধ এই উত্তল লেন্সকে বিবর্ধক কাঁচ বা পঠন কাঁচ বা সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে। এই যন্ত্রে খুব বেশি বিবর্ধন পাওয়া যায় না।

চিত্র ১১.৮ : ম্যাগনিফাইং গ্লাস

শিক্ষকের সহায়তায় তোমরা এ ধরনের ম্যাগনিফাইং গ্লাস বা বিবর্ধক কাঁচ দেখতে পারো।

পাঠ ৯ ও ১০: মানব চক্ষু

চোখ আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম। চোখ দিয়ে আমরা দেখি। মানব চক্ষুর কার্যপ্রণালি ছবি তোলার ক্যামেরার মতো। চিত্রে মানব চক্ষুর বিশেষ বিশেষ অংশ দেখানো হয়েছে। প্রধান অংশগুলোর বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো (চিত্র ১১.৯)।

(ক) অক্ষিগোলক (Eye-ball) : চোখের কোটরে অবস্থিত এর গোলাকার অংশকে অক্ষিগোলক বলে। একে চক্ষু কোটরের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সীমার চারদিকে ঘুরানো যায়।

(খ) শ্বেতমণ্ডল (Sclera) : এটা অক্ষিগোলকের বাহিরের সাদা, শক্ত ও ঘন আঁশযুক্ত অস্বচ্ছ আবরণবিশেষ। এটি চক্ষুকে বাহিরের বিভিন্ন প্রকার অনিষ্ট হতে রক্ষা করে এবং চোখের আকৃতি ঠিক রাখে।

(গ) কর্নিয়া (Cornea) : শ্বেতমণ্ডলের সামনের অংশকে কর্নিয়া বলে। শ্বেতমণ্ডলের এই অংশ স্বচ্ছ এবং অন্যান্য অংশ অপেক্ষা বাহিরের দিকে অধিকতর উত্তল।

চিত্র ১১.৯ : চোখের অভ্যন্তরীণ গঠন

(ঘ) কোরয়েড বা কৃষ্ণমণ্ডল (Choroid) : এটি কালো রঙের একটি ঝিল্লি দ্বারা গঠিত শ্বেতমণ্ডলের ভিতরের গাত্রের আচ্ছাদনবিশেষ। এই কালো রঙের জন্য চোখের ভিতরে প্রবিষ্ট আলোকের প্রতিফলন হয় না।

(ঙ) আইরিস (Iris) : এটি কর্নিয়ার ঠিক পিছনে অবস্থিত একটি অস্বচ্ছ পর্দা। পর্দাটি স্থান ও লোকবিশেষে বিভিন্ন রঙের নীল, গাঢ়, বাদামি, কালো ইত্যাদি হয়ে থাকে।

(চ) মণি বা তারারন্ধ্র (Pupil) : এটি কর্নিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মাংসপেশিযুক্ত একটি গোলাকার ছিদ্রপথ। মাংসপেশির সংকোচন ও প্রসারণে তারারন্ধ্রের আকার পরিবর্তিত হয়।

(ছ) উত্তল লেন্স (Convex lens) : এটি কর্নিয়ার পিছনে অবস্থিত জেলির মতো নরম স্বচ্ছ পদার্থে তৈরি একটি উত্তল লেন্স।

(জ) অক্ষিপট বা রেটিনা (Retina) : এটি গোলকের পিছনে অবস্থিত একটি ঈষদচ্ছ গোলাপি আলোকগ্রাহী পর্দা। রেটিনার উপর আলো পড়লে স্নায়ুতন্ত্রে এক প্রকার উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং মস্তিষ্কে দর্শনের অনুভূতি জাগায়।

(ঝ) অ্যাকুয়াস হিউমার ও ভিট্রিয়াস হিউমার (Aqueous humour and vitreous humour) : লেন্স ও কর্নিয়ার মধ্যবর্তী স্থান এক প্রকার স্বচ্ছ জলীয় পদার্থে ভর্তি থাকে। একে বলা হয় অ্যাকুয়াস হিউমার। লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তী অংশে এক প্রকার জেলি জাতীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে। একে বলা হয় ভিট্রিয়াস হিউমার।

আলোক-চিত্রগ্রাহী ক্যামেরা (Photographic Camera)

এই যন্ত্রে আলোকিত বস্তুর চিত্র লেন্সের সাহায্যে আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেটের উপর গ্রহণ করা হয়। এই কারণে যন্ত্রটি আলোক-চিত্রগ্রাহী ক্যামেরা বা সংক্ষেপে ক্যামেরা নামে পরিচিত। ক্যামেরার বিভিন্ন অংশ হলো : (১) ক্যামেরা বাক্স (২) ক্যামেরা লেন্স (৩) রন্ধ্র বা ডায়াফ্রাম (৪) সাটার (৫) পর্দা (৬) আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেট এবং (৭) স্লাইড।

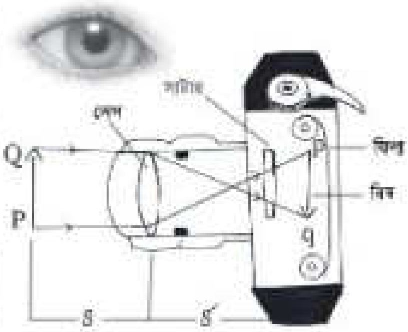

চিত্র ১১.১০ : আলোকচিত্রগ্রাহী ক্যামেরার গঠন

ক্রিয়া *(Action)* : কোনো বস্তুর ছবি তোলার পূর্বে ক্যামেরায় ঘষা কাচের পর্দাটি বসিয়ে যন্ত্রটিকে লক্ষবস্তু PQ এর দিকে ধরে সাটার খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর ক্যামেরা বাক্সের দৈর্ঘ্য কমিয়ে বাড়িয়ে এমন অবস্থায় রাখা হয়, যাতে লক্ষবস্তুর উল্টা প্রতিবিম্ব pq পর্দার উপর গঠিত হয়। ডায়াফ্রামের সাহায্যে প্রতিবিম্বটি প্রয়োজন মতো উজ্জ্বল করা হয়। এরপর ঘষা কাচের পর্দা সরিয়ে সাটার বন্ধ করা হয় এবং ঐ স্থানে আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেটসহ স্লাইড বসানো হয়। এখন স্লাইডের ঢাকনা সরিয়ে নিয়ে সাটার ও ডায়াফ্রামের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেটের উপর আলোক আপতিত হতে দিয়ে পুনরায় ডায়াফ্রাম বন্ধ করা হয়। এই প্রতিক্রিয়াকে এক্সপোজার বা আলোক সম্পাত (exposure) বলে। এই আপতিত আলোকে আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেটের রৌপ্য দ্রবণে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে। এবার স্লাইডের মুখের ঢাকনা বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেটটিকে স্লাইড হতে বের করে ডেভেলপার (developer) নামক এক প্রকার রাসায়নিক দ্রবণে ডুবিয়ে রাখা হয়। সিলভার হ্যালাইড ডেভেলপার বিজারণ (reduction) প্রক্রিয়ায় রৌপ্য ধাতবে পরিণত করে। লক্ষবস্তুর যে অংশ যত উজ্জ্বল, প্লেটের সেই অংশে তত রূপা জমা হয় এবং তত বেশি কালো দেখায়। আলোর তীব্রতা ও উন্মোচনকালের উপর রূপার স্তরের পুরুত্বের তারতম্য নির্ভর করে। এখন প্লেটটিকে পানিতে ধুয়ে হাইপো (Sodium thiosulphate) নামক দ্রবণে ডুবানো হয়। এতে প্লেটের যে যে অংশে আলো পড়ে না, সেই সকল অংশের সিলভার হ্যালাইড গলে যায়। অতঃপর পরিষ্কার পানি দ্বারা প্লেটটি ধুয়ে ফেলা হয়। এভাবে প্লেটে লক্ষবস্তুর একটি নেগেটিভ চিত্র পাওয়া যায়।

নেগেটিভ হতে প্রকৃত চিত্র অর্থাৎ পজিটিভ মুদ্রিত করার জন্য নেগেটিভের নিচে সিলভার হ্যালাইড দ্রবণের প্রলেপ দেওয়া ফটোগ্রাফের কাগজ স্থাপন করে অল্প সময়ের জন্য নেগেটিভের উপর আলোক সম্পাত করতে হয়। এরপর পূর্বের মতো হাইপোর দ্রবণে ফটোগ্রাফের কাগজ ডুবিয়ে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে পজিটিভ পাওয়া যায়।

ক্যামেরার সাথে মানব চক্ষুর তুলনা

ক্যামেরা	চক্ষু
১) এতে একটি রুদ্ধ আলোক প্রকোষ্ঠ থাকে যার ভিতর দিক কালো রঙে রঞ্জিত। কালো রঙের জন্য ক্যামেরার ভিতর প্রবিষ্ট আলোকের প্রতিফলন হয় না।	১) চোখের অক্ষিগোলকের কৃষ্ণ প্রাচীর রুদ্ধ আলোক প্রকোষ্ঠের মতো ক্রিয়া করে। এই প্রাচীরের জন্য চোখের ভিতর আলোকের প্রতিফলন হয় না।
২) ক্যামেরার সাটারের সাহায্যে লেন্সের মুখ যেকোনো সময়ের জন্য খোলা রাখা যায়।	২) চোখের পাতার সাহায্যে চক্ষু লেন্সের মুখ খোলা রাখা যায় কিন্তু চোখের পাতা সর্বক্ষণ খোলা রাখা যায় না।
৩) ডায়াফ্রামের বৃত্তাকার ছিদ্র পথ ছোট বড় করে প্রতিবিম্ব গঠনের উপযোগী প্রয়োজনীয় আলো ক্যামেরায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়।	৩) আপতিত আলোকের তীব্রতা ভেদে কর্নিয়ার ছিদ্র পথে আপনা আপনি সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে প্রতিবিম্ব গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আলোক প্রবেশ করতে দেয়।
৪) ক্যামেরায় অনেকগুলা লেন্স থাকে এবং প্রতিটি লেন্সের একটি নির্দিষ্ট ফোকাস দূরত্ব থাকে। লেন্সগুলো সামনে পিছনে করে লেন্স-ব্যবস্থার কার্যকারী ফোকাস দূরত্ব পরিবর্তন করা যায়।	৪) লেন্সের ফোকাস দূরত্ব এর সাথে যুক্ত পেশি বন্ধনীর সাহায্যে পরিবর্তন করা যায়।
৫) এটির অভিসারী লেন্সের সাহায্যে লক্ষবস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করা যায়।	৫) কর্নিয়া, অ্যাকুয়াস হিউমার, চক্ষু লেন্স, ভিট্রিয়াস হিউমার একত্রে একটি অভিসারী লেন্সের মতো ক্রিয়া করে লক্ষবস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন করে থাকে।
৬) আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেটে লক্ষবস্তুর একটি বাস্তব, উল্টা ও খাটো প্রতিবিম্ব ফেলা হয়।	৬) আলোক সুবেদী অক্ষিপটে লক্ষবস্তুর বাস্তব, উল্টা ও খাটো প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

নতুন শব্দ : আলোর প্রতিসরণ, পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন, সংকট কোণ।

এই অধ্যায় শেষে যা শিখলাম–

- একটি নির্দিষ্ট স্বচ্ছ মাধ্যমে আলো সরল রেখায় চলে, কিন্তু অন্য মাধ্যমে প্রবেশের সাথে সাথেই মাধ্যমের আলোকীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে এর দিক পরিবর্তন হয়।
- লম্বভাবে আলো এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে যাওয়ার সময় এর গতিপথের কোনো দিকের পরিবর্তন হয় না।
- আলোক রশ্মি যখন হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন এটি অভিলম্বের দিকে সরে আসে। আলোক রশ্মি যখন ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন এটি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়।

- পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের সময় ঘন মাধ্যমে আপতন কোণ অবশ্যই এই মাধ্যম দুটির সংকট কোণের চেয়ে বড় হতে হবে।
- মানব চক্ষুর কার্যপ্রণালি এবং আলোক চিত্রগ্রাহী ক্যামেরার মতো কার্যপ্রণালির বেশ কিছু সাদৃশ্য আছে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ **করো**

১. ভিন্ন মাধ্যমে আলোক রশ্মির গতিপথের দিক নির্ভর করে মাধ্যমের ———————— উপর।

২. অভিলম্ব বরাবর আপতিত আলোক রশ্মি———————— হয়ে নির্গত হয়।

৩. পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে———————— কোণ———————— কোণের চেয়ে বড় হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আলো ভিন্ন মাধ্যমে গতিপথ পরিবর্তন করে কেন?

২. সংকট কোণ কী? এটি কখন সৃষ্টি হয়?

৩. মানব চোখ ও ক্যামেরার অমিলগুলো কী কী?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. চোখের শ্বেতমণ্ডলের সামনের অংশকে কী বলে?

ক. লেন্স খ. রেটিনা

গ. কর্নিয়া ঘ. আইরিস

২. অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহৃত হয়–

i. জ্বালানি কাজে

ii. পাকস্থলী পর্যবেক্ষণে

iii. টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

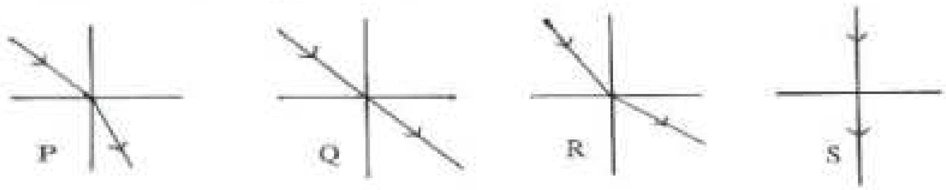

৩. কোন চিত্রে আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম হতে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করছে?

ক. P   খ. Q

গ. R   ঘ. S

৪. কোন চিত্রে আপাতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণের মান সমান–

ক. P ও R   খ. Q ও R

গ. Q ও S   ঘ. S ও P

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আনিস একদিন গোসল করতে পুকুর ঘাটে গেল। সে পুকুরের স্বচ্ছ পানিতে দৃশ্যমান সিঁড়িতে পা রাখল। কিন্তু সিঁড়িটি তার ধারণার চেয়ে নিচে থাকায় সে পড়ে গেল। অন্যদিকে তার ছোট ভাই পুকুরে সড়কি দিয়ে মাছ ধরতে গেল। কিন্তু সঠিক অবস্থানে সড়কি নিক্ষেপ না করায় সে মাছ ধরতে ব্যর্থ হলো।

ক. আলোর প্রতিসরণ কাকে বলে?

খ. আলোক রশ্মির দিক পরিবর্তনের কারণ কী?

গ. পুকুরে আনিসের পড়ে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করলে আনিসের ছোট ভাইয়ের মাছ শিকার করা সম্ভব হতো? যুক্তিসহ মতামত দাও।

২.

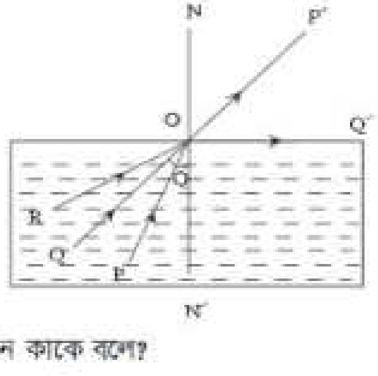

ক. পূর্ণ অভ্যন্তরীন প্রতিফলন কাকে বলে?

খ. অপটিক্যাল ফাইবার বলতে কী বোঝায়?

গ. RO রশ্মির গতিপথ চিত্র এঁকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. চিত্রে কোন রশ্মিটি সংকট কোণ তৈরি করে ব্যাখ্যা করো।

দ্বাদশ অধ্যায়

মহাকাশ ও উপগ্রহ

দিনের বেলা আকাশের দিকে তাকালে আমরা সূর্যকে দেখতে পাই। রাতের মেঘমুক্ত আকাশ আমাদের বিস্মিত করে। রাতের আকাশে থাকে চাঁদ ও মিটমিট করে জ্বলা অসংখ্য তারা। এদের সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে। আমাদের মাথার উপর রয়েছে অনন্ত আকাশ, সীমাহীন ফাঁকা জায়গা বা মহাকাশ। সূর্য, চাঁদ, গ্রহ, তারা, মহাকাশ, ছায়াপথ, গ্যালাক্সি ইত্যাদি দেখা না দেখা সবকিছুকে নিয়ে মহাবিশ্ব। মহাবিশ্বের সকল কিছুকে বলা হয় নভোমণ্ডলীয় বস্তু। এই অধ্যায়ে আমরা মহাবিশ্ব নিয়ে আলোচনা করব।

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- মহাকাশ এবং মহাবিশ্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উপগ্রহের কক্ষপথে চলার গতি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- কৃত্রিম উপগ্রহের অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

পাঠ ১ : মহাকাশ (Space)

আমরা আকাশের দিকে তাকালে দূর দূরান্তের অনেক বস্তু দেখতে পাই। দিনের আকাশের সূর্য রাতের আকাশের গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি আমাদের চোখে পড়ে। আমরা যদি দুরবীক্ষণ দিয়ে আকাশের দিকে তাকাই, আরও অনেক কিছু দেখতে পাই। বৃহস্পতি গ্রহ তার উপগ্রহসহ জ্বলজ্বল করতে থাকে। গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, গ্যালাক্সি ইত্যাদির মাঝখানে যে খালি জায়গা, তাকে মহাকাশ বা মহাশূন্য বলে। মহাকাশের দিকে তাকালে আমরা যেসব বস্তুকে দেখতে পাই তা হলো পদার্থ, যেমন আমাদের এই পৃথিবী।

মহাকাশ বা মহাশূন্যের শুরু কোথা থেকে

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর সাথেই মহাকাশে ঘুরছে। এজন্য বায়ুমণ্ডলকে মহাকাশের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। একে পৃথিবীর অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাহলে কোথা থেকে বায়ুমণ্ডলের শেষ এবং মহাকাশের শুরু? অধিকাংশ বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর বেশ কাছাকাছি। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে দূরত্ব যত বাড়তে থাকে, বায়ুমণ্ডল তত হালকা হতে থাকে এবং ১৬০ কিলোমিটারের পর বায়ুমণ্ডল থাকে না বললেই চলে। অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন যে, পৃথিবী থেকে ১৬০ কিলোমিটার উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের শেষ এবং মহাকাশের শুরু।

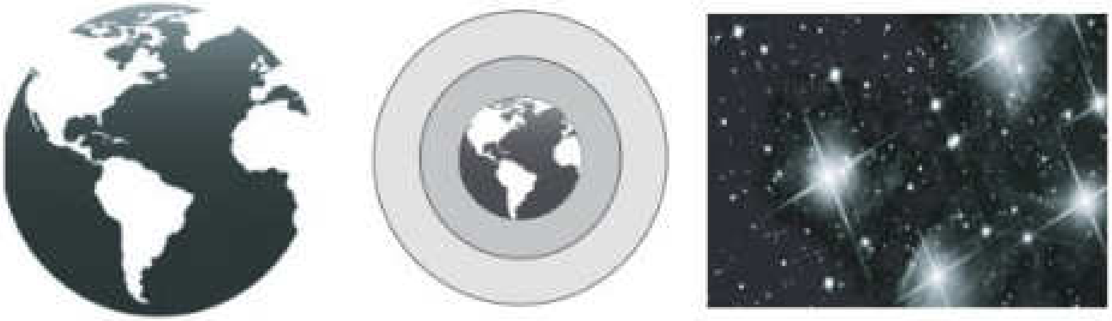

চিত্র ১২.১ : পৃথিবী, বায়ুমণ্ডল ও মহাকাশ

মহাকাশ কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত? মহাকাশের কি কোনো সীমা আছে? এক সময় মানুষ ভাবত, মহাকাশের সীমা আছে। তারা ভাবত যে, যত দূর পর্যন্ত সবচেয়ে দূরের বস্তুটি তারা দেখতে পায়, সে পর্যন্তই মহাকাশ বিস্তৃত এবং মহাকাশ বক্রাকৃতির। পরবর্তীতে দুরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর মানুষ তার দৃষ্টিসীমার বাইরের অনেক গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু ও গ্যালাক্সি দেখতে পেল।

> কাজ : বিভিন্ন বই ও ম্যাগাজিন থেকে জেনে নাও মহাকাশ কী? মহাকাশে কী কী আছে? সবকিছু তোমার খাতায় নোট করো। অন্য বন্ধুদের সংগৃহীত তথ্যের সাথে মিলিয়ে দেখ। কোনো অমিল পাওয়া গেলে তা শিক্ষকের উপস্থিতিতে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

পাঠ ২ : মহাবিশ্ব (Universe)

মহাবিশ্ব কী

এ সৃষ্টি জগতে যা কিছু আছে তার সবকিছু নিয়েই মহাবিশ্ব। ক্ষুদ্র পোকামাকড় ও ধূলিকণা থেকে শুরু করে আমাদের এই পৃথিবী, দূর-দূরান্তের গ্রহ-নক্ষত্র, ধূমকেতু, গ্যালাক্সি এবং দেখা না দেখা সবকিছু নিয়েই মহাবিশ্ব। মহাবিশ্ব যে কত বড় তা কেউ জানে না। কেউ জানে না মহাবিশ্বের আকার বা আকৃতি কেমন। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন মহাবিশ্বের শুরু ও শেষ নেই। তবে কেউ কেউ এখনও বিশ্বাস করেন মহাবিশ্বের আকার ও আকৃতি আছে। মানুষ প্রতিনিয়তই মহাবিশ্ব সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করছে। তবু, এর অনেক কিছুই এখনও অজানা রয়ে গেছে।

অনেক কিছু অজানা থাকলেও বিজ্ঞানীরা এটা জানতে পেরেছেন যে, মহাবিশ্বের কোনো কোনো অংশে বস্তু বা পদার্থের উপস্থিতি অন্য অংশের চেয়ে বেশি। যেসব অংশে পদার্থ বা বস্তু বেশি জড়ো বা ঘনীভূত হয়েছে, তাদের বলা হয় গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রজগৎ। গ্যালাক্সি হলো গ্রহ ও নক্ষত্রের এক বৃহৎ দল। আমাদের বাসভূমি পৃথিবী যে গ্যালাক্সিতে অবস্থিত তার নাম ছায়াপথ বা মিল্কিওয়ে। এরকম কোটি কোটি গ্যালাক্সি রয়েছে মহাবিশ্বে, যেখানে রয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্র।

গ্যালাক্সিগুলো মহাকাশে ঘুরে বেড়ায়। গ্যালাক্সির নক্ষত্রগুলোকে যত কাছাকাছি মনে হয়, আসলে তা নয়। এরা পরস্পর থেকে অনেক দূরে। এদের মধ্যকার দূরত্ব সম্পর্কে তোমাদের একটু ধারণা দেওয়া যাক। আমরা জানি যে, আলো এক সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার পথ যেতে পারে। পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে প্রায় ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড। অন্যদিকে সূর্য থেকে এর সবচেয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্র আলফা সেন্টোরিতে আলো পৌঁছাতে সময় লাগে ৪ বছরের চেয়ে বেশি। এক দূরবর্তী নক্ষত্র থেকে অন্য দূরবর্তী নক্ষত্রে আলোর পৌঁছাতে সময় লাগতে পারে কয়েক মিলিয়ন বছর। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ নক্ষত্রগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব কত বেশি আর মহাবিশ্ব কত বিশাল।

সৌরজগৎ মিল্কিওয়ে বা আকাশগঙ্গা (Milky Way) নামক গ্যালাক্সির অন্তর্গত। পৃথিবী থেকে নক্ষত্রগুলোকে মিটমিট করে জ্বলতে দেখা যায়। নক্ষত্রগুলো প্রত্যেকে এক একটি জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড বলে এদের সবারই আলো ও উত্তাপ আছে। মহাবিশ্বের নক্ষত্রগুলোকে তাদের আলোর তীব্রতা অনুসারে লাল, নীল, হলুদ ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণে ভাগ করা হয়েছে। অতি বৃহৎ নক্ষত্রের রং লাল, মাঝারি নক্ষত্রের রং হলুদ এবং ছোট নক্ষত্রের রং নীল হয়ে থাকে।

মহাবিশ্বের উৎপত্তি হলো কীভাবে

মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও বিকাশ সংক্রান্ত যেসব তত্ত্ব আছে, তার মধ্যে বহুল প্রচলিত হলো 'বিগব্যাং তত্ত্ব'। বাংলায় একে বলা হয় 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব'। এই তত্ত্ব মতে, মহাবিশ্ব একসময় অত্যন্ত উত্তপ্ত ও একক বিন্দুতে অসীম ঘনত্বের (Infinitely dense) অবস্থায় ছিলো। বিগব্যাং তত্ত্ব অনুসারে মহাবিশ্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে অতি দ্রুত প্রসারিত হয়ে যায়। দ্রুত প্রসারণের ফলে মহাবিশ্ব ঠান্ডা হয়ে যায় এবং বর্তমান প্রসারণশীল অবস্থায় পৌঁছায়। অতি সম্প্রতি জানা গেছে যে, বিগব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছিল প্রায় ১৩.৭৫ বিলিয়ন বছর

(১৩৭৫ কোটি বছর) পূর্বে এবং এটাই মহাবিশ্বের বয়স। বিগব্যাং তত্ত্ব একটি বহু পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যা বেশিরভাগ বিজ্ঞানী গ্রহণ করেছেন। এর কারণ, জ্যোতির্বিদদের পর্যবেক্ষিত প্রায় সকল ঘটনাই এই তত্ত্ব সঠিক ও ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। বর্তমান কালের বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংসহ সকল জ্যোতির্বিজ্ঞানী এই তত্ত্বের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

পাঠ ৩ : প্রাকৃতিক গ্রহ ও উপগ্রহ

আমরা আগেই বলেছি,যে গ্যালাক্সি বা ছায়াপথে আমরা বাস করি তার নাম আকাশ গঙ্গা (Milky Way)। এই ছায়াপথে রয়েছে আমাদের সূর্য ও এর পরিবার, যাকে সৌরজগৎ বলা হয়। সৌরজগতে রয়েছে সূর্য ও একে ঘিরে আবর্তনশীল ৮টি গ্রহ। যেসব বৃহৎ বস্তু সূর্যের চারদিকে ঘুরে তাদের বলা হয় গ্রহ। সূর্যকে ঘিরে আবর্তনশীল আটটি গ্রহ হলো বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন।

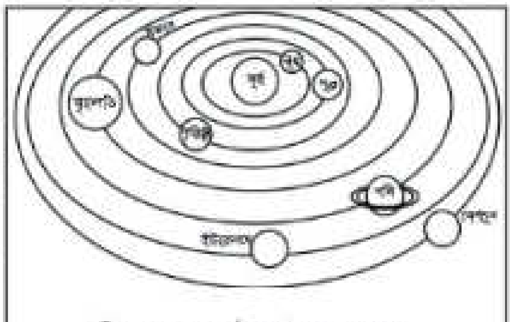

চিত্র ১২.২ : সৌরজগৎ এর মডেল

কোনো কোনো গ্রহের রয়েছে একাধিক উপগ্রহ। যারা গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘুরে এদের বলা হয় উপগ্রহ। যেমন পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে চাঁদ, তাই চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। সুতরাং, পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ এবং চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। নিচের কাজটি করো তাহলে গ্রহ ও উপগ্রহের গতি বুঝতে পারবে।

কাজ : গ্রহ ও উপগ্রহের আবর্তন সম্পর্কে জানা।

পদ্ধতি : শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে একটি ফাঁকা জায়গায় যাও। তোমার কোনো বন্ধুকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়াতে বলো। তাকে কেন্দ্র করে একটি বড় বৃত্ত আঁক। এই বৃত্তের রেখার উপর তুমি দাঁড়াও। এবার তোমার অন্য কোনো বন্ধুকে তোমাকে কেন্দ্র করে একটি ছোট বৃত্ত আঁকতে বলো। তোমার বন্ধুকে এই বৃত্তাকার পথে তোমার চারদিকে ঘুরতে বলো। এখন তুমি তোমাকে ঘিরে আবর্তনকারী বন্ধুসহ প্রথম বন্ধুর চারদিকে বড় বৃত্তপথে ঘুরতে থাক। এখানে তোমার প্রথম বন্ধু হলো সূর্য, তুমি হলে পৃথিবী আর তোমার দ্বিতীয় বন্ধু হলো চাঁদ; এইভাবে কল্পনা করতে পারো।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা, গ্রহের জন্মের সময় কোনো নক্ষত্রকে ঘিরে কয়েকটি মহাজাগতিক মেঘ আবর্তিত হতো। এরা মহাকর্ষ বলের কারণে ঘনীভূত হয়ে অবশেষে জমাট বেঁধে গ্রহে রূপান্তরিত হয়। এভাবেই আবার গ্রহের চারপাশে জমা হয়ে উপগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এসব উপগ্রহ হলো প্রাকৃতিক উপগ্রহ।

গ্রহ ও উপগ্রহের কোনো আলো ও উত্তাপ নেই। এদের উপর সূর্যের যে আলো পড়ে তা প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীর ১টি, মঙ্গলের ২টি, বৃহস্পতির ৬৭টি, শনির ৬২টি, ইউরেনাসের ২৭টি এবং নেপচুনের ১৪টি প্রাকৃতিক উপগ্রহ আছে।[1] এরা এদের গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে গ্রহের চারদিকে ঘুরে।

তথ্যসূত্র ১: www.encyclopediabritanica.com

পাঠ ৪ : কৃত্রিম উপগ্রহ ও এর ইতিহাস

মানুষের পাঠানো যেসব বস্তু বা মহাকাশযান পৃথিবীকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে তাদের বলা হয় কৃত্রিম উপগ্রহ। রকেটের সাহায্যে এদের উৎক্ষেপণ করা হয়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ বলের প্রভাবে চাঁদের মতো এরা এদের নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরে। কৃত্রিম উপগ্রহ চাঁদের তুলনায় অনেক ছোট এবং চাঁদের তুলনায় অনেক নিচু দিয়ে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে। নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরার জন্য এদের প্রয়োজনীয় দ্রুতি থাকতে হয়। পৃথিবী থেকে কৃত্রিম উপগ্রহের উচ্চতা যত বেশি হবে তার দ্রুতি হবে তত কম। ফলে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে এরা বেশি সময় নেবে। আমরা জানি পৃথিবী ২৪ ঘন্টায় এর নিজ অক্ষের চারদিকে একবার পাঁক খায়। সুতরাং, কোনো কৃত্রিম উপগ্রহ যদি ২৪ ঘন্টায় পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসে, তাহলে একে পৃথিবী থেকে স্থির বলে মনে হবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাকাশ যাত্রার ইতিহাস খুব একটা পুরোনো নয়, মোটামুটি নতুন। তোমরা জেনে অবাক হবে যে, মহাকাশযাত্রার প্রথম পদক্ষেপটির সূচনা হয়েছিল ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর। এই যাত্রার সূচনা করে তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়ন। তারা স্পুটনিক-১ নামক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে। স্পুটনিক শব্দের অর্থ হলো ভ্রমণসঙ্গী বা সহযাত্রী। একই বছর ২রা নভেম্বর স্পুটনিক-২ নামক আরেকটি কৃত্রিম উপগ্রহ তারা মহাকাশে পাঠান। প্রথম মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহের নাম এক্সপ্লোরার-১। এই উপগ্রহ ১৯৫৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি মহাকাশে পাঠানো হয়। ভস্টক-১ নামক সোভিয়েট কৃত্রিম উপগ্রহ মানুষ নিয়ে প্রথম পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। যে মানুষটি প্রথম মহাকাশে গিয়েছিলেন, তিনি হলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের ইউরি গ্যাগারিন। তিনি ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল ভস্টক-১ কৃত্রিম উপগ্রহে চড়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন। ভস্টক-৬ নামক কৃত্রিম উপগ্রহে (মহাকাশযান) চড়ে প্রথম সোভিয়েট নারী মহাকাশচারি ভেলেনটিনা তেরেসকোভা মহাকাশে ঘুরে আসেন ১৯৬৩ সালে। ইনটেলসেট-১ কৃত্রিম উপগ্রহকে পাঠানো হয় বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য যোগাযোগ উপগ্রহ হিসেবে। রিমোটসেনসিং বা দূর অনুধাবনের জন্য পাঠানো প্রথম উপগ্রহ হলো ল্যান্ডসেট-১। একে পাঠানো হয় ১৯৭২ সালে। আন্তর্জাতিক যোগসূত্র স্থাপনের জন্য অ্যাপোলো-সয়োজ টেস্ট প্রজেক্ট নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রথম পাঠানো হয় ১৯৭৫ সালে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এ পর্যন্ত হাজার হাজার কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে। কয়েক হাজার কৃত্রিম উপগ্রহ বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং হাজার হাজার অব্যবহৃত কৃত্রিম উপগ্রহ বা তাদের অংশবিশেষ মহাকাশে ধ্বংসাবশেষ হিসেবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

পাঠ ৫ : কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথে চলা বা ভ্রমণ

পৃথিবীর চারদিকে ঘুরার জন্য কেন্দ্রমুখি বল বা টানের প্রয়োজন হয়। কৃত্রিম উপগ্রহের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল বা অভিকর্ষ বলই এই কেন্দ্রমুখি বল জোগায়। উদাহরণস্বরূপ হিসাব করে দেখা গেছে যে, যদি কোনো কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর প্রায় ২৫০ কিলোমিটার উপরে তুলে পৃথিবী পৃষ্ঠের সমান্তরালভাবে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৮ কিলোমিটার বেগ দেওয়া যায় তবে কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকবে। কিন্তু এত উপরে তুলে কোনো বস্তুকে এত বেশি বেগ দেওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কারণ, বায়ুস্তরের সাথে তীব্র সংঘর্ষে এত তাপ উৎপন্ন হবে যে, বস্তুটি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এজন্য একাধিক রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় তুলে

পরে ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে প্রয়োজনীয় বেগ দেওয়া হয়। তখন কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে থাকে। কৃত্রিম উপগ্রহ কীভাবে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে তা জানতে নিচের কাজটি করো।

কাজ : পৃথিবীর চারদিকে কৃত্রিম উপগ্রহের আবর্তন সম্পর্কে জানা

পদ্ধতি : একটি টেনিস বলকে প্রায় ১ মিটার লম্বা একটি সুতার এক মাথায় শক্ত করে বাঁধ। এবার সুতার অপর মাথা এক হাতে শক্ত করে ধরে অপর হাতে বলটি ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে ছুড়ে দাও। দেখবে বলটি সামনের দিকে সামান্য গিয়ে বৃত্তাকার পথে যেতে চাইছে। সুতার মাথা ধরে বলটি ঘুরালে বলটি সুতার টানে বৃত্তাকার পথে ঘুরবে। এখানে তুমি হলে পৃথিবী, বলটি হলো কৃত্রিম উপগ্রহ এবং সুতার টান হলো অভিকর্ষ বল। বৃত্তাকার পথটি হলো কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ।

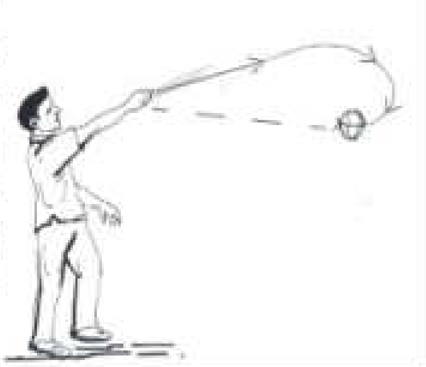

এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, উৎক্ষেপণের পর কৃত্রিম উপগ্রহ কেন পৃথিবীর চারদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে।

পাঠ ৬ ও ৭ : কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার ও গুরুত্ব

কৃত্রিম উপগ্রহ নানান রকম কাজে ব্যবহার করা হয়। ব্যবহার অনুসারে এদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন– যোগাযোগ উপগ্রহ, আবহাওয়া উপগ্রহ, পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী উপগ্রহ, সামরিক বা গোয়েন্দা উপগ্রহ, নৌপরিবহন উপগ্রহ, জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক উপগ্রহ, ইত্যাদি।

যোগাযোগ উপগ্রহ

আমরা অনেকে ইংল্যান্ড, আমেরিকা বা অন্য যেকোনো দেশে আত্মীয়–স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলে থাকি। আমরা যখন টেলিফোনে অন্য দেশের কারো সাথে কথা বলি, তখন আমাদের দেশের কোনো যোগাযোগের ডিশ এন্টেনা থেকে একটি বেতার সঙ্কেত কৃত্রিম উপগ্রহে প্রেরিত হয়। উপগ্রহটি সঙ্কেতটিকে অপর দেশের কোনো একটি ডিশ এন্টেনায় পাঠিয়ে দেয়, সেখান থেকে যার সাথে কথা বলছি তার টেলিফোনে পৌঁছায়।

এছাড়া আমরা বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ বা অলিম্পিক গেইম, ইত্যাদি টেলিভিশনে দেখে থাকি। অন্যদেশ থেকে একইভাবে বেতার সঙ্কেত কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে আমাদের টেলিভিশনে পৌঁছায়। যে দেশে খেলা হচ্ছে সে দেশ থেকে ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে একটি সঙ্কেত উপগ্রহে পাঠানো হয়। উপগ্রহ সঙ্কেতটি পুনরায় আমাদের দেশের কোনো ডিশ এন্টেনায় পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে আমাদের টেলিভিশনে পৌঁছে। কৃত্রিম উপগ্রহ এখানে রিলে স্টেশনের কাজ করে। এই উপগ্রহ টেলিভিশন প্রোগ্রাম ও টেলিফোন সংবাদ পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে বয়ে নিয়ে যায়। এর নাম তাই যোগাযোগ উপগ্রহ।

আবহাওয়া উপগ্রহ

আমরা টেলিভিশন ও রেডিওতে আবহাওয়ার খবর শুনি এবং পত্রিকায় আবহাওয়ার খবর পড়ি। এসব মাধ্যম আবহাওয়ার এই পূর্বাভাস কোথা থেকে পায়? আবহাওয়া উপগ্রহ আবহাওয়ার পূর্বাভাসদানকারী ব্যক্তিদের জানিয়ে দেয় ঐ দিনের বা পরবর্তী কয়েক দিনের আবহাওয়া কেমন হবে, কোথায় মেঘ সৃষ্টি হচ্ছে, কোন দিকে মেঘ যাচ্ছে বা কোথায় কখন বৃষ্টি হতে পারে। বায়ু প্রবাহ, সাইক্লোন সৃষ্টি হওয়া, মেঘ ঘনীভূত হওয়া, কোন দিকে আঘাত ঘূর্ণিঝড় হানতে পারে, তার সবকিছু এই উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ করে পূর্বাভাস দেওয়া যায়। এজন্য এই উপগ্রহের নাম আবহাওয়া উপগ্রহ।

পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী উপগ্রহ

এই উপগ্রহ পৃথিবীপৃষ্ঠের সুস্পষ্ট চিত্র দিতে পারে। সমুদ্রে কোন জাহাজ থেকে তেল চুইয়ে কোথায় পরিবেশ দূষণ করছে, কোন শহরের বায়ু দূষিত ও ময়লা তা এই উপগ্রহের সাহায্যে ছবি তুলে জানা যেতে পারে। কোন মাঠে ফসল ভালো হচ্ছে, কোনো ফসলে রোগবালাই বা পোকামাকড় আক্রমণ করেছে, তার তথ্য ও ছবি এই উপগ্রহ পাঠাতে পারে। বনে কোথায় আগুন লেগেছে, কোনো জাহাজের যাত্রাপথে হিমবাহ আছে কি না তা জানতে এই উপগ্রহ সহায়তা করতে পারে। মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ নির্ণয়ের জন্যও এই উপগ্রহ ব্যবহার করা হয়।

সামরিক বা গোয়েন্দা উপগ্রহ

গোয়েন্দার কাজ করার জন্য সামরিক বাহিনীতে এই উপগ্রহ ব্যবহার করা হয় তাই এর নাম গোয়েন্দা উপগ্রহ। প্রতিপক্ষ যোদ্ধারা কোথায় লুকিয়ে আছে, গোপনে তারা কোথাও অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে কি না, কোনো গোপন আক্রমণ হচ্ছে কি না ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহের জন্য এই উপগ্রহ ব্যবহার করা হয়।

নৌপরিবহন উপগ্রহ

আমরা গাড়ি, বিমান বা জাহাজে ভ্রমণ করে থাকি। বিশাল সমুদ্রে জাহাজ কী করে এর অবস্থান নির্ণয় করে? কোন বিমান আকাশে কোথায় আছে তা কী করে জানে? এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাবার সময় কী করে বুঝতে পারে কোথায় আছে? গাড়ি, সামুদ্রিক জাহাজ ও বিমান এদের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য নৌপরিবহন উপগ্রহের সহায়তা নিয়ে থাকে।

জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক উপগ্রহ

এই উপগ্রহে রাখা টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণযন্ত্র মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিভিন্ন অজানা তথ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দিয়ে থাকে।

নতুন শব্দ

মহাবিশ্ব, গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ, আকাশ গঙ্গা, কৃত্রিম উপগ্রহ।

এই অধ্যায় শেষে যা শিখলাম–

- গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি, ইত্যাদি যে স্থানে থাকে তাকে মহাকাশ বা মহাশূন্য বলে।
- সূর্য, চাঁদ, গ্রহ, তারা, মহাকাশ, ছায়াপথ, ইত্যাদি দেখা না দেখা সবকিছুকে নিয়ে মহাবিশ্ব।
- মহাবিশ্বের যেসব অংশে পদার্থ বা বস্তু বেশি জড়ো বা ঘনীভূত হয়েছে তাদের বলা হয় গ্যালাক্সি ।
- যে গ্যালাক্সিতে আমরা বাস করি তার নাম আকাশগঙ্গা। এই ছায়াপথেই রয়েছে সৌরজগৎ ।
- সূর্য একটি নক্ষত্র। সূর্যের রয়েছে আটটি গ্রহ। এরা হলো– বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন।
- নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে যে বৃহৎ বস্তু ঘুরে তাদের বলা হয় গ্রহ। গ্রহকে কেন্দ্র করে যারা ঘুরে তাদের বলা হয় উপগ্রহ।
- মানুষের পাঠানো যেসব মহাকাশযান পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে তাদের বলা হয় কৃত্রিম উপগ্রহ।
- কাজ অনুসারে কৃত্রিম উপগ্রহের নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন– যোগাযোগ উপগ্রহ, আবহাওয়া উপগ্রহ, পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী উপগ্রহ, সামরিক বা গোয়েন্দা উপগ্রহ, নৌপরিবহন উপগ্রহ, জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক উপগ্রহ, ইত্যাদি।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ **করো**

১. ________ গ্যালাক্সিসমূহ বিচরণশীল।

২. গ্রহকে আবর্তনকারী বস্তুদের বলা হয় ________ ।

৩. সৌরজগৎ যে গ্যালাক্সিতে রয়েছে তার নাম ________ ।

৪. মানুষের তৈরি ________ হলো কৃত্রিম উপগ্রহ।

৫. যে নারী প্রথম ________ ভ্রমণ করেছেন তার নাম ভেলেনটিনা তেরেসকোভা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মহাকাশ ও মহাশূন্যের মধ্যে পার্থক্য কী?

২. মহাবিশ্বের বিশালতা ব্যাখ্যা করো।

৩. গ্যালাক্সি কী? আমরা কোন গ্যালাক্সিতে বাস করি?

৪. সৌরজগৎ কাকে বলে? এখানে কোন কোন গ্রহ আছে?

৫. কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চারদিকে কেন ঘুরে?

৬. উপগ্রহ মানুষের অনেক কাজে লাগে– ব্যাখ্যা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বৃহস্পতি গ্রহের কয়টি উপগ্রহ?

ক. ১৪টি খ. ২৭টি
গ. ৬২টি ঘ. ৬৭টি

২. গ্যালাক্সি হলো–

i. মহাবিশ্বের কোনো স্থানে ঘনীভূত পদার্থের আধিক্য
ii. গ্রহ, নক্ষত্রের মাঝে অবস্থিত খালি জায়গা
iii. নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণকারী জ্যোতিষ্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

নিচের ছকটি অবলম্বনে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

কৃত্রিম উপগ্রহ	কাজ
M	জাহাজের যাত্রাপথে হিমবাহের উপস্থিতি নির্ণয়
N	আকাশে বিমানের অবস্থান নির্ণয়
O	মহাবিশ্ব সম্পর্কে অজানা তথ্য নির্ণয়
P	ফসলে পোকামাকড়ের আক্রমণের তথ্য ও ছবি সংগ্রহ

৩. N উপগ্রহটি কোনটি?

ক. যোগাযোগ উপগ্রহ খ. নৌ-পরিবহন উপগ্রহ
গ. জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক উপগ্রহ ঘ. পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী উপগ্রহ

৪. ছকে উল্লিখিত কাজের ভিত্তিতে কোন দুটি উপগ্রহ একই প্রকৃতির?

ক. M ও N খ. N ও O
গ. O ও P ঘ. M ও P

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মাছ ধরার নৌকার মালিক বকর সওদাগর রেডিওতে শুনতে পেলেন, বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণে ঘূর্ণিঝড় ঘনীভূত হচ্ছে। যেকোনো সময় উপকূলে আঘাত হানতে পারে। কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে তিন নম্বর বিপদ সঙ্কেত দেখাতে বলা হয়েছে এবং মাছ ধরার নৌকাকে উপকূলের কাছাকাছি থাকতে বলা হয়েছে।

ক. কৃত্রিম উপগ্রহ কাকে বলে?
খ. মহাবিশ্ব বলতে কী বোঝায়?
গ. রেডিও অফিসের ঘূর্ণিঝড় ঘনীভূত হওয়ার তথ্য পাওয়াতে বকর সওদাগরের কী উপকার হলো?
ঘ. আবহাওয়া বার্তাটি বকর সওদাগর ও উপকূলবাসীদের কীভাবে সতর্ক করতে পারে। ব্যাখ্যা করো।

২.

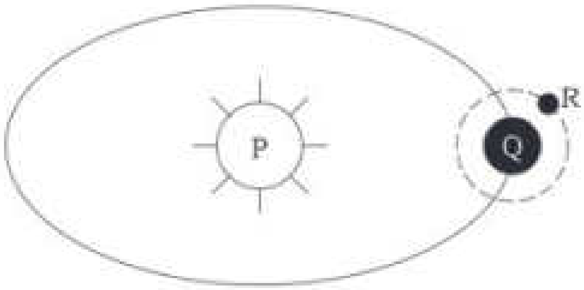

ক. মহাশূন্য কাকে বলে?
খ. চাঁদ ও কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করো।
গ. P কোন ধরনের জ্যোতিষ্ক? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. P, Q ও R সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করো।

প্রজেক্ট : শিক্ষকের সহায়তায় সৌরজগতের একটি মডেল তৈরি করো।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

খাদ্য ও পুষ্টি

বর্তমানে পৃথিবীতে বাস করছে লাখ লাখ বিভিন্ন জাতের প্রাণী। এদের আকার-আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য যেমন ভিন্নতর তেমন বিচিত্র এদের জীবনধারা, স্বভাব, খাদ্য ও খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি। দেহের বৃদ্ধি, শক্তি ও বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি প্রাণীর খাদ্য অপরিহার্য। অতএব মানবদেহকে সুস্থ-সবল রাখার জন্যও খাদ্য অপরিহার্য। খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা অর্জন করা দেহকে সুস্থ রাখার পূর্বশর্ত। আমিষ, শর্করা, তেল ও চর্বি ইত্যাদি জৈবযৌগ আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি। আর এ সকল খাদ্য থেকে পুষ্টি পাই। খাদ্য বলতে সেই সকল জৈব উপাদানকে বোঝায় যেগুলো জীবের দেহ গঠন, ক্ষয়পূরণ ও শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। আর এ খাদ্য থেকে জীব পুষ্টি লাভ করে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিগুণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পুষ্টির অভাবজনিত রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা করতে পারব;
- চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য নির্বাচন করতে পারব।

পাঠ ১ : পুষ্টি, পুষ্টিমান ও খাদ্য উপাদান

ইঞ্জিন চালানোর জন্য কয়লা, ডিজেল, পেট্রোল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি উপাদান ব্যবহার করা হয়। বলতে পারো, এ জ্বালানিগুলোর কাজ কী? এ জ্বালানিগুলো পুড়ে শক্তি উৎপন্ন করে। আর এ শক্তি যানবাহনগুলোকে গতি দান করে। যানবাহনগুলো চলতে থাকে। মানবদেহকে একটি ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করা হয়। অন্যান্য ইঞ্জিনের মতো আমাদের দেহ নামক ইঞ্জিনটি চালানোর জন্য চাই শক্তি। মানবদেহ এ শক্তি কোথা থেকে পায়? খাদ্য আমাদের দেহের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে ও শক্তি যোগায়। খাদ্যের মূল উৎস সজীব দেহ। খাদ্য মূলত বিভিন্ন যৌগের সমন্বয়ে গঠিত। আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে মূলত খাদ্য পাই। খাদ্য বলতে সেই জৈব উপাদানকে বোঝায় যা জীবের দেহ গঠন ও শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। খাদ্যের মধ্যে যে সকল উপাদান বা পুষ্টিদ্রব্য থাকে তা আমাদের দেহে প্রধানত তিনটি কাজ করে। যথা–

- জীবের বৃদ্ধি সাধন, ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- তাপশক্তি ও কর্মশক্তি প্রদান।
- রোগ প্রতিরোধ, সুস্থতা বিধান ও শারীরবৃত্তীয় কাজ (যেমন : পরিপাক, শ্বসন, রেচন ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ করে।

পুষ্টি ও পুষ্টিমান

পুষ্টি একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াতে খাদ্যবস্তু খাওয়ার পরে পরিপাক হয় এবং জটিল খাদ্য উপাদানগুলো তেজো শোষণ উপযোগী সরল উপাদানে পরিণত হয়। দেহ এসব সরল উপাদান শোষণ করে নেয়। শোষণের পরে খাদ্য উপাদানগুলো দেহের সকল কোষে পৌঁছায়। এর ফলে দেহের প্রতিটি অঙ্গের ক্ষয়প্রাপ্ত কোষের পুনর্গঠন ও দেহের বৃদ্ধির জন্য নতুন কোষ গঠন করে। তাছাড়া তাপ উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুষ্টি যোগায়। দেহে খাদ্যের এই সকল কাজই পুষ্টি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। অর্থাৎ পুষ্টি উপাদান হচ্ছে প্রতিদিনের খাবারের গুণসম্পন্ন সেসব উপাদান, যা দেহের শক্তি ও যথাযথ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে মেধা ও বুদ্ধি বাড়ায়, রোগ প্রতিরোধ করে, অসুখ-বিসুখ থেকে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে সাহায্য করে এবং মানুষকে কর্মক্ষম করে।

কোন খাদ্যে কী পরিমাণ ও কত রকম খাদ্য উপাদান থাকে তার উপর নির্ভর করে ঐ খাদ্যের পুষ্টিমান বা পুষ্টিমূল্য। যেমন– সিদ্ধ চালে ৭৯% শ্বেতসার, ৬% স্নেহ পদার্থ থাকে। এছাড়া সামান্য পরিমাণ আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে। ১০০ গ্রাম চাল থেকে ৩৪৫-৩৪৯ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। সিদ্ধ চালে শ্বেতসার, আমিষ ও ভিটামিন থাকে। কিন্তু এতে শ্বেতসারের পরিমাণ বেশি থাকে। অতএব চাল একটি শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ।

কোনো খাদ্য উপাদানের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে জানতে হলে ঐ খাদ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। খাদ্যের প্রকৃতি বলতে এটা কি মিশ্র খাদ্য, নাকি বিশুদ্ধ খাদ্য তাকে বোঝায়। মিশ্র খাদ্যে একের অধিক পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকে। যেমন– দুধ, ডিম, খিচুরি, পেয়ারা ইত্যাদি। অন্যদিকে বিশুদ্ধ খাদ্যে শুধুমাত্র একটি উপাদান থাকে। যেমন– চিনি, গ্লুকোজ। এতে শর্করা ছাড়া আর কোনো উপাদান থাকে না।

খাদ্য উপাদান

খাদ্য অনেকগুলো রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এ রাসায়নিক উপাদানগুলোকে খাদ্য উপাদান বলা হয়। কেবলমাত্র একটি উপাদান দিয়ে গঠিত–এমন খাদ্যবস্তুর সংখ্যা খুবই কম। উপাদান অনুযায়ী খাদ্যবস্তুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

১. আমিষ বা প্রোটিন– ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও দেহ গঠন করে।
২. শর্করা বা শ্বেতসার বা কার্বোহাইড্রেট– শক্তি উৎপাদন করে।
৩. স্নেহ বা চর্বি বা লিপিড – তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে।

এছাড়া অন্যান্য তিন প্রকার উপাদান বিশেষ প্রয়োজন। যথা–

১. খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন – রোগ প্রতিরোধ, শক্তি বৃদ্ধি, বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উদ্দীপনা যোগায়।
২. খনিজ লবণ – বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।
৩. পানি – দেহে পানির সমতা রক্ষা করে, কোষের গুণাবলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোষ অঙ্গাণুসমূহকে ধারণ ও তাপের সমতা রক্ষা করে।

পাঠ ২ ও ৩ : শর্করা ও আমিষ

শর্করা বা শ্বেতসার

আমরা নাস্তায় রুটি, মুড়ি, চিড়া, পাঁউরুটি ইত্যাদি খাই। এগুলো শর্করা জাতীয় খাদ্য। শর্করা শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলোর মধ্যে শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে। শর্করা সহজপাচ্য। সব শর্করাই কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই তিনটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। শর্করা দেহের কর্মক্ষমতা যোগায়। গ্লুকোজ এক ধরনের সরল শর্করা।

চিত্র ১৩.১ : শর্করা জাতীয় খাদ্য

রাসায়নিক গঠনপদ্ধতি অনুসারে সব শর্করাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। একটি মাত্র শর্করা অণু দিয়ে গঠিত হয় মনোস্যাকারাইড। একে সরল শর্করাও বলে। দ্বি-শর্করা ও বহু শর্করা পরিপাকের মাধ্যমে সরল শর্করায় পরিণত হয়ে দেহের শোষণযোগ্য হয়। মানবদেহ পরিপুষ্টির জন্য সরল শর্করা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানবদেহ শুধুমাত্র সরল শর্করা গ্রহণ করতে পারে। (গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, গ্যালাকটোজ এ তিনটি শর্করার মধ্যে গ্লুকোজ রক্তের মাধ্যমে সারা দেহে পরিবাহিত হয়।)

শর্করা, স্নেহ ও আমিষের মধ্যে শর্করা সর্বাপেক্ষা সহজপাচ্য। দেহে শোষিত হওয়ার পর শর্করা খুব কম সময়ে তাপ উৎপন্ন করে দেহে শক্তি যোগায়। ১ গ্রাম শর্করা ৪ কিলোক্যালরি তাপ উৎপন্ন করে। মানবদেহে প্রায় ৩০০–৪০০ গ্রাম শর্করা জমা থাকতে পারে। এ পরিমাণ শর্করা ১২০০–১৬০০ কিলোক্যালরি তাপ উৎপন্ন করে দেহের শক্তি যোগায়।

বয়স, দেহের ওজন, উচ্চতা, পরিশ্রমের মাত্রার উপর শর্করার চাহিদা নির্ভর করে। একজন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের দৈনিক শর্করার চাহিদা তার দেহের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের ৪.৬ গ্রাম হয়ে থাকে। একজন ৬০ কেজি ওজনের পুরুষ মানুষের গড়ে দৈনিক শর্করার চাহিদা = (৬০×৪.৬) গ্রাম বা ২৭৬ গ্রাম। আমাদের মোট প্রয়োজনীয় ক্যালরির শতকরা ৬০–৭০ ভাগ শর্করা হতে গ্রহণ করা দরকার।

কাজ : শর্করা বা শ্বেতসারের উপস্থিতি নির্ণয়

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ভাতের মাড়, টেস্ট টিউব, আয়োডিন, পানি ও ড্রপার

পদ্ধতি : সামান্য পরিমাণ ভাতের মাড় একটি টেস্টটিউবে নাও এবং এর সাথে সামান্য পরিমাণ পানি মেশাও। এবার এর ভিতর দুই–তিন ফোঁটা আয়োডিন দ্রবণ মেশাও। কী ঘটে দেখ? দ্রবণটি নীল বর্ণ ধারণ করবে। এ থেকে উক্ত দ্রবণে শর্করা বা শ্বেতসারের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

অভাবজনিত রোগ

আহারে কম বা বেশি শর্করা গ্রহণ উভয়ই দেহের জন্য ক্ষতিকর। শর্করার অভাবে অপুষ্টি দেখা দেয়। রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে দেহে বিপাক ক্রিয়ার সমস্যা সৃষ্টি হয়। রক্তে শর্করার মাত্রা কমে গেলে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার (hypoglycemia) লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন– ক্ষুধা অনুভব করা, বমি বমি ভাব, অতিরিক্ত ঘামানো, হৃৎকম্পন হঠাৎ বেড়ে বা কমে যাওয়া।

আমিষ বা প্রোটিন

আমিষ আমাদের দেহের গঠন উপাদান। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও সালফারের সমন্বয়ে আমিষ গঠিত। আমিষে ১৬% নাইট্রোজেন থাকে। পুষ্টি বিজ্ঞানে আমিষ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। আমিষ হলো অ্যামাইনো এসিডের একটি জটিল পলিমার। পরিপাক প্রক্রিয়া দ্বারা এটি দেহে শোষণ উপযোগী অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয়। এ পর্যন্ত প্রকৃতিজাত দ্রব্যে ২২ প্রকার অ্যামাইনো এসিডের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমরা বাংলা বা ইংরেজি বর্ণমালাগুলো সাজিয়ে যেমন অসংখ্য শব্দ গঠন করতে পারি, তেমনি ২২টি অ্যামাইনো এসিড বিভিন্ন সংখ্যায় এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে মিলিত হয়ে আমিষের উৎপত্তি ঘটায়। এ কারণে মাছ, দুধ, মাংস ইত্যাদি খাবারের স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণের তারতম্য দেখা যায়।

দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও নাইট্রোজেনের সমতা রক্ষার জন্য অ্যামাইনো এসিড অত্যন্ত প্রয়োজন। কিছু কিছু অ্যামাইনো এসিডকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড বলে। অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড দেহে তৈরি হয় না। খাদ্য থেকে এ অ্যামাইনো এসিডগুলো সংগ্রহ করতে হয়।

অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের অভাব ঘটলে নানা রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন– বমি বমি ভাব, মূত্রে জৈব এসিডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, নাইট্রোজেনের ভারসাম্য বজায় না থাকা ইত্যাদি।

চিত্র ১৩.২ : আমিষ জাতীয় খাদ্য

সব আমিষ দেহে সমান পরিমাণে শোষিত হয় না। আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করার পর এর শতকরা যত ভাগ অন্ত্র থেকে দেহে শোষিত হয়, তত ভাগকে সেই আমিষের সহজপাচ্যতার গুণক ধরা হয়। সহজপাচ্যতার উপর

আমিষের পুষ্টিমান নির্ভর করে। যে আমিষ শতকরা ১০০ ভাগই দেহে শোষিত হয় এবং দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণে কাজ করে তার সহজপাচ্যতার গুণক ১। এক্ষেত্রে আমিষ গ্রহণ এবং দেহের ধারণের পরিমাণ সমান। সহজ অর্থে বলতে গেলে যতটুকু আমিষ গ্রহণ করা হয়, তার সম্পূর্ণটাই দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণে কাজ করে। আর তা না হলে সহজপাচ্যতার গুণক ১ হতে কম হয়। মায়ের দুধ ও ডিমের আমিষের সহজপাচ্যতার গুণক ১। অন্যান্য সব আমিষেরই সহজপাচ্যতার গুণক ১ হতে কম।

কাজ : আমিষের উপস্থিতি নির্ণয়

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ডিমের সাদা অংশ, চামচ, পানি, টেস্টটিউব, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, কপারসালফেট

পদ্ধতি : সামান্য পরিমাণ আমিষ জাতীয় খাদ্য (ডিমের সাদা অংশ) চামচ দিয়ে মেশাতে হবে। ভালো করে মিশিয়ে ফেলার জন্য সামান্য পরিমাণ পানি মেশানো যেতে পারে। এবার টেস্টটিউবে সামান্য পরিমাণ আমিষের দ্রবণ নাও। উক্ত দ্রবণে কয়েক ফোঁটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণ এবং কয়েক ফোঁটা কপার সালফেট দ্রবণ মেশাও। এতে উক্ত দ্রবণে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছ কি?

আমিষের দ্রবণের সাথে রাসায়নিক দ্রব্যগুলো মিশানোর পর দ্রবণটি বেগুনি রং ধারণ করেছে। এভাবে উক্ত দ্রবণে আমিষের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

আমিষের অভাবজনিত রোগ

খাদ্যে পরিমিত প্রয়োজনীয় জৈব আমিষ বা মিশ্র আমিষ না থাকলে শিশুর দেহে আমিষের অভাবজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিশু পুষ্টিহীনতায় ভুগলে দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। শিশুদের কোয়াশিয়রকর ও মেরাসমাস রোগ দেখা দেয়।

কোয়াশিয়রকর রোগের লক্ষণ

- শিশুদের খাওয়ায় অরুচি হয়।
- পেশি শীর্ণ ও দুর্বল হতে থাকে, ত্বক এবং চুলের মসৃণতা ও রং নষ্ট হয়ে যায়।
- ডায়রিয়া রোগ হয়, শরীরে পানি আসে।
- পেট বড় হয়।

উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা এ রোগ নিরাময় হলেও দেহে মানসিক স্থবিরতা আসে। কোয়াশিয়রকর রোগ মারাত্মক হলে শিশুর মৃত্যুও হতে পারে।

মেরাসমাস রোগের লক্ষণ

- আমিষ ও ক্যালরি উভয়েরই অভাব ঘটে, ফলে দেহের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।
- শরীর ক্ষীণ হয়ে অস্থিচর্মসার হয়।
- চামড়া বা ত্বক খসখসে হয়ে ঝুলে পড়ে।
- শরীরের ওজন হ্রাস পায়।

শিশুদের জন্য এরূপ অবস্থা বিপজ্জনক। এছাড়া প্রোটিনের অভাবে বয়স্কদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ও রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়।

পাঠ ৪ ও ৫ : স্নেহ পদার্থ

একে শক্তি উৎপাদনকারী উপাদান বলা হয়। স্নেহ পদার্থে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে। কার্বনের দহন ক্ষমতা বেশি থাকায় স্নেহ পদার্থের অণু থেকে বেশি তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। স্নেহ পদার্থ ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌগ। স্নেহ পদার্থ পরিপাক হয়ে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হয়। ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের ভিতরে অবস্থিত লসিকা নালির মাধ্যমে শোষিত হয়। স্নেহ পদার্থে ২০ প্রকার ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়। ফ্যাটি এসিড দুই প্রকার। যথা–

১. অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ও ২. সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড।

দেহে যকৃতের মধ্যে ফ্যাটি এসিড তৈরি হয়। তবে যকৃতের ফ্যাটি এসিড তৈরির ক্ষমতা অত্যন্ত কম। অন্যদিকে কিছু কিছু ফ্যাটি এসিড আছে যা দেহের জন্য অত্যাবশ্যক। এগুলো প্রধানত উদ্ভিজ্জ তেলে পাওয়া যায়। খাদ্যে স্নেহ পদার্থের পরিমাণ দ্বারা এর উপকারিতা যাচাই করা যায় না। যে স্নেহ জাতীয় খাদ্যে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড বেশি থাকে, তা বেশি উপকারী। যেমন– সয়াবিন তেল, সূর্যমুখী তেল, তিলের তেল, ভুট্টার তেল ইত্যাদি। এসব তেল দিয়ে তৈরি খাবার উৎকৃষ্টতর স্নেহ জাতীয় খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। যেমন– মেয়নিজ, সালাদ ড্রেসিং, কাসুন্দি, তেলের আচার ইত্যাদি উৎকৃষ্টতর স্নেহ জাতীয় খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। যেসব খাদ্যে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড বেশি থাকে সে সকল খাদ্যগুলোকে স্নেহবহুল খাদ্য বলা হয়। যেমন– মাংস, মাখন, পনির, ডালডা, চকলেট, বাদাম ইত্যাদি। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে দৈনিক মোট শক্তির ২০%–৩০% শক্তি স্নেহ থেকে পাওয়া যায়। দৈনিক আহার্যে এমন স্নেহযুক্ত খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যা অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড যোগাতে পারে এবং ভিটামিন দ্রবণে সক্ষম হয়।

খাদ্যে স্নেহ পদার্থের অভাব ঘটলে দেহের চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের অভাব পরিলক্ষিত হয় ফলে ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়। যেমন– ত্বক শুষ্ক ও খসখসে হয়ে দেহের সৌন্দর্য নষ্ট করে, অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিডের অভাবে শিশুদের একজিমা রোগ হয় ও বয়স্কদের চর্মরোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়।

চিত্র ১৩.৩ : চর্বি জাতীয় খাদ্য

কাজ : স্নেহ পদার্থের উপস্থিতি নির্ণয়

প্রয়োজনীয় উপকরণ : সয়াবিন তেল, ইথানল ও পানি

পদ্ধতি : একটি টেস্টটিউবে কয়েক ফোঁটা সয়াবিন তেল নাও। এর ভিতর সামান্য ইথানল মিশাও। এবার টেস্টটিউবটিকে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নাও। এবার দ্রবণটিতে সামান্য পানি মিশিয়ে টেস্টটিউবটি আবার ঝাঁকিয়ে নাও। কী ঘটে লক্ষ করো। তেলের দ্রবণটি ঘোলাটে বর্ণ ধারণ করবে।

এভাবে সরিষা, নারিকেল ও তিলের তেলের সাহায্যে উক্ত পরীক্ষাটি করো এবং কী ঘটে তা বর্ণনা করো।

খাদ্যের ক্যালরি ও কর্মশক্তি

শর্করা, আমিষ ও স্নেহ পদার্থ খাদ্যের এ তিনটি উপাদান থেকে দেহে তাপ উৎপন্ন হয়। এ তাপ আমাদের দেহে কাজ করার শক্তি যোগায়। কোনো খাদ্যে পুষ্টি উপাদান ও তার পরিমাণ জানার জন্য শর্করা, আমিষ ও চর্বির ক্যালরিমূল্য বের করতে হয়। এ ক্ষেত্রে ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানির ক্যালরিমূল্য শূন্য ধরে হিসেব করতে হবে।

আমাদের দেহে
১ গ্রাম শর্করা থেকে ৪ কিলোক্যালরি
১ গ্রাম আমিষ থেকে ৪ কিলোক্যালরি এবং
১ গ্রাম চর্বি থেকে ৯ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়।

আমাদের দেহের ভিতর খাদ্য পরিপাক, শ্বসন, রক্তসংবহন ইত্যাদি কার্যক্রম বিপাক ক্রিয়ার (metabolism) অন্তর্গত। বিপাক ক্রিয়া চালানোর জন্য যে শক্তি প্রয়োজন তাকে মৌলবিপাক বলে। আবার শারীরিক পরিশ্রমেও আমাদের শক্তি ব্যয় হয়। পুনরায় আমরা খাবার থেকে শক্তি পাই।

খাদ্য থেকে দেহের ভিতর যে তাপ উৎপন্ন হয় তা আমরা ক্যালরিতে প্রকাশ করি। ১০০০ ক্যালরিতে ১ কিলোক্যালরি। খাদ্যে তাপশক্তি মাপের একক হলো কিলোক্যালরি। দেহের শক্তির চাহিদাও কিলোক্যালরিতে নির্ণয় করা হয়।

আমার, তোমার, তোমার ছোট ভাই, তোমার বাবার দেহের ক্যালরি চাহিদা এক রকম নয়। আমাদের দেহে দুই ভাবে শক্তি ব্যয় হয় যথা– ১. দেহের অভ্যন্তরীণ কাজে অর্থাৎ মৌলবিপাকে এবং ২. পরিশ্রমের কাজে। প্রতিদিন কার কত ক্যালরি বা তাপ শক্তির প্রয়োজন তা নির্ভর করে প্রধানত বয়স, দৈহিক উচ্চতা এবং দৈহিক ওজনের উপর। এছাড়া বিভিন্ন পেশা এবং স্ত্রী–পুরুষ ভেদে দৈনিক ক্যালরি চাহিদা কম বা বেশি হয়ে থাকে।

নিচের সারণীতে ক্যালরির ব্যবহার ও খাদ্য চাহিদা দেখানো হলো

শিশু, নারী ও পুরুষের বিভিন্ন বয়সে দৈনিক ক্যালরির বরাদ্দ

বয়স (বছর)	গড় ওজন (কিলোগ্রাম)	গড় শক্তি (কিলোক্যালরি)	বয়স (বছর)	গড় ওজন (কিলোগ্রাম)	গড় শক্তি (কিলোক্যালরি)
বাচ্চা			নারী		
০-৫ মাস	৬	১১৫	১০-১২	৩০	১৯০০
৬মাস-১ বছর	৯	১০০	১৩-১৫	৪২	২২০০
শিশু			১৬-১৯	৫১	২১০০
১ – ৩	১৩	১৩০০	২০-৩৯	৫৪	২০০০
৪ – ৬	২০	১৫০০	৪০-৪৯	৫৩	১৯০০
৭ – ১০	২৮	১৮০০	৫০-৫৯	৫২	১৮০০
			৬০-৬৯	৫১	১৬০০
পুরুষ			৭০+	৫১	১৪০০
১০ – ১২	৪০	২২০০			
১৩ – ১৫	৪৪	২৫০০	সন্তান সম্ভবা		
১৬ – ১৯	৬৭	৩০০০	মাতার		
২০ – ৩৯	৬৭	২৭০০	অতিরিক্ত চাহিদা		
৪০ – ৪৯	৭০	২৪০০	প্রথম ৩ মাসে		+১৫০
৫০ – ৫৯	৬৮	২৩০০	দ্বিতীয় ৩ মাসে		+২০০
৬০ – ৬৯	৬৫	২২০০	তৃতীয় ৩ মাসে		+৩০০
৭০ +	৬৫	১৯০০	প্রসূতি মাতার		+৪০০
			অতিরিক্ত		
			চাহিদা		

একজন লোকের কী পরিমাণ শক্তি দরকার তা আমরা কেমন করে জানতে পারব? একজন লোকের দৈনিক কী পরিমাণ শক্তির দরকার তা প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ১. মৌলবিপাক ২. দৈহিক পরিশ্রম ও ৩. খাদ্যের প্রভাব।

দৈনিক খাদ্য আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী হওয়া উচিত। খাদ্য নির্বাচনের সময় আমাদের লক্ষ রাখতে হবে যে, খাদ্য থেকে দেহ যেন প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্যালরি পেতে পারে এবং ভিটামিন, খনিজ লবণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো যেন এতে থাকে।

পাঠ ৬ : খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন

বিভিন্ন পরীক্ষা–নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করেছেন যে, খাদ্যে শর্করা, আমিষ, স্নেহ পদার্থ, খনিজ লবণ ছাড়াও আরও কতগুলো সূক্ষ্ম উপাদানের প্রয়োজন। এর অভাবে শরীর নানা রোগে (যেমন– রাতকানা, বেরিবেরি, স্কার্ভি ইত্যাদি) আক্রান্ত হয়। ভিটামিন বলতে আমরা খাদ্যের ঐ সব জৈব রাসায়নিক পদার্থকে বুঝি, যা খাদ্যে সামান্য পরিমাণে উপস্থিত থাকে। ভিটামিনসমূহ প্রত্যক্ষভাবে দেহ গঠনে অংশগ্রহণ না করলেও এদের অভাবে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন বা তাপশক্তি উৎপাদন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্রিয়াগুলো সুসম্পন্ন হতে পারে না।

ভিটামিনের প্রকারভেদ : দ্রবণীয়তার গুণ অনুসারে ভিটামিনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. স্নেহ জাতীয় পদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন– এ, ডি, ই, এবং কে।

২. পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন– ভিটামিন বি–কমপ্লেক্স এবং সি।

ভিটামিনের উৎস : গাছের সবুজ পাতা, কচি ডগা, হলুদ ও সবুজ বর্ণের সবজি, ফল ও বীজ ইত্যাদি অংশে ভিটামিন থাকে।

ভিটামিন এ

উৎস : মাছের তেল ও প্রাণিজ স্নেহে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। ক্যারোটিন সমৃদ্ধ বা শাকসবজি যেমন– লালশাক, পুঁইশাক, পালংশাক, টমেটো, গাজর, বীট ও মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন– পেঁপে, আম, কাঁঠালে ভিটামিন 'এ' থাকে। মলা ও ঢেলা মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' থাকে।

কাজ : দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক রাখা, ত্বক ও শ্লেষ্মাঝিল্লিকে সুস্থ রাখা এবং দেহকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা করা, খাদ্যদ্রব্য পরিপাক ও ক্ষুধার উদ্রেক করা, রক্তে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা ও দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

অভাবজনিত রোগ

১. রাতকানা : এ রোগের লক্ষণ স্বল্প আলোতে, বিশেষ করে রাতে আবছা আলোতে দেখতে না পাওয়া। শিশুরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। দীর্ঘদিন ধরে এ অবস্থা চলতে থাকলে চোখ সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ রোগে আক্রান্ত শিশুকে সবুজ শাকসবজি ও রঙিন ফলমূল খাওয়ানো উচিত। ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল রাতকানা রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। আমাদের দেশে টিকা দিবসে বিভিন্ন টিকা কেন্দ্রে শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

২. জেরপথালমিয়া : ভিটামিন 'এ' এর অভাব ঘটলে চোখের কর্নিয়ার আচ্ছাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কর্নিয়ার উপর শুষ্ক স্তর পড়ে। তখন চোখ শুকিয়ে যায় এবং পানি পড়া বন্ধ হয়ে যায়। চোখে আলো সহ্য হয় না, চোখে পুঁজ জমে এবং চোখের পাতা ফুলে যায়। এ অবস্থায় উপযুক্ত চিকিৎসা করালে এ রোগ থেকে উপশম পাওয়া যেতে পারে। তবে সময় মতো চিকিৎসা না হলে শিশু অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এ ছাড়া ভিটামিন 'এ' এর অভাব ঘটলে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সর্দি, কাশি ইত্যাদি রোগ হতে পারে।

ভিটামিন বি–কমপ্লেক্স

ভিটামিন বি–কমপ্লেক্স এর কাজ হলো, বিশেষ বিশেষ এনজাইমের অংশ হিসেবে আমিষ, শর্করা ও স্নেহ পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করে এদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে মুক্ত হতে সাহায্য করা।

ভিটামিন বি$_১$ (থায়ামিন) : এর প্রধান কাজ হলো শর্করা বিপাকে অংশগ্রহণ করে শক্তিমুক্ত করা। তাছাড়া এটি স্বাভাবিক ক্ষুধা বজায় রাখতে এবং স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় রাখতে সহায়তা করে।

ভিটামিন বি$_২$ (রিবোফ্লেবিন) : অ্যামাইনো এসিড, ফ্যাটি এসিড ও কার্বোহাইড্রেটের বিপাকে অংশ নিয়ে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে।

ভিটামিন বি$_৬$ (পাইরিডক্সিন) : শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে।

ভিটামিন বি$_{১২}$ (সায়ানোকোবালামিন) : লোহিত রক্তকণিকা বৃদ্ধি ও উৎপাদনে সহায়তা করে। শ্বেত রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

পাঠ ৭ : ভিটামিন 'সি'

দেহের জন্য ভিটামিন 'সি' অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। এ ভিটামিন পানিতে দ্রবীভূত হয় এবং সামান্য তাপেই নষ্ট হয়ে যায়। ভিটামিন 'সি' দেহে জমা থাকে না তাই প্রতিদিন খাওয়া দরকার। টক জাতীয় ফল আমলকী, আনারস, পেয়ারা, কমলালেবু, লেবু, আমড়া ইত্যাদি ফলে প্রচুর ভিটামিন 'সি' থাকে। সবুজ শাকসবজি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, লেটুসপাতা থেকে আমরা ভিটামিন 'সি' পাই। পাকা ফল অপেক্ষা কাঁচা সবজি ও ফলে এ ভিটামিন বেশি থাকে।

ভিটামিন 'সি' পেশি ও দাঁত মজবুত করে, ক্ষত নিরাময় ও চর্মরোগ রোধে সহায়তা করে, কণ্ঠনালি ও নাকের সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

অভাবজনিত রোগ

প্রাপ্ত বয়স্কদের দেহে ভিটামিন 'সি'–এর অভাব প্রকট হলে নিচের লক্ষণগুলো দেখা দেয় :

- হাড়ের গঠন শক্ত ও মজবুত হতে পারে না।
- হাড় দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে যায়।
- ত্বক খসখসে হয় ও চুলকায়। ত্বকে ঘা হলে সহজে তা শুকাতে চায় না।

স্কার্ভি

- দাঁতের মাড়ি ফুলে নরম হয়ে যায়।
- দাঁতের গোড়া আলগা হয়ে যায় এবং গোড়া থেকে রক্ত পড়ে।
- দাঁতের এনামেল উঠে যায়, এতে অকালে দাঁত পড়ে যেতে পারে। শিশু ও বয়স্কদের এ রোগ বেশি হয়।
- গ্রন্থি ফুলে যায় এবং মুখে ব্যথা হয়।
- রক্তক্ষরণ সহজে বন্ধ হয় না, ঘা শুকাতে দেরি হয়।
- অন্যান্য রোগ বিশেষ করে সর্দি, কাশি খুব সহজে আক্রমণ করে।

প্রতিকার

এ অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

প্রতিরোধ

কোলের শিশুকে মায়ের দুধের সঙ্গে অন্যান্য পরিপূরক খাদ্য যেমন- ফলের রস, সবজির স্যুপ ইত্যাদি খাওয়াতে হবে।

ভিটামিন 'ডি'

ভোজ্য তেল, দুগ্ধ ও দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য, বিভিন্ন মাছের তেল, ডিমের কুসুম, মাখন, ঘি, চর্বি এবং ইলিশ মাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়।

কাজ

- অস্থি ও দাঁতের কাঠামো গঠন।
- অন্ত্রে ক্যালসিয়াম শোষণ বাড়ায়।
- রক্ত প্রবাহে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

অভাবজনিত রোগ

ভিটামিন 'ডি' এর অভাবে আয়রন বা লৌহের শোষণ, সঞ্চয় ও হিমোগ্লোবিন তৈরিতে বিঘ্ন ঘটে।

রিকেটস

রিকেটস রোগের লক্ষণ

- ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়ামের প্রভাবে শিশুদের হাড় নরম হয়ে যায় এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
- পায়ের হাড় ধনুকের মতো বেঁকে যায় এবং দেহের চাপে অন্যান্য হাড়গুলোও বেঁকে যায়।
- হাত–পায়ের অস্থিসন্ধি বা গিট ফুলে যায়।
- বুকের হাড় বা পাঁজরের হাড় বেঁকে যায়।

প্রতিকার

এ অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

প্রতিরোধ

শিশুকে ভিটামিন 'ডি' সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ানো উচিত। সূর্যরশ্মির প্রভাবে আমাদের ত্বকের কোলেস্টেরল থেকে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। তাই শিশুকে কিছুক্ষণের জন্য রৌদ্রে খেলাধুলা করতে দেওয়া উচিত।

অস্টিওম্যালেশিয়া

বয়স্কদের রিকেটস অস্টিওম্যালেশিয়া নামে পরিচিত। এই রোগের লক্ষণগুলো নিম্নরূপ –

- ভিটামিন 'ডি' এর অভাবে ক্যালসিয়াম শোষণে বিঘ্ন ঘটে।
- ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের সঞ্চয় কমতে থাকে।
- থাইরয়েড গ্রন্থির কাজের পরিবর্তন ঘটে।
- অস্থি দুর্বল হয়ে অস্থির কাঠিন্য কমে যায় এবং হালকা আঘাতেই অস্থি ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে।

প্রতিকার

উপরের লক্ষণগুলো দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন 'ডি' যুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে উক্ত উপাদানগুলোর জন্য ঔষধ সেবন করা একান্ত জরুরি।

প্রতিরোধ

- শিশুকাল থেকেই ভিটামিন 'ডি' ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া সুনিশ্চিত করতে হবে।
- শিশুদেরকে কিছুক্ষণের জন্য রৌদ্রে খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে হবে।

ভিটামিন 'ই'

ভোজ্যতেল ভিটামিন 'ই' এর সবচেয়ে ভালো উৎস। শস্যদানা, যকৃৎ, মাছ-মাংসের চর্বিতে ভিটামিন 'ই' পাওয়া যায়।

কাজ

- ভিটামিন 'ই' কোষ গঠনে সহায়তা করে।
- শরীরের কিছু ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।
- খুব কম ক্ষেত্রে ভিটামিন 'ই' এর অভাব ঘটে এবং এর অভাবজনিত লক্ষণও কম।

ভিটামিন 'কে'

সবুজ রঙের শাকসবজি, লেটুসপাতা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ডিমের কুসুম, সয়াবিন তেল এবং যকৃতে ভিটামিন 'কে' পাওয়া যায়।

কাজ

- দেহে ভিটামিন 'কে' প্রথ্রোম্বিন নামক প্রোটিন তৈরি করে।
- প্রথ্রোম্বিন রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

অভাবজনিত সমস্যা

যকৃৎ থেকে পিত্তরস নিঃসৃত হয়। পিত্তরস নিঃসরণে অসুবিধা হলে ভিটামিন কে-এর শোষণ কমে যায়। ভিটামিন 'কে'- এর অভাবে ত্বকের নিচে ও দেহাভ্যন্তরে যে রক্ত ক্ষরণ হয়, তা বন্ধ করার ব্যবস্থা না নিলে রোগী মারা যেতে পারে। এই ভিটামিনের অভাবে অপারেশনের রোগীর রক্তক্ষরণ সহজে বন্ধ হতে চায় না। এতে রোগীর জীবন নাশের আশংকা বেশি থাকে।

নিচের ছকটি পূরণ করো

ভিটামিন	উৎস	কাজ	অভাবজনিত রোগ
'এ'			
'সি'			
'ডি'			
'কে'			

পাঠ ৮ : খনিজ লবণ

ভাত এবং তরকারির সাথে আমরা প্রত্যহ খাবার লবণ খাই। এছাড়া আরও অনেক প্রকার লবণ আছে যা আমাদের দেহের জন্য অতীব প্রয়োজন। খাদ্যে খনিজ লবণ, আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থের মতো দেহে তাপ উৎপন্ন করে না। কিন্তু দেহকোষ ও দেহে তরলের জন্য খনিজ লবণ একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, ক্লোরিন, আয়োডিন, লৌহ, সালফার ইত্যাদি লবণ জাতীয় দ্রব্য খাদ্যের সাথে দেহে প্রবেশ করে ও দেহ গঠনে সাহায্য করে। এসব উপাদান দেহে মৌলিক উপাদান হিসেবে থাকে না, অন্য পদার্থের সঙ্গে জৈব ও অজৈব যৌগরূপে থাকে। প্রধানত দুই ভাবে খনিজ লবণ দেহে কাজ করে। যথা– দেহ গঠন উপাদানরূপে ও দেহ অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। মাংস, ডিম, দুধ, সবুজ শাকসবজি এবং ফল খনিজ লবণের প্রধান উৎস।

খনিজ লবণ দেহ গঠন ও দেহের অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, অস্থি, দাঁত, এনজাইম ও হরমোন গঠনের জন্য খনিজ লবণ অপরিহার্য উপাদান, স্নায়ু উদ্দীপনা ও পেশি সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে, দেহের জলীয় অংশে সমতা রক্ষা করে ও বিভিন্ন এনজাইম সক্রিয় রাখে।

মানবদেহে খনিজ লবণের প্রয়োজনীয়তা

ক্যালসিয়াম দাঁত ও হাড় গঠনে, রক্ত জমাট বাঁধতে, স্নায়ু ব্যবস্থায় সুষ্ঠু কাজ সম্পাদনে সহায়তা করে। ফসফরাস দাঁত ও হাড় গঠন, ফসফোলিপিড তৈরি করে। লৌহ রক্তের লোহিত রক্তকণিকা গঠন, এনজাইমের কার্যকারিতায় সহায়তা করে। আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ ও বিপাকের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়তা করে। দেহের অধিকাংশ কোষ ও দেহরসের জন্য সোডিয়াম প্রয়োজন। পেশি সংকোচনে পটাশিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠ ৯ : অভাবজনিত রোগ

রিকেটস : দেহে ভিটামিন 'ডি'–এর সঙ্গে ক্যালসিয়াম শোষিত হয়। এই ভিটামিনের অভাবে রিকেটস রোগ হয়। ভিটামিন অংশে এর বর্ণনা তোমরা পড়েছ।

গলগন্ড : গলগন্ড রোগকে ঘ্যাগ বলে। আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে রংপুর, দিনাজপুর, জামালপুর ও ময়মনসিংহে এ রোগের প্রকোপ বেশি। যখন আমাদের রক্তে কোনো কারণে আয়োডিনের অভাব ঘটে, তখন গলায় অবস্থিত থাইরয়েড গ্রন্থি ক্রমশ আকারে বড় হতে থাকে। গলা ফুলে যায়। একে গলগন্ড বা ঘ্যাগ বলে। এ রোগের লক্ষণগুলো নিম্নরূপ :

- থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যায়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।
- শ্বাস–প্রশ্বাসের সময় শব্দ হয়।
- গলার আওয়াজ ফ্যাঁসফেসে হয়ে যায়।
- গলায় অস্বস্তিবোধ হয়, খাবার গিলতে কষ্ট হয়।
- আক্রান্ত ব্যক্তি অবসাদ ও দুর্বলতাবোধ করে।

প্রতিকার

রোগের প্রাথমিক অবস্থায় আয়োডিনযুক্ত লবণ, সামুদ্রিক মাছ, মাছের তেল ও সামুদ্রিক শৈবাল ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

ক্রেটিনিজম

সাধারণত আয়োডিনের অভাবে শিশুদের এ রোগ হয়। এই রোগে আক্রান্ত শিশুর দেহে যে লক্ষণগুলো দেখা দেয় তা হলো–

- দেহের বৃদ্ধি ধীরে হয়।
- পুরু ত্বক, মুখমণ্ডলের পরিবর্তন দেখা দেয়।
- পুরু ঠোঁট, বড় জিহ্বা, মানসিক প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

প্রতিকার

যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা করা হলে শিশুদের দৈহিক অসুবিধাগুলো দূর হয় ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঠিক রাখা যায়।

প্রতিরোধ

খাবারে আয়োডিনযুক্ত লবণ নিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

রক্তাল্পতা বা এ্যানিমিয়া

আয়রন বা লৌহ, লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের গঠন উপাদান। শিশু ও সন্তান সম্ভবা মায়ের খাদ্যে লৌহের ঘাটতির জন্য রক্তাল্পতা দেখা যায়। সাধারণত শিশুদের পেটে কৃমি হলে রক্তাল্পতা দেখা দিতে পারে। এর লক্ষণগুলো হলো –

- দুর্বলতাবোধ, মাথা, গা ঝিমঝিম করা।
- বুক ধড়ফড় করা।
- মাথা ঘোরানো, অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে উঠা।
- ওজন হ্রাস ও খাওয়ায় অরুচি দেখা দেয়।

প্রতিকার

লৌহ সমৃদ্ধ শাকসবজি, ফল, মাংস, ডিমের কুসুম, যকৃৎ ও বৃক্ক ইত্যাদি বেশি করে খাওয়া। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করা। রোগ কঠিন আকার ধারণ করলে হৃৎপিণ্ডের দ্রুত রক্ত সঞ্চালন ও হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পানি

পানি জীবন ধারণের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান। প্রাণী দেহের শতকরা ৬০–৭০ ভাগই পানি। দেহ গঠনে পানির প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। এ পানি অস্থি, মাংস, ত্বক, নখ, দাঁত ইত্যাদি কোষের ভিতরে ও বাইরে থাকে। প্রায় সব খাদ্যেই কম–বেশি পানি থাকে। তবে আমরা আলাদাভাবে পানি পান করে দেহের চাহিদা মেটাই।

দেহ গঠন ছাড়াও পানি দেহের সব অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। পানি ছাড়া দেহের ভিতরে কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া হতে পারে না। পানি দেহে দ্রাবক রূপে কাজ করে। বিভিন্ন খনিজ লবণ পানিতে দ্রবীভূত থাকে। পানিতে দ্রবণীয় অবস্থায় খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া চলে। আবার পানিতে দ্রবীভূত থেকেই খাদ্য উপাদান দেহে শোষিত হয়।

কাজ

- পানির জন্যই রক্ত সঞ্চালন ও তাপ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়।
- পানি দেহ থেকে দূষিত পদার্থ অপসারণ করে। যেমন– মূত্র ও ঘাম।

কলেরা ও ডায়রিয়া রোগে মলের সঙ্গে বা বমির সঙ্গে দেহ থেকে হঠাৎ বেশ কিছু পানি বের হয়ে যায়। ফলে দেহে পানি শূন্যতার সৃষ্টি হয়। কলেরা বা ডায়রিয়া রোগ হলে রোগীকে স্যালাইন বা লবণ পানির শরবত খাওয়াতে হবে। এটা কলেরা বা ডায়রিয়া সবচেয়ে সহজ চিকিৎসা। এছাড়া আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণাকেন্দ্র কর্তৃক তৈরি খাওয়ার স্যালাইনের প্যাকেট পাওয়া যায়। প্যাকেটের স্যালাইন পানিতে গুলে রোগীকে খাওয়াতে হয়। সম্প্রতি শস্য স্যালাইন নামক আর একটি খাওয়ার স্যালাইন উদ্ভাবিত হয়েছে। ১ লিটার পানি, ৫০ গ্রাম চালের গুঁড়া ও এক চিমটি লবণ মিলিয়ে এ স্যালাইন তৈরি করা হয়।

> **কাজ :** তোমরা পূর্বের শ্রেণিতে খাবার স্যালাইন বানাতে শিখেছ। এবার তোমরা পুনরায় খাবার স্যালাইন তৈরি করো। স্যালাইন তৈরির সময় তোমরা কী কী সাবধানতা অবলম্বন করবে তা লিপিবদ্ধ করবে।

শুষ্কতা

কোনো কারণে দেহে পানির পরিমাণ কমে গেলে কোষগুলোতে পানির স্বল্পতা দেখা দেয়। কোষের পানি কমে গেলে অতিরিক্ত পিপাসা হয়, রক্তের চাপ কমে যায়, রক্ত সঞ্চালনে অসুবিধা হয়, বিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। পানির অভাবে দেহের ওজন কমে যায় এবং পেশি ও স্নায়ুকোষ দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহে পানির পরিমাণ ২০ শতাংশের নিচে নেমে গেলে দেহের স্বাভাবিক কাজে বিঘ্ন ঘটে, ফলে রোগী অচেতন হয়ে পড়ে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

রাফেজ বা আঁশযুক্ত খাদ্য

শস্যদানা, ফলমূল, সবজির অপাচ্য অংশকে রাফেজ বলে। দেহের ভিতর রাফেজের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। রাফেজ কোনো পুষ্টি উপাদান নয়। তবে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাফেজ পৌষ্টিক নালির ভিতর দিয়ে সরাসরি স্থানান্তরিত হয়। ফল ও সবজির রাফেজ, সেলুলোজ নির্মিত কোষপ্রাচীর। আঁশযুক্ত খাবার থেকে রাফেজ পাওয়া যায়।

খাদ্য নির্বাচন

যে সমস্ত খাদ্যবস্তু দেহের ক্যালরি চাহিদা পূরণ করে, টিস্যু কোষের বৃদ্ধি ও গঠন বজায় রাখে এবং দেহের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাকে সুষম খাদ্য বলে। অর্থাৎ সুষম খাদ্য বলতে বোঝায় ৬টি উপাদান বিশিষ্ট পরিমাণ মতো খাবার, যা ব্যক্তিবিশেষের দেহের চাহিদা মেটায়। বয়স, লিঙ্গভেদ, দৈহিক অবস্থা, শ্রমের পরিমাণ হিসেবে পুষ্টির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো উপযুক্ত পরিমাণে সুষম খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে। যে শর্ত পালনে খাবার সুষম হয় সেগুলো হলো–

১. প্রতিবেলার খাবারে আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থ এই তিনটি শ্রেণির খাবার অন্তর্ভুক্ত করে খাদ্যের ছয়টি উপাদানের অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করা।

২. প্রত্যেক শ্রেণির খাদ্য বয়স, লিঙ্গ ও জীবিকা অনুযায়ী সরবরাহ করা।

৩. দৈনিক ক্যালরি ৬০–৭০% শর্করা, ১০% আমিষ ও ৩০–৪০% স্নেহ জাতীয় পদার্থ থেকে গ্রহণ করা।

সুষম খাদ্য তালিকা

কতগুলো নিয়ম মেনে একটি সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করতে হবে। যথা–

১. প্রথমত খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলো ব্যক্তিবিশেষের বয়স, কর্ম ও শারীরিক অবস্থাভেদে যে বিভিন্ন ধরনের হয় সেদিকে লক্ষ রেখে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করা।

২. দৈহিক প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যের তাপমূল্য বা ক্যালরি তাপ শক্তির পরিমাণ নিশ্চিতকরণ।

৩. খাদ্যে দেহ গঠনের ও ক্ষয়পূরণের উপযোগী আমিষ সরবরাহ করা।

৪. খাদ্যে যথোপযুক্ত ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানির উপস্থিতি।

৫. বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান ও খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন। প্রথমে খাদ্যের মূল বিভাগগুলো থেকে খাদ্য বাছাই করা। খাদ্য বাছাইয়ে বৈচিত্র্য থাকা।

৬. খাদ্য তালিকা প্রস্তুতির সময় খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতন থাকা।

৭. ব্যক্তি ও পরিবারের আর্থিক সঙ্গতির দিক ভেবে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করা।

৮. ঋতু ও আবহাওয়ার কথা চিন্তা করে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করা।

নতুন শব্দ : আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, সহজ পাচ্যতার গুণক, অ্যামাইনো এসিড, কোয়াশিয়রকর, মেরাসমাস, জেরপথালমিয়া, স্কার্ভি, রিকেট্স, অস্টিওম্যালেশিয়া, প্রথ্রোম্বিন, ক্রেটিনিজম, এ্যানিমিয়া

এ অধ্যায় শেষে আমরা যা শিখলাম–

- বিপাকক্রিয়া চালানোর জন্য যে শক্তি প্রয়োজন তাকে মৌলবিপাক বলে।
- ভিটামিন ও খনিজ লবণ আলাদা কোনো খাদ্য নয়। এগুলো অন্য খাদ্য উপাদান থেকে পাওয়া যায়।
- পানি দেহের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরিপাককৃত খাদ্য উপাদান পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় দেহের সর্বত্র পরিবাহিত হয়।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কিলোক্যালরি কী?

২. ভিটামিন 'এ'–র অভাবে কী কী অসুবিধা দেখা দেয়?

৩. রিকেটস রোগের লক্ষণগুলো কী কী?

৪. রক্তে হিমোগ্লোবিনের প্রয়োজনীয়তা কী?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে?

ক. পানি খ. ভিটামিন
গ. স্নেহপদার্থ ঘ. খনিজ লবণ

২. কোন ভিটামিনের অভাবে শিশুদের রিকেটস রোগ হয়?

ক. ভিটামিন এ খ. ভিটামিন সি
গ. ভিটামিন ডি ঘ. ভিটামিন ই

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সুমি টক খেতে পছন্দ করে না। এমনকি সে সবুজ শাকসবজি এবং টমেটোও খায় না। ইদানীং দেখা যাচ্ছে তার দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ছে।

৩. সুমির কী রোগ হয়েছে?

ক. স্কার্ভি খ. রিকেটস
গ. মেরাসমাস ঘ. কোয়াশিয়রকর

৪. উদ্দীপকের খাদ্যগুলোর অভাবে বয়স্কদের–

i. হাড় নরম হয়ে যায়

ii. ত্বক চুলকায় এবং ঘা হয়

iii. বুকের হাড় ও পাঁজরে ব্যথা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. তালহা ইদানীং কিছুই খেতে চায় না। তার খাওয়ায় অরুচি এবং বমি বমি ভাব হয়। তার ত্বক খসখসে হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার তাকে ডিম ও দুধ বেশি করে খেতে বললেন।

ক. খাদ্য কী?

খ. পুষ্টি বলতে কী বোঝায়?

গ. ডাক্তার তালহাকে উল্লিখিত খাবারগুলো খেতে বললেন কেন?

ঘ. ডাক্তারের পরামর্শমতো খাবার না খেলে পরবর্তীতে তালহার আরও কী সমস্যা হতে পারে? বিশ্লেষণ করো।

২. নূরজাহান বেগম তার আট বছরের ছেলে বকুলের দৈহিক বৃদ্ধি নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। তিনি তার শারীরিক বৃদ্ধি ও সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য তাকে বিশেষ ধরনের খাবার খাওয়াতে শুরু করেন। তবে তিনি নিজের এবং বকুলের বাবা, দাদা ও দাদীর খাদ্য তালিকায় ভিন্ন ধরনের খাবার রাখেন।

ক. প্রোটিন কী?

খ. রাফেজ বলতে কী বোঝায়?

গ. নূরজাহান বেগম বকুলের খাদ্য তালিকা কীভাবে তৈরি করেন? বর্ণনা করো।

ঘ. নূরজাহান বেগমের পরিবারের সদস্যদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য নির্বাচনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো।

চতুর্দশ অধ্যায়

পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্র

আমাদের চারপাশের সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ তা তোমরা জানো। আরও জানো, একটি স্থানে যে সকল জড়বস্তু ও জীব থাকে সেগুলো নিয়েই সেখানকার পরিবেশ গড়ে উঠে। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, এই ভূমণ্ডলে বিভিন্ন পরিবেশ রয়েছে। এসব পরিবেশকে আমরা স্বাদু পানি, লোনা পানি ও স্থল এই প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। এই তিন রকমের পরিবেশের প্রত্যেকটিতে স্বতন্ত্র ধরনের অজীব ও জীব উপাদান থাকে।

এসব অজীব ও জীব উপাদানসমূহ একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তোমরা জানো, পরিবেশের জীব উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী। জীবন ধারণের জন্য এসকল উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- বাস্তুতন্ত্রের উপাদান ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- খাদ্যশৃঙ্খল ও খাদ্যজাল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- জীবে বাস্তুতন্ত্রের অবদান উপলব্ধি করব এবং সুরক্ষায় অন্যদের সচেতন করতে পারব।

পাঠ ১ : বাস্তুতন্ত্র

পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন জীব বসবাস করে। প্রতিটি বাসস্থানের বিভিন্ন এলাকায় জলবায়ু, আবহাওয়া ও অন্যান্য অজীব এবং জীব উপাদানের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। এসব পার্থক্যের কারণে পৃথিবীজুড়ে স্থানভেদে বিচিত্র সব জীবের বসতি। বনজঙ্গলে তুমি যে ধরনের জীব দেখবে, পুকুরে বসবাসরত জীব তাদের থেকে ভিন্ন। এসব পরিবেশের জীব ও অজীব উপাদানের মধ্যে রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক। আবার একটি পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবন ধারণের জন্য একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। এভাবে যে কোনো একটি পরিবেশের অজীব এবং জীব উপাদানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া, আদান-প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশে যে তন্ত্র গড়ে উঠে, তাই বাস্তুতন্ত্র নামে পরিচিত।

পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাবে বাস্তুতন্ত্রের সকল উপাদানের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে। তোমার বাড়ি অথবা বিদ্যালয়ের কাছের বাগান একটি ছোট বাস্তুতন্ত্রের উদাহরণ।

পাঠ ২ : বাস্তুতন্ত্রের উপাদান

তোমরা জেনেছ অজীব এবং জীব এই দুটি প্রধান উপাদান নিয়ে বাস্তুতন্ত্র গঠিত।

অজীব উপাদান : বাস্তুতন্ত্রের প্রাণহীন সব উপাদান অজীব উপাদান নামে পরিচিত। এই অজীব উপাদান আবার দুই ধরনের। (ক) অজৈব বা ভৌত উপাদান এবং (খ) জৈব উপাদান। অজৈব উপাদানের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবণ, মাটি, আলো, পানি, বায়ু, তাপ, আর্দ্রতা ইত্যাদি। সকল জীবের মৃত ও গলিত দেহাবশেষ জৈব উপাদান নামে পরিচিত। পরিবেশের জীব উপাদানের বেঁচে থাকার জন্য এসব অজৈব ও জৈব উপাদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

জীব উপাদান : পরিবেশের সকল জীবন্ত অংশই বাস্তুতন্ত্রের জীব উপাদান। বাস্তুতন্ত্রের সকল জীব ও অজীব উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তা তোমরা প্রথম পাঠে জেনেছ। বাস্তুতন্ত্রকে কার্যকরী রাখার জন্য এ সকল জীব যে ধরনের ভূমিকা রাখে,তার উপর ভিত্তি করে এসব জীব উপাদানকে (ক) উৎপাদক, (খ) খাদক এবং (গ) বিয়োজক-এ তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) উৎপাদক : সবুজ উদ্ভিদ যারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে, তারা উৎপাদক নামে পরিচিত। যারা উৎপাদক তারা সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। যার উপর বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য সকল প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল।

(খ) খাদক বা ভক্ষক : যে সকল প্রাণী উদ্ভিদ থেকে পাওয়া জৈব পদার্থ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে বা অন্য কোনো প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করে, তারাই খাদক বা ভক্ষক নামে পরিচিত। বাস্তুতন্ত্রে তিন ধরনের খাদক রয়েছে।

প্রথম স্তরের খাদক : যে সকল প্রাণী উদ্ভিদভোজী তারা প্রথম স্তরের খাদক। এরা তৃণভোজী নামেও পরিচিত। তৃণভোজী প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে ছোট কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে অনেক বড় প্রাণী। যেমন- গরু, ছাগল ইত্যাদি।

দ্বিতীয় স্তরের খাদক : যারা প্রথম স্তরের খাদকদেরকে খেয়ে বাঁচে। যেমন- পাখি, ব্যাঙ, মানুষ ইত্যাদি। এরা মাংসাশী বলেও পরিচিত।

তৃতীয় স্তরের খাদক বা সর্বোচ্চ খাদক : যারা দ্বিতীয় স্তরের খাদকদের খায়। যেমন– কচ্ছপ, বক, ব্যাঙ, মানুষ ইত্যাদি। এদের মধ্যে কোনো কোনো প্রাণী আবার একাধিক স্তরের খাবার খায়। এদেরকে বলা হয় সর্বভুক। আমরা যখন ডাল, ভাত, আলু ইত্যাদি খাই, তখন আমরা প্রথম স্তরের খাদক। আবার আমরা যখন মাছ, মাংস খাই, তখন আমরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের খাদক।

(গ) বিয়োজক : এরা পচনকারী নামেও পরিচিত। পরিবেশে কিছু অণুজীব আছে, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক যারা মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের উপর ক্রিয়া করে। এসময় মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। ফলে মৃতদেহ ক্রমশ বিয়োজিত হয়ে নানা রকম জৈব ও অজৈব দ্রব্যাদিতে রূপান্তরিত হয়। এসব দ্রব্যের কিছুটা ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক নিজেদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। মৃতদেহ থেকে তৈরি বাকি খাদ্য পরিবেশের মাটি ও বায়ুতে জমা হয়, যা উদ্ভিদ পুনরায় ব্যবহার করে। এভাবে প্রকৃতিতে অজীব ও জীব উপাদানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয়ে বাস্তুসংস্থান সচল থাকে।

পাঠ ৩–৫ : বাস্তুতন্ত্রের প্রকারভেদ

প্রাকৃতিক পরিবেশে দু'ধরনের বাস্তুতন্ত্র রয়েছে। স্থলজ এবং জলজ বাস্তুতন্ত্র। তোমরা এ পাঠে স্থলজ বাস্তুতন্ত্র এবং জলজ বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে জানবে।

স্থলজ বাস্তুতন্ত্র

এ ধরনের বাস্তুতন্ত্র আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন– বনভূমির বাস্তুতন্ত্র, মরুভূমির বাস্তুতন্ত্র ইত্যাদি। বনভূমির বাস্তুতন্ত্রের উদাহরণ হিসেবে আমরা বাংলাদেশের বনভূমি অঞ্চলের কথা বলতে পারি। বাংলাদেশের বনভূমি অঞ্চলকে প্রধান দুটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। (ক) সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল এবং (খ) খুলনার সমুদ্র উপকূলবর্তী সুন্দরবন অঞ্চল। নিচে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

সুন্দরবনের বনভূমি অন্যান্য অঞ্চলের বনভূমি থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের। খুলনা জেলার দক্ষিণে সমুদ্র উপকূল থেকে ভিতরের দিকে এ অঞ্চল বেশ কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। জোয়ার–ভাটার কারণে এ অঞ্চলের মাটির লবণাক্ততা বেশি, কাজেই লবণাক্ত পানি সহ্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদই এ বনাঞ্চলে জন্মে। সুন্দরবনের বনাঞ্চল ম্যানগ্রোভ বন নামে পরিচিত। এ বনের মাটি বেশ কর্দমাক্ত। কাজেই এর ভিতর দিয়ে সহজে বাতাস চলাচল করতে পারে না। তাই এখানকার উদ্ভিদের মূল মাটির নিচে না গিয়ে খাড়াভাবে মাটির উপরে উঠে আসে। এসব মূলের আগায় অসংখ্য ছিদ্র থাকে। যার সাহায্যে উদ্ভিদ শ্বসনের জন্য বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করে। এ বনের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ হলো সুন্দরী, গরান, গেওয়া, কেওড়া, গোলপাতা ইত্যাদি। এরা এ বনের উৎপাদক। পোকামাকড়, পাখি, মুরগি, হরিণ এ বনের প্রথম স্তরের খাদক। বানর, কচ্ছপ, সারস ইত্যাদি দ্বিতীয় স্তরের খাদক। এ বনের তৃতীয় স্তরের খাদকদের মধ্যে রয়েছে বাঘ, শূকর ইত্যাদি। এ সবের মধ্যে শূকর সর্বভুক। এ বনের উল্লেখযোগ্য প্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতা বাঘ, বানর, চিত্রল হরিণ, বন্য শূকর, কুমির, নানা ধরনের সাপ, পাখি এবং কীটপতঙ্গ।

জলজ বাস্তুতন্ত্র

জলজ বাস্তুতন্ত্র প্রধানত তিন ধরনের। যথা–

১. পুকুরের বাস্তুতন্ত্র

২. নদ–নদীর বাস্তুতন্ত্র

৩. সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র

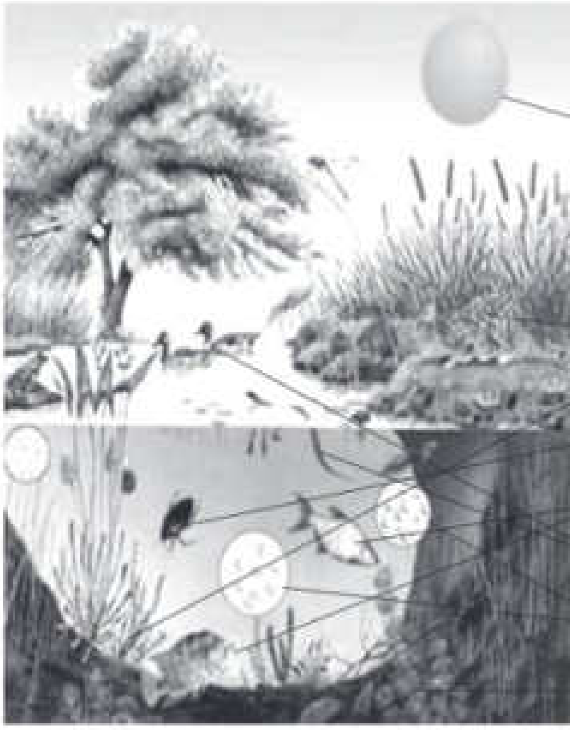

চিত্র ১৪.১ : একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্র

তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এখানে একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। স্বাদু পানির একটি ছোট পুকুর জলজ বাস্তুসংস্থানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উদাহরণ। পুকুরে রয়েছে অজীব ও জীব উপাদান। অজীব উপাদানের মধ্যে পুকুরে রয়েছে পানি, দ্রবীভূত অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং কিছু জৈব পদার্থ। এসব উপাদান জীব সরাসরি ব্যবহার করতে সক্ষম। জীব উপাদানের মধ্যে আছে উৎপাদক, প্রথম স্তরের খাদক, দ্বিতীয় স্তরের খাদক, তৃতীয় স্তরের খাদক ও নানা রকমের বিয়োজক। পুকুরের বাস্তুসংস্থানের উৎপাদক হচ্ছে নানা ধরনের ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ, যারা ফাইটোপ্লাঙ্কটন নামে পরিচিত। ভাসমান বড় উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে কচুরীপানা, শাপলা ইত্যাদি। ভাসমান ক্ষুদ্র উদ্ভিদ যেমন পুকুরের পানিতে রয়েছে, তেমনি রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক প্রাণী। এরা জু–প্লাঙ্কটন নামে পরিচিত। বিভিন্ন প্রকার জলজ কীটপতঙ্গ, ছোট মাছ, ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি যারা উৎপাদকদের খায়, তারা প্রথম স্তরের খাদক। আবার এদেরকে যারা খায়, আরও একটু বড় মাছ, ব্যাঙ এরা দ্বিতীয় স্তরের খাদক। এদেরকে আবার যারা খায় যেমন কচ্ছপ, বক, সাপ এরা তৃতীয় স্তরের খাদক। পুকুরে মৃত জীবের উপর ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক বিয়োজকের কাজ করে। বিয়োজিত দ্রব্যাদি আবার পুকুরের উৎপাদক খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

পাঠ ৬ ও ৭ : খাদ্য শৃঙ্খল ও খাদ্যজাল

তোমরা জেনেছ বাস্তুতন্ত্রে কোনো জীবই এককভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। বেঁচে থাকার জন্য একে অন্যের উপর বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল। জীবের বেঁচে থাকার জন্য চারপাশের সমস্ত উপাদান তাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

খাদ্য শৃঙ্খল

এ পৃথিবীতে সকল শক্তির উৎস সূর্যের আলো। বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদক হচ্ছে সবুজ উদ্ভিদ। তোমরা জেনেছ, প্রাথমিক স্তরের খাদক খাদ্যের জন্য উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল। আবার দ্বিতীয় স্তরের খাদক নির্ভরশীল প্রাথমিক স্তরের খাদকের উপর। তৃতীয় স্তরের খাদক খায় দ্বিতীয় স্তরের খাদকদেরকে। এভাবে একটি বাস্তুতন্ত্রে সকল জীব (উদ্ভিদ ও প্রাণী) পুষ্টি চাহিদার দিক থেকে ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত। এভাবে গড়ে উঠে খাদ্যশৃঙ্খল। তাহলে দেখা যাচ্ছে উদ্ভিদ উৎস থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে একে অন্যকে খাওয়ার মাধ্যমে শক্তির যে স্থানান্তর ঘটে, তাই খাদ্যশৃঙ্খল।

যেমন : ঘাস ⟶ পতঙ্গ ⟶ ব্যাঙ ⟶ সাপ ⟶ ঈগল।

খাদ্যজাল

বাস্তুতন্ত্রে অসংখ্য খাদ্যশৃঙ্খল থাকে তা নিশ্চয়ই দেখেছ। এসব খাদ্যশৃঙ্খল কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। খাদ্যশৃঙ্খলের এ ধরনের সংযুক্তিকে খাদ্যজাল বলা হয়।

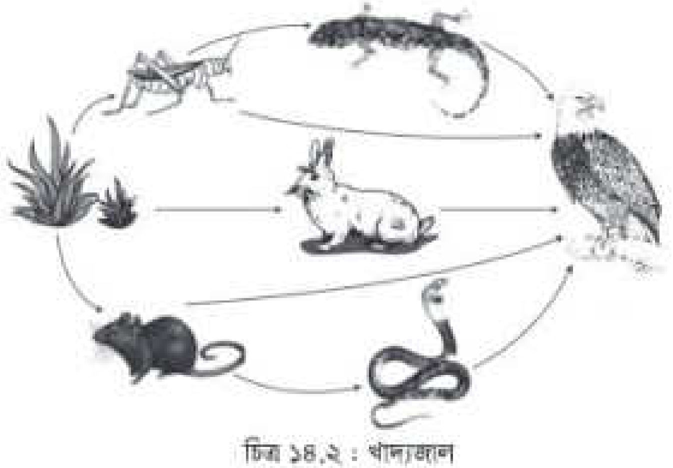

চিত্র ১৪.২ : খাদ্যজাল

পাঠ ৮ ও ৯ : বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ

তোমরা জেনেছ পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল জীবই সূর্যের আলোর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ জীবজগতের সকল শক্তির মূল উৎস সূর্য। সূর্যের যত আলো পৃথিবীতে আসে, তার মাত্র শতকরা ২ ভাগ সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ প্রক্রিয়া চলার সময় সবুজ উদ্ভিদ বিভিন্ন

ধরনের প্রাকৃতিক যৌগ, যেমন– পানি, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, আয়রন, সালফার ইত্যাদি ব্যবহার করে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জড় ও জীবজগতের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি হয়।

চিত্র ১৪.৩ : বাস্তুতন্ত্রে শক্তির একমুখী এবং পদার্থের চক্রাকার প্রবাহ

সবুজ উদ্ভিদের মাধ্যমেই সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই রাসায়নিক শক্তি বিভিন্ন প্রাণীতে খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। উৎপাদক থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চ খাদক পর্যন্ত শক্তি রূপান্তরের সময় প্রতিটি ধাপে শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে উৎপাদক থেকে শক্তি যায় তৃণভোজী প্রাণীর দেহে। সেখান থেকে দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং দ্বিতীয় স্তরের খাদক থেকে যায় সর্বোচ্চ খাদকে। এভাবেই শক্তি প্রবাহ চলতে থাকে। প্রতি স্তরে শক্তি হ্রাস পেলেও বিযোজক যখন বিভিন্ন মৃত জীবে, বর্জ্য পদার্থে বিক্রিয়া ঘটায়, তখন অজৈব পুষ্টিদ্রব্য পরিবেশে মুক্ত হয়ে পুষ্টিভাণ্ডারে জমা হয়; যা আবার সবুজ উদ্ভিদ কাজে লাগায়। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, বাস্তুসংস্থানে পুষ্টিদ্রব্য চক্রাকারে প্রবাহিত হয় এবং শক্তিপ্রবাহ একমুখী।

পাঠ ১০ : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকা

পরিবেশে বাস্তুতন্ত্র একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক। যেকোনো পরিবেশে বাস্তুতন্ত্র মোটামুটিভাবে স্বনিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতিতে যেকোনো জীবের সংখ্যা হঠাৎ করে বেশি বাড়তে পারে না। প্রতিটি জীব একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে এরা পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সহজে এর কোনো একটি অংশ একেবারে শেষ হতে পারে না। কোনো একটি পরিবেশে বিভিন্ন স্তরের জীব সম্প্রদায়ের সংখ্যার অনুপাত মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত থাকে। পরিবেশে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটলেও বহু দিন পর্যন্ত প্রাকৃতিক

ভারসাম্য বজায় থাকে। এসো একটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা এ বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করি। মনে করো কোনো একটি বনে বাঘ, হরিণ, শূকর ইত্যাদি বাস করে। এ বনে বাঘের খাদ্য হলো হরিণ ও শূকর। হরিণ ও শূকরের সংখ্যা বেড়ে গেলে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কারণ বাঘ প্রচুর খাদ্য পাবে। আবার বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে হরিণ ও শূকরের সংখ্যা কমে যাবে। হরিণ ও শূকরের সংখ্যা কমে গেলে বাঘের খাদ্যাভাব দেখা দিবে। ফলে বাঘের সংখ্যাও কমে যাবে। আবার বাঘের সংখ্যা যদি কমে যায় তবে হরিণ ও শূকরের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এভাবে হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে একটি এলাকার বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

কাজ : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকা সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করো ।

দল গঠন করো। যেকোনো একটি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকা সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো ।

নতুন শব্দ : বাস্তুতন্ত্র, খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্যজাল, ফাইটোপ্লাঙ্কটন, জু-প্লাঙ্কটন।

এ অধ্যায় শেষে যা শিখলাম–

– যেকোনো একটি পরিবেশের জড় এবং জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে আদান-প্রদান, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে উঠে বাস্তুতন্ত্র।
– অজীব এবং জীব এই দুটি প্রধান উপাদান নিয়ে বাস্তুতন্ত্র গঠিত।
– উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে একে অন্যকে খাওয়ার মাধ্যমে শক্তির যে স্থানান্তর ঘটে, তাই খাদ্যশৃঙ্খল।
– প্রকৃতিতে বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। খাদ্যশৃঙ্খলের এ ধরনের সংযুক্তি খাদ্যজাল নামে পরিচিত।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. যে সমস্ত প্রাণী ———————— তারা প্রথম স্তরের খাদক।

২. বাস্তুতন্ত্রের প্রাণহীন সব উপাদান ———————— উপাদান নামে পরিচিত।

৩. প্রকৃতিতে জীব বিভিন্ন ———————— মাধ্যমে একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৪. প্রকৃতিতে অজীব ও জীব উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়ে ———————— সচল থাকে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. চিত্রসহকারে একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্র বর্ণনা করো।

২. প্রকৃতি কীভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে আলোচনা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি প্রথম স্তরের খাদক?

ক. ফাইটোপ্ল্যাংকটন খ. শামুক

গ. বাঘ ঘ. বক

২. নিচের কোন খাদ্যশৃঙ্খলটি সঠিক?

ক. ফাইটোপ্ল্যাংকটন → ছোট মাছ → জু-প্ল্যাংকটন

খ. ফল → পতঙ্গ → পাখি

গ. ঘাস → কচ্ছপ → ছোটমাছ

ঘ. কচুরিপানা → মাছ → শামুক

নিচের ছকটি লক্ষ করো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

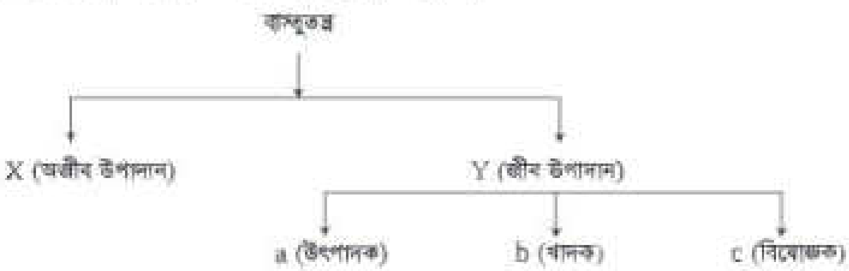

৩. নিচের কোনটি c এর অন্তর্ভুক্ত?

ক. ফাইটোপ্ল্যাংকটন
খ. জু-প্ল্যাঙ্কটন
গ. ব্যাকটেরিয়া
ঘ. কীটপতঙ্গ

৪. উপরের ছকে-

i. X এর উপর Y নির্ভরশীল
ii. a এর উপর b নির্ভরশীল
iii. a ও c পরস্পর নির্ভরশীল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফাহিম একটি বনে বেড়াতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের গাছপালার মাঝে বিভিন্ন রকমের প্রাণীর উপস্থিতি লক্ষ করল। এদের মধ্যে ছিল খরগোশ, হরিণ, বানর, বাঘ, শূকর ইত্যাদি প্রাণী। সে খেয়াল করল বনের একটি অংশে বড় বড় গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছে আর সে অংশে ঐ সকল প্রাণীর উপস্থিতি খুবই কম।

ক. বাস্তুতন্ত্র কী?
খ. বিয়োজক বলতে কী বোঝায়?
গ. ফাহিমের দেখা জীবগুলো নিয়ে একটি খাদ্যশৃঙ্খল তৈরি করে শৃঙ্খলটি ব্যাখ্যা করো।
ঘ. বড় বড় গাছপালা কেটে ফেলা অংশে প্রাণীর সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো।

২.

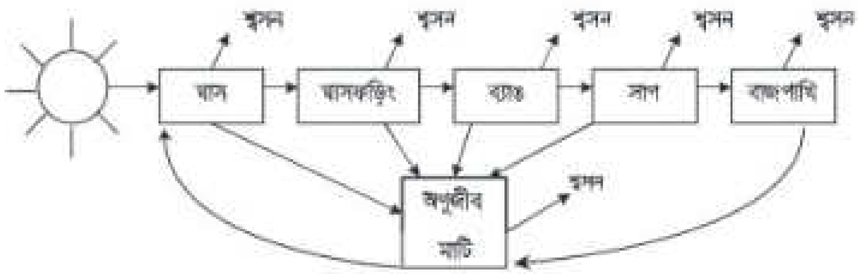

ক. জৈব উপাদান কী?

খ. খাদ্যজাল বলতে কী বোঝায়?

গ. উপরের শৃঙ্খলটিতে শক্তিপ্রবাহ কীভাবে চলে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে পুষ্টিপ্রবাহের চক্রটি কীরূপ হবে? বিশ্লেষণ করো।

প্রজেক্ট : পরিবেশের কয়েকটি খাদ্যশৃঙ্খল পর্যবেক্ষণ কর। পর্যবেক্ষণ শেষে এসব খাদ্যশৃঙ্খল ব্যবহার করে পোস্টার কাগজে খাদ্যজাল তৈরি করো এবং শ্রেণিতে প্রদর্শন করো।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম–বিজ্ঞান

পরিশ্রম কখনও নিষ্ফল হয় না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।